"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
তৃতীয় বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮২ ॥ প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮২ ॥ প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

শ্রীমদ্ বিজয়ানন্দ সূরী

শ্রীমদ্ বিজয়ানন্দ সুরী

পূরণচাঁদ সামসুখা

প্রবন্ধের শীর্ষ ভাগে যে মহাত্মার নামোল্লেখ করা হইল, তিনি আধুনিক কালের একজন বিখ্যাত জৈন সাধু। জৈন শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ডাক্তার হর্ণলী প্রমুখ পাশ্চাত্য সুধীগণ জৈন গ্রন্থ সম্পাদন কালে ইঁহার নিকট যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইঁহার প্রণীত 'অজ্ঞান-তিমির ভাস্কর', 'জৈন তত্ত্বাদর্শ' প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করে। বিজয়ানন্দ সুরী সাধারণে আত্মারামজী নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া আমরাও এস্থলে প্রায়ই উক্ত নাম ব্যবহার করিব। ইঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ও বচন চাতুর্য ছিল। যে সময়ে ইনি ধর্ম কথা ব্যাখ্যা করিতেন তখন শত শত শ্রোতা বিমুগ্ধ হৃদয়ে ইঁহার বচনামৃত পান করিত।

১৮৯৩ সংবতে (১৮৩৭ খৃঃ অব্দে) পাঞ্জাবের অন্তর্গত লহরা নামক গ্রামে গণেশচন্দ্রের ঔরসে ও রূপদেবীর গর্ভে আত্মারামজী জন্ম গ্রহণ করেন। গণেশচন্দ্র জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। গণেশচন্দ্র পাঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের পুলিস বিভাগে ও পরে সৈন্য বিভাগে কার্য করিত, পরে কতকগুলি দস্যুর সহিত একত্র হইয়া কার্য পরিত্যাগ পূর্বক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে। এই সময়ে রূপদেবী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই বালকই পরিশেষে বিজয়ানন্দ সুরী বা পণ্ডিত আত্মারামজী নামে বিখ্যাত হন। বাল্যকালে দিত্তা ও আত্মারাম এই উভয় নামই ইঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। স্থানীয় শিখগুরু অতর সিং ইঁহার শরীরে বহু সুলক্ষণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে এই বালক কালে রাজা অথবা সাধু হইবে। পিতার নিকটে তাহার আদর্শ দেখিয়া পুত্রও তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিবে বিবেচনা করিয়া অতর সিং গণেশচন্দ্রের নিকট এই বালক প্রার্থনা করেন; কিন্তু গণেশচন্দ্র তাহাতে অসম্মত হয়। পরে গণেশচন্দ্র ধৃত হইয়া দশ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হয়।

কারাগারে গমন কালে আত্মারামজীকে জীরা গ্রাম নিবাসী যোধমল নামক জনৈক জৈন ওসওয়াল বণিকের নিকট ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য রাখিয়া যায়। যোধমল আত্মারামজীকে পুত্র নির্বিশেষে পালন করিতে লাগিল। এ সময়ে পাঞ্জাবাঞ্চলে ঢুঁঢক পন্থা[১] নামক এক প্রকার মত প্রাদুর্ভূত ছিল। এখনও স্থলে স্থলে ঢুঁঢক মতাবলম্বীগণ দৃষ্ট হয়। যোধমল এই মতাবলম্বী ছিল বলিয়া আত্মারামজীও ইহার সহিত ঢুঁঢক সাধুগণের নিকট গমন করিতেন। ১৯০৯ সংবতে জীরা গ্রামে গঙ্গারাম ও জীবনমল নামক দুই জন ঢুঁঢক পন্থী সাধু আগমন করেন। ইঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আত্মারামজী সংসার হইতে বিরক্ত হন ও বহু অনুনয়ের পর মাতা রূপদেবী ও পালকপিতা যোধমলের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মালের কোটাল গ্রামে ১৯১০ সংবতে অগ্রহায়ণ মাসীয় শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে জীবনরাম সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর আত্মারামজী বিদ্যাভ্যাস করিতে করিতে নানা স্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইনি অসাধারণ স্মৃতি শক্তি বলে প্রত্যহ তিন শত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এ সময়ে ইনি উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। ঢুঁঢক সাধুগণ জৈন শাস্ত্রের নানা প্রকার বিসদৃশ অর্থ করিয়া থাকেন ও মূলসূত্র ব্যতীত পূর্বাচার্যের কৃত টীকা, চূর্ণি, প্রভৃতি কিছুই মানেন না। শিষ্যগণ ব্যাকরণ পড়িলে সূত্রের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া তাঁহাদের ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা কাহাকেও ব্যাকরণ পড়িতে দেন না। আত্মারামজীরও এই অবস্থা ঘটিল। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া কয়েক ব্যক্তি ব্যাকরণ পড়িতে উপদেশ দেন। কিন্তু ঢুঁঢকপন্থী সাধু ও শ্রাবকগণ বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন ও এমন কি তাঁহার অন্তরে এরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিলেন যে, ব্যাকরণ পড়িলে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া যায়। ইনিও তাঁহাদের কথায় ভুলিয়া ব্যাকরণ পাঠ পরিত্যাগ পূর্বক শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন ও অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র ঢুঁঢক শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধিকাংশই কণ্ঠস্থ করিলেন। ঢুঁঢকগণ শ্বেতাম্বর জৈনগণেরই কয়েকটী শাস্ত্র

১। ১৭০৯ সংবতে জৈন মত হইতে বহির্গত মত বিশেষ। এই মতাবলম্বী সাধুগণ প্রতিমা দর্শন বা পূজন করেন না ও জৈন শাস্ত্রের অননুমোদিত অনেক প্রকার আচার অনুষ্ঠান করেন।

সত্য বলিয়া মানিয়া থাকেন, তবে স্থলে স্থলে ভুল অর্থ করিয়া বসেন। টীকাত একেবারেই মানেন না।

এই বিত্যাভ্যাস ব্যপদেশে ইনি নানা দেশ পর্যটন ও বহু ঢুঁঢক সাধুগণের সহিত আলাপ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসু হৃদয় এই অল্প শিক্ষায় সন্তুষ্ট হইল না। এ সময় তিনি অল্প ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়া ছিলেন। এই অল্প শিক্ষাতেই তিনি ঢুঁঢক সাধুগণের কথিত অর্থ ভুল বলিয়া জানিতে পারিলেন। বিশেষ ঢুঁঢকপন্থী সাধুগণ প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকার অর্থ করিতেন ও যেখানে কেহই কোন প্রকার অর্থ স্থির করিতে পারিতেন না, সে স্থলে পাঁচজনায় মিলিয়া একটা মনঃকল্পিত 'পঞ্চায়তী' অর্থ ঠিক করিয়া লইতেন। এইরূপ নানা কারণে আত্মারামজী এই মতের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। গুজরাত প্রভৃতি প্রদেশ গমন, ব্যাকরণাদি পাঠ ও সিদ্ধাচল, গিরনার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জৈনতীর্থ পর্যটন করিতে ইঁহার প্রবল ইচ্ছা হয়। গুজরাত গমনোদ্দেশে আত্মারামজী তাঁহার গুরু জীবনরামজীর সহিত চিত্তোর পর্যন্ত গমন করেন; কিন্তু গুজরাত না যাইয়া গুরুর অনুরোধে উদয়পুর, নাথদ্বারা, জয়পুর, ভরতপুর ও মথুরা হইয়া কাশী গমন করেন। কাশী হইতে দিল্লী ও তথা হইতে সরগথল গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করিয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণালে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে পাঞ্জাবী ঢুঁঢকপন্থীগণের প্রধানাচার্য অমর সিংহের শিষ্য রামবক্স প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহারা ইঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন ও রামবক্সের শিষ্য বিষ্ণুচন্দ্র ইঁহার নিকট অনুযোগদ্বার, আচারাঙ্গ সূত্র, নন্দীসূত্র প্রভৃতি জৈনশাস্ত্র পাঠ করেন। কর্ণাল হইতে বিচরণ করিয়া ইনি রোপড় গ্রামে সদানন্দাস্থ্য ব্রাহ্মণের নিকট ব্যাকরণ পাঠ করিতে লাগিলেন। এ স্থল হইতে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ১৯১৯ সংবতে রত্নচন্দ্র নামক সাধুর নিকট পঠনার্থ আগ্রায় গমন করিলেন। রত্নচন্দ্রমুনি অন্যান্য ঢুঁঢক সাধুগণের ন্যায় সূত্রের বিপরীতার্থ করিতেন না ও ইঁহার অর্থের পূর্বাচার্যের কৃত টীকা প্রভৃতির সহিত সামঞ্জস্য থাকিত। ইঁহার এই সমস্ত গুণ দেখিয়া আত্মারামজী অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ইঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। আগ্রা হইতে প্রস্থান করিয়া পরিব্রজন করিতে করিতে ১৯২১ সংবতে মালের কোটাল গ্রামে গমন করেন। এ স্থলে কোষ, কাব্য,

অলঙ্কার ও তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইতিপূর্বে মেঢ়মল ও গোপীমল নামক অজীবক সম্প্রদায় ভুক্ত দুই ব্যক্তিকে তর্কে পরাস্ত করিয়া জৈন করিয়াছিলেন। এ সময়ে ভূয়োদর্শন দ্বারা ইঁহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে ঢুঁঢক মত প্রকৃত জৈন মত নহে, ইহা আধুনিককালে ধর্মদাস প্রভৃতি দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবাঞ্চলে এই মতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব থাকায় হঠাৎ আপনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন না। ক্রমে ক্রমে দুই এক জন করিয়া স্বমতে আনয়ন পূর্বক সংখ্যাধিক্য হইলে প্রচার করিব স্থির করিয়া কোটাল গ্রামে গমন করিলেন। এ স্থলে কুমার সেন ও মহন্ত রায় নামক দুই ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম স্বমতে আনয়ন করেন। ইঁহার পূর্বশিষ্য বিষ্ণুচন্দ্র মুনি অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন। জালন্ধরে অবস্থান কালে অজীবক সম্প্রদায়ভুক্ত রামরতন বসন্তরায়ের সহিত ইঁহার তর্ক হয়। এই তর্কে প্রায় সপ্তবিংশতি গ্রামের লোক একত্রিত হয় ও কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মধ্যস্থ ছিলেন। ইহাতে আত্মারামজী জয়যুক্ত হন। জালন্ধর হইতে অমৃতসরে গমন করিয়া প্রধান ঢুঁঢকাচার্য অমর সিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও বাদানুবাদ করেন। অমৃতসর হইতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দিল্লী অঞ্চলে আগমন করিলে ঢুঁঢকাচার্য অমরসিংহ ও দিল্লীর কতিপয় উক্ত মতাবলম্বী গৃহস্থ ইঁহার বিরুদ্ধে বহুস্থলে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে আত্মারামজীর প্রতি জন সাধারণের ভক্তি হ্রাস হইল না। তিনি নানাস্থানে বিচরণ করিয়া ১৯২৬ সংবতে (১৮৭০ খৃঃ অব্দে) মালের কোটাল নগরে আগমন পূর্বক ঢুঁঢক মত পরিত্যাগ করতঃ প্রকাশ্যে প্রাচীন ও প্রকৃত শ্বেতাম্বর মত গ্রহণ করেন। বিষ্ণুচন্দ্র, হুকুমচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রগণও বহু ব্যক্তিকে ঢুঁঢক মত পরিত্যাগ করাইয়া স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ১৯২৮ সংবতে হুঁশিয়ারপুরে বিষ্ণুচন্দ্র প্রভৃতি সাধু অমর সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া ইঁহার সহিত সম্মিলিত হন। অমর সিংহ গ্রামে গ্রামে ইঁহার বিরুদ্ধে পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন কিন্তু সমস্তই বৃথা হইয়াছিল। আত্মারামজীর তর্কবাণে সমস্ত ঢুঁঢক সম্প্রদায় কম্পমান হইয়া উঠিল। ইঁহার স্বপক্ষীয় সাধুসমূহ চতুর্দিকে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। ইঁহারা যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন তত্তৎ স্থানে ঢুঁঢকদিগকে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে হুঁশিয়ারপুর, নিকোদর, অমৃতসর, জম্বু, জীরা, কোটাল, আম্বালা, লুধিয়ানা, লাহোর, রামনগর, সরহিন্দ, প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ ব্যক্তিগণ ঢুঁঢক মত পরিত্যাগ করিয়া শ্বেতাম্বর মত গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯২৯ সংবতে প্রায় সপ্ত সহস্র ঢুঁঢক মতাবলম্বী ইঁহার অনুগত হইল। ১৯৩০ সংবতে লুধিয়ানাতে বহু সাধু সহ একত্রিত হইয়া ঢুঁঢকগণের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত জৈন সাধুর পরিচ্ছদ গ্রহণ করা ও কোন শ্বেতাম্বর মুনির নিকট পুনরায় দীক্ষিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া লুধিয়ানা হইতে বহির্গত হইয়া আবু প্রভৃতি তীর্থস্থল পর্যটন পূর্বক অহমদাবাদে আগমন করেন। এ স্থলে অষ্ট দিবস মাত্র অবস্থান করিয়া সিদ্ধাচল তীর্থে গমন করিলেন। সিদ্ধাচল হইতে আহমদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত তপগচ্ছীয়[২] মুনি শ্রী বুদ্ধি বিজয়জীর নিকট হইতে আত্মারামজী পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। বুদ্ধি বিজয় মুনি ইঁহাকে আনন্দ বিজয় আখ্যা প্রদান করেন। ইঁহার প্রধান শিষ্য বিষ্ণুচন্দ্র, হুকুমচন্দ্র. প্রভৃতির পূর্ব নাম পরিবর্তন করিয়া যথাক্রমে লক্ষ্মী বিজয়, রঙ্গ বিজয়, ইত্যাদি নাম প্রদত্ত হয়। আত্মারামজী কয়েক মাস যাবৎ অহমদাবাদে থাকিয়া পুনরায় তীর্থ যাত্রা করেন। বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ১৯৩৪ সংবতে যোধপুর গমন করেন। এ স্থানে ৩৫ জন ঢুঁঢক সাধু ইঁহার সহিত তর্ক করিতে প্রস্তুত হইয়া দিন স্থির করেন। কিন্তু যে দিবস তর্ক হইবে তাহার পূর্ব দিবসে ইঁহারা সকলে গুপ্ত ভাবে পলায়ন করেন। যোধপুর পরিত্যাগ করিয়া বহু দিবস যাবৎ আত্মারামজী পাঞ্জাব হইতে গুজরাত পর্যন্ত অনেক স্থলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এ সময়ে ইনি 'জৈন তত্ত্বাদর্শ', 'অজ্ঞানতিমির ভাস্কর', প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঢুঁঢক মতাবলম্বীগণ 'সম্যক্ত্বসার' নামক পুস্তিকা প্রচার করিলে ভাব নগরের শ্রীজৈন ধর্ম প্রসারক সভার অনুরোধে ইনি তাহার উত্তর স্বরূপ 'সম্যক্ত-শল্যোদ্ধার' প্রচার করেন। ১৯৪০ সংবতে পালি নগরে ইঁহার মুখ্য শিষ্য শ্রীলক্ষ্মী বিজয় মুনি পরলোক গমন করেন। সুরতবাসী হুকুম মুনি নামক সাধু 'অধ্যাত্মসার' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করিলে আত্মারামজী ইহাতে

২। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায় ৮৪ গচ্ছে অর্থাৎ বিভাগে বিভক্ত আছে। তপগচ্ছ তাহারই অন্যতম।

চতুর্দশটী ভুল প্রদর্শন করেন। সুরতবাসী শ্রাবকগণ 'অধ্যাত্মসার' পুস্তক ও আত্মারামজীর প্রদর্শিত ভ্রমসমূহ বোম্বাই-এর দি জৈন এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া নামক সভায় প্রেরণ করিলে, উক্ত সভা মতামতের জন্য অন্যান্য জৈন সাধুর নিকট ঐ পুস্তক প্রেরণ করেন। সর্ব সাধুগণের মতে উক্ত পুস্তক জৈন শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়।

এইরূপে পরিব্রজন করিতে করিতে ১৯৪৪ সংবতে আত্মারামজী পালিতানায় আগমন করেন। এই স্থলে বহু দেশ হইতে আগত শ্রাবকগণ একত্রিত হইয়া কার্তিক মাসীয় কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ইঁহাকে শ্রীমদ্বিজয়ানন্দ সূরী আখ্যা প্রদান করেন।

১৯৪৫ সংবতে যখন ইনি মেসানায় ছিলেন সে সময়ে ডাক্তার হর্ণলী ইঁহাকে জৈন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রশ্ন পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। ডাক্তার হর্ণলীর অনুরোধে আচার্য মোক্ষমূলর কর্তৃক সম্পাদিত ঋগ্বেদ আবুর পলিটিকেল এজেণ্ট দ্বারা গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে প্রদান করেন। চিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে ইঁহাকে আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু সাধু বৃত্তিতে অন্তরায় ঘটিবে বিবেচনা করিয়া ইনি নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলে মিঃ বীরচাঁদ রাঘবজী গান্ধী, বি. এ. তথায় প্রেরিত হন। ইনি মিঃ গান্ধীকে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন। হুঁশিয়ারপুর, পট্টি প্রভৃতি স্থানে ইনি কয়েকটী নূতন জৈন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি চার বেদ, মহাভারত ও বিষ্ণু পুরাণাদি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার উভয় চোক্ষে 'মোতিয়াবিন্দ' (Cataract) হওয়ায় জুনাগড়ের ডাক্তার ত্রিভুবন দাস অস্ত্র করিয়া নিরাময় করেন।

১৯৫৩ সংবতে জ্যৈষ্ঠ মাসীয় শুক্লা অষ্টমী তিথিতে রাত্রিতে পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরানবালা নগরে আত্মারামজী দেবলোকে গমন করেন। ইনি প্রায় ৭।৮ সহস্র ঢুঁঢক মতাবলম্বিগণকে শ্বেতাম্বর জৈন করেন। ইঁহার রচিত পুস্তক সমূহ জৈনগণের অতি আদরের বস্তু। ইঁহার প্রণীত 'জৈন তত্ত্বাদর্শ' ও 'অজ্ঞানতিমির ভাস্কর' নামক গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসী ইঁহার প্রশংসা করিয়া ৫১ প্রকার অর্থ সমন্বিত একটী মালাবদ্ধ শ্লোক ও পত্র প্রেরণ করেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত

করিলাম না। চিকাগোর জগদ্বিখ্যাত বিশ্ব ধর্মসভার রিপোর্টে ইঁহার সম্বন্ধে লিখিতছিল যে :

* He is the high priest of the Jain Community and is recognised as the highest living authority on Jain religion and literature by Oriental Scholars.

আত্মারামজীর সহিত আজিমগঞ্জ নিবাসী ৺রায় মেঘরাজ বাহাদুরের অনেক দিবস পর্যন্ত গচ্ছ সম্বন্ধীয় তর্ক হইয়াছিল। ইহার ফল স্বরূপ উভয় পক্ষ হইতে কয়েকটী পুস্তক প্রচারিত হয়।

এই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কয়েক স্থলে লাইব্রেরী ও মূর্তি স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে পালিতানার লাইব্রেরী ও জিয়াগঞ্জ নিবাসী ৺রায় ধনপত সিংহ বাহাদুরের পত্নী রানী মিনাকুমারী সাহেবা কর্তৃক আত্মারামজীর মৃত্যুস্থল গুজরনবালা গ্রামে স্থাপিত মূর্তিই শ্রেষ্ঠ।

প্রবাসী, চৈত্র, ১৩১০

একটী ব্যথিত প্রাণ
মহাবীর পত্নী যশোদা

খ্যাতিমান লোকের স্ত্রী হওয়া যেমন একদিকে সৌভাগ্যের তেমনি অন্য দিকে দুর্ভাগ্যেরও, বিশেষ স্বামী যদি মহাবীর-বুদ্ধের মতো তীর্থংকর বা ধর্ম প্রবর্তক হন। কারণ সেক্ষেত্রে একদিকে তাঁরা যেমন স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হন তেমনি অন্য দিকে সেই সেই মহাপুরুষের জীবনীকারেরা তাঁদের কথা প্রায় বিস্মৃত হয়ে যান। বহু ধর্মীয় নেতাদের স্ত্রীদের এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যেও বোধ হয় মহাবীর পত্নী যশোদাই ছিলেন সব চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্যবতী।

দুর্ভাগ্যবতী এই জন্যই যে মহাবীরের জীবনী-মূলক আখ্যানে মহাবীর পত্নী যশোদার স্থান প্রায় নেই বললেই চলে। কল্পসূত্র রচয়িতা ভদ্রবাহু স্বামীত 'ভারিয়া জসোয়া কোডিন্না গোত্তেণং'—ভার্যা যশোদা কৌডিন্যগোত্রীয়া ছিলেন বলেই শেষ করে দিয়েছেন।

ভদ্রবাহু স্বামী যখন ত্রিশলার স্বপ্ন বর্ণনায় তাঁর কল্পনাকে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা দিয়েছেন, রাজা সিদ্ধার্থের ব্যায়াম ও স্নানাগারের বর্ণনায় অযথা পাতার পর পাতায় অপব্যয় করেছেন তখন মহাবীর ভার্যা যশোদার প্রতি তাঁর এই কৃপণতা কেন? সে কি তিনি মহাবীরের স্ত্রী ছিলেন সেইজন্য? না স্ত্রী-সম্বন্ধীয় বর্ণনা সাধুর পক্ষে অকৃত্য? কিন্তু সে কথাই বা বলি কি করে? কারণ ভদ্রবাহু শ্রীদেবীর বর্ণনায় তাঁর লেখনীকে ত কোথাও সংযত করেন নি? তিনি যখন 'নিগূঢ় জাণুং গয়-বর-কর-সরিস-পীবরোরুং···বিখিন্ন-সোণিচক্কং··· পিসাল-পসংথ-জঘণং কর-য়ল-মাইয়-পসংথ-তিবলিয়-মজ্‌ঝং···থণ-জুয়ল-বিমল-কলসং'—অর্থাৎ নিগূঢ় জানুদ্বয়, হস্তীর শুণ্ড সদৃশ পীবর উরু···বিস্তীর্ণ নিতম্ব মণ্ডল ···বিশাল প্রশস্ত জঘন···মুঠোয় পরিমাপ যোগ্য মধ্যদেশে প্রশস্ত ত্রিবলী··· বিমল কলসতুল্য স্তন-যুগল বলতে পারলেন তখন বলতে ইচ্ছে করে না যে

স্ত্রী-কথা বিষয়ে ভদ্রবাহুর শ্রমণ সুলভ কোনো বিরূপতা ছিল। বরং বলতে হয় এ তাঁর ইচ্ছাকৃত অবহেলা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে কয়েকজন উপেক্ষিতা নারীর নাম করেছেন। যেমন—বাল্মীকি রামায়ণের উর্মিলা, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলার অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ও বাণ-ভট্টের কাদম্বরীর পত্রলেখা। আমি কাব্যে উপেক্ষিতাদের এই নামের তালিকায় আর একটী নাম সংযোজিত করে দিতে চাই এবং সে নাম মহাবীর পত্নী যশোদার। শুধু তাই নয়, এই নামের তালিকায় যশোদাই সব চাইতে বেশী অনাদৃতা, অবহেলিতা, উপেক্ষিতা। কারণ ভদ্রবাহু 'ভারিয়া জসোয়া কোডিন্না গোত্তেণং' এই তথ্যের বেশী আর কোনো তথ্য আমাদের পরিবেশন করেন নি। টীকা বা অন্তখান হতে তাঁর সম্বন্ধে আরো যেটুকু জানা যায় তা এই : তাঁর পিতার নাম ছিল সমরবীর, আর তিনি এক কন্যা মহাবীরকে উপহার দিয়েছিলেন যার নাম অনোজ্জা বা অনবদ্যা। প্রিয়দর্শনাও তাকে বলা হয়ে থাকে। ব্যস্, এইমাত্র। কিন্তু এটুকু তথ্যে আমাদের মন ভরে না। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জানবার ইচ্ছা করে। তিনি কেমন ছিলেন? তন্বী শ্যামা না স্থূলা? দীর্ঘাঙ্গী না হ্রস্ব আকৃতি? সামান্য রূপসী না অসম্ভব রূপবতী? স্বামীর হৃদয় তিনি কতখানি অধিকার করেছিলেন? তিনি শিষ্যা ছিলেন না সহচরী? সখী না প্রিয়া? মাণিক্যের কুণ্ডলে, সীমন্তচুম্বী চূড়ামণির কিরণ প্রবাহে, জ্যোৎস্নার মতো কিরণ ছড়ানো মৃদু হাসির মাধুর্যে তিনি যখন মহাবীরের সামনে এসে দাঁড়াতেন তখন কি মহাবীরের মন তাঁর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠত? আরো জানতে ইচ্ছে করে স্বামীর সাধনায় তাঁর কতখানি সহযোগ ছিল, কতখানি অসহযোগ? কিন্তু তার আর কিছুই জানবার উপায় নেই। কারণ ভদ্রবাহু বিদ্যুৎ প্রভার মতো তাঁকে চকিতে উপস্থিত করে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছেন। কবি-সাহিত্যিক যে এত হৃদয়হীন হতে পারেন তা কে জানত?

যশোদা সম্পর্কে আরো কত প্রশ্ন মনে আসে। মহাবীর যখন প্রব্রজ্যা নিয়ে ছিলেন তখন কি তিনি জীবিত ছিলেন না মৃত? যদি জীবিত থেকে থাকেন তবে তিনি স্বামীকে কি হাসি মুখে বিদায় দিয়েছিলেন না আড়ালে চোখের জল ফেলে ছিলেন। স্বামীর অবর্তমানে তাঁর বিরহশীর্ণ দিনগুলো

কি ভাবে ব্যতীত হয়েছিল? তিনি কি এক বেণী ধারণ করে যোগিনীর মতো জীবন যাপন করেছিলেন না স্বচ্ছন্দ জীবন? মহাবীর তীর্থংকর হয়ে প্রথম যখন ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুরে এলেন, যখন তাঁর দর্শন মানসে ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরের জ্ঞাতৃ ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণ-কুণ্ডপুরে এসেছিল তখন কি তিনি তাঁদের সঙ্গ নিয়েছিলেন? যদি নিয়ে থাকেন তবে কন্যা ও জামাতার দীক্ষায় তাঁর হৃদয় কি আরো বিদীর্ণ হয়ে যায় নি? তিনিও কি কন্যা ও জামাতাকে অনুসরণ করে মহাবীরের কাছে প্রব্রজিত হয়েছিলেন? কিন্তু ভদ্রবাহুর হৃদয় 'কঠিন কপাট'। তাকে আর একটুও উন্মুক্ত করা গেল না। এর চাইতে যশোদাকে তাঁর জীবনে না আনলেই কী ভাল হত না? যদি যশোদার মৃত্যু হয়ে থাকে তবে সে কথা বলতেও বাধা কি ছিল?

না, বুদ্ধপত্নী রাহুলমাতা যশোধারার প্রতি বোধ হয় বুদ্ধের জীবনীকারেরা এত অবিচার করেন নি। কারণ ভগবান বুদ্ধ যেদিন সংসার পরিত্যাগ করে গেলেন সেদিন গভীর রাত্রে, মহাঅভিনিষ্ক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে বুদ্ধের জীবনীকারেরা তাঁকে যশোধারার প্রাসাদে উপস্থিত করেছেন।···বুদ্ধ ঘরের দরজা খুললেন। ঘরে সুগন্ধি তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। রাহুলমাতা বেল, যুঁই ও চাঁপা ফুলের শয্যায় শুয়েছিলেন। তাঁর ডান হাত রাহুলের মাথার ওপর রাখা ছিল। বুদ্ধ দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের দু'জনকে দেখলেন। রাহুলকে কোলে নেবার ইচ্ছা হল। কিন্তু তখনি তিনি ভাবলেন রাহুলকে কোলে নিলে রাহুলমাতার ঘুম ভেঙে যেতে পারে। তাতে মহাঅভিনিষ্ক্রমণের বাধা হবে। তার চাইতে বুদ্ধত্ব অর্জনের পর যখন এখানে আসব তখন তাকে দেখব।···

ছবিটি কি মানবীয়।

বুদ্ধত্ব লাভ করবার পর বুদ্ধ যখন প্রথম কপিলাবস্তুতে এলেন সেই ছবিটি : ···তিনি ঘরে ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। মেয়েরা জানালা হতে সেই দৃশ্য দেখছিল। রাহুলমাতাও দেখলেন। তখন তাঁর মনে হল আর্যপুত্র এই নগরে সোনার শিবিকায় আরূঢ় হয়ে আড়ম্বরসহ বার হতেন আর আজ কষায় বস্ত্র ধারণ করে ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করছেন। এ ভালো দেখায় না। তখন তিনি সে কথা রাজা শুদ্ধোধনকে বলে পাঠালেন। শুদ্ধোধন তখনি ছুটে গিয়ে বুদ্ধের হাত হতে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে তাঁকে সভিক্ষু প্রাসাদে

আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। বুদ্ধ প্রাসাদে এলে রাহুলমাতা ছাড়া আর সকলেই সেখানে উপস্থিত হল। রাহুল মাতাকে আসতে বলা হলেও তিনি এলেন না। বললেন, যদি আমার মধ্যে কোন গুণ থেকে থাকে তবে আর্যপুত্র নিজেই আমার কাছে আসবেন। তখন তাঁকে বন্দনা করব।

বুদ্ধ রাহুলমাতার এই স্বাভিমানকে অমর্যাদা করতে পারেন নি। তাই তিনি নিজেই রাহুলমাতার ঘরে এলেন। তাঁকে যথেচ্ছ বন্দনা করবার সুযোগ দিলেন। রাহুলমাতা বুদ্ধের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে বন্দনা করলেন।

রাহুলমাতার কথা পড়তে পড়তে যেমন চোখে জল ভরে আসে তেমনি বিরহকাতরা উপেক্ষিতা মহাবীর পত্নী যশোদার জন্ম গভীর বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

জৈনাগম ও জাতকে বর্ণিত চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথা

শ্রী বি. এল. নাহটা

শ্রমণ সংস্কৃতির প্রধান দুইটী অঙ্গ জৈন ও বৌদ্ধ। এদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল ভগবান বুদ্ধ হতে। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন জৈনদের চব্বিশ সংখ্যক তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের সমসাময়িক। দর্শনসার প্রভৃতি জৈন গ্রন্থের উল্লেখানুসারে ভগবান বুদ্ধ ২৩ সংখ্যক তীর্থংকর ভগবান পার্শ্বের পরম্পরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বোধহয় এই কারণেই বৌদ্ধধর্মের আচার, বিচার, কথা ও সাহিত্যের ওপর জৈন ধর্মের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের এই সিদ্ধান্ত-গত সাম্যের জন্য পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিতেরা গোড়ারদিকে একটীকে অপরটীর শাখা বলে অনুমান করেছিলেন। যদিও হারমান জেকোবী প্রমুখ মনিষীরা জৈনধর্মের গভীর অধ্যয়নের দ্বারা সে ধারণা ভ্রান্ত সেকথা প্রমাণিত করেছেন, তবু সেই ভ্রান্ত ধারণার যে সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে সেকথা বলা যায় না। যে কোনো সরকারী সংগ্রহালয়ে গেলেই দেখা যাবে যে বহু জৈন মূর্তিকে বৌদ্ধ মূর্তির সঙ্গে নিকট সাম্যের জন্য বৌদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ভগবান মহাবীরের উল্লেখ নিগংঠ নাতপুত্ত বলে করা হয়েছে তবে প্রাচীন জৈন সাহিত্যে ভগবান বুদ্ধের কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। এতে মহাবীর বুদ্ধের চাইতে বয়সে বড় ছিলেন তাই মনে হয়। আবার জৈন উত্তরাধ্যয়ন প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থের অনেক পদ বৌদ্ধ ধম্মপদে প্রায় সেই প্রকারেই বা সামান্য পাঠভেদে পাওয়া যায়। এমন কি জৈন গ্রন্থের বহু গল্প প্রায় সেইরূপেই বৌদ্ধ গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাই একথা নিশ্চিত করে বলা শক্ত যে এই পদ বা গল্প বৌদ্ধরা জৈনদের কাছ হতে সংগ্রহ করেছেন না জৈন ও বৌদ্ধ উভয়েই তৎকাল প্রচলিত লোক সাহিত্য হতে

সংগ্রহ করেছেন। বৌদ্ধ দীঘনিকায়ের পায়সীযসুত্তের সঙ্গে জৈন রায়পসেণইয় সুত্তের সাম্য পণ্ডিত বেচরদাসজী তাঁর রায়পসেণইয় সুত্তের ভূমিকায় দেখিয়েছেন। বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যের চিত্তসম্ভূতের সঙ্গে উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ১৩ অধ্যয়নের চিত্রসংভূতির আশ্চর্য মিল দেখা যায়। উত্তরাধ্যয়ন ও ধম্মপদের অনেক পদ ও অনুত্তরিয়া জাতকের গন্তপাঠ ও উত্তরাধ্যয়নের তুলনা স্থানকবাসীদের প্রধানাচার্য আত্মারামজীর উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের প্রস্তাবনায় করা হয়েছে।

সম্প্রতি বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ কৌসল্যায়নের জাতক কথার চতুর্থ ভাগ আমার হাতে এসে পড়ে। এই জাতক কথার কুম্ভকার জাতকের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেখানে চার প্রত্যেক বুদ্ধের কথা দেওয়া হয়েছে। জৈনাগমের চার প্রত্যেক বুদ্ধের কথার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। সেই কথানকই সামান্য পাঠভেদে এখানে দেখে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। আমি তখন তাদের তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করি। এই প্রবন্ধ সেই অধ্যয়নেরই ফল।

যেমন আগেই বলেছি, বৌদ্ধরা উত্তরাধ্যয়ন সূত্র হতে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথার মূলও উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ১৮ অধ্যয়নের দুইটী গাথা এবং চারজন প্রত্যেক বুদ্ধের একজন নমির উপরত একটী স্বতন্ত্র অধ্যয়নই রয়েছে। এই সূত্রের টীকাকারেরা পরম্পরাক্রমে আগত কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। মূলেত কেবলমাত্র চার জনের নাম, স্থান ও প্রব্রজ্যা গ্রহণের উল্লেখ মাত্রই আছে। নীচে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রাপ্ত চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথার রূপ দেওয়া হচ্ছে। সে হতেই এদের সাম্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

প্রথমে বৌদ্ধ কুম্ভকার জাতকে প্রত্যেক বুদ্ধ কথা যেরূপে দেওয়া হয়েছে তা বিবৃত করছি।

(১)

বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা যখন রাজত্ব করছেন তখন বারাণসীদ্বার গ্রামে কুম্ভকার কুলে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে

তিনি বিবাহ করেন ও কুল ব্যবসায়ের দ্বারা তাঁর আজীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। পরে তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা হয়।

সেই সময় কলিঙ্গ দেশে দন্তপুর নগরে করণ্ডু নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি একবার উদ্যানে যাবার পথে ফলভার নম্র এক আম্রবৃক্ষকে দেখতে পেলেন। হাতীর ওপর বসেই তিনি একটি আম ভেঙে নিলেন ও উদ্যানে গিয়ে মঙ্গল-শীলায় বসে যাঁদের দেওয়া উচিত তাঁদের ভাগ দিয়ে নিজে সেই আম গ্রহণ করলেন। রাজা আম ভেঙে খেয়েছেন দেখে তাঁর অনুচরেরা আম ভেঙে খাওয়া উচিত মনে করলেন। তাই মন্ত্রী, পুরোহিত, গৃহপতি সকলেই তখন সেই গাছের আম ভেঙে খেলেন। তাঁদের পরে যাঁরা এলেন তাঁরা গাছে চড়ে লগি দিয়ে আম ফেলে, ডালপালা ভেঙে কাঁচা আম পর্যন্ত খেয়ে গেলেন।

রাজা সমস্ত দিন উদ্যানে রইলেন, সন্ধ্যার সময় আবার হাতীতে বসে প্রাসাদে ফিরে চললেন। সেই আম গাছটীর কাছে এসে গাছের দুরবস্থা দেখে হাতীর পিঠ হতে তিনি নীচে নেমে এলেন ও সেই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন: সকালে যে গাছটা দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছিল, ফলভারনম্র সেই গাছটী দেখতে কত সুন্দর লাগছিল এখন ফলরহিত দুমড়ানো মোচড়ানো গাছটী কত অসুন্দর লাগছে। তারপর তিনি যে গাছে ফল ধরেনা তাদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন: এরা ফল রহিত হওয়ায় মুণ্ডমণি পাহাড়ের মতো সুন্দর লাগছে ও এই গাছটী ফলযুক্ত হওয়ায় এই দুর্দশা প্রাপ্ত হয়েছে। গৃহবাস ফলযুক্ত বৃক্ষের মতো ও প্রব্রজ্যা ফলরহিত বৃক্ষের মতো। যে ধনবান তারই ভয়, অকিঞ্চনের আবার ভয় কী? আমারও ফলরহিত বৃক্ষের মতো হওয়া উচিত। এইভাবে ফলবান বৃক্ষের ধ্যান করে সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই তিনটী লক্ষণের ওপর বিচার করে বিপশ্যনা ভাবনায় অভিবৃদ্ধি করলেন। তারপর সেই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন: মায়ের কুক্ষীরূপ কুটীরের আমি নাশ করেছি, ত্রিভুবনে জন্মগ্রহণের সম্ভাবনাকে আমি ছিন্ন করেছি, সংসাররূপী আবর্জনা স্থান আমি পরিষ্কার করেছি, অশ্রুরূপ সমুদ্রকে আমি পরিশুষ্ক

করেছি, হাড়ের চতুর্দিকের দেয়াল আমি ভেঙে ফেলেছি, আর আমার জন্ম হবে না। এইপ্রকার ভাবতে ভাবতে অলঙ্কার ভূষিত অবস্থায় তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক সময় অতীত হয়ে গেল।

রাজা প্রত্যুত্তর দিলেন, আমি ত রাজা নই, আমি প্রত্যেক বুদ্ধ।

মন্ত্রী বললেন, দেব, প্রত্যেক বুদ্ধ আপনার মতো এরকম হন না।

তবে কি রকম হন ?—রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

তাঁর মাথার চুল মুণ্ডিত হয়। তিনি বাতাসে নষ্টমেঘ ও রাহুমুক্ত চন্দ্রের মতো হন। তিনি হিমালয়ের নন্দমূল পর্বতে অবস্থান করেন। দেব, প্রত্যেকবুদ্ধ এরকম হন।

রাজা তখন হাত তুলে তাঁর মাথার উপর রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজবেশ লুপ্ত হয়ে গেল ও শ্রমণবেশ প্রকটিত হল।

তী চীবরঞ্চ পত্তো চ
বাসিং সূচী চ বন্ধনং।
পরিস্সাবণেন অট্‌ঠেতে
যুত্তযোগস্স ভিক্‌খুণো॥

যোগী ভিক্ষুর তিন চীবর, এক পাত্র, এক ছুরী, এক কুঠার, এক কায়াবন্ধন ও একটী জল ছাঁকবার কাপড় এই আঠ 'পরিষ্কার' হয়।

এই আঠ পরিষ্কার রাজার শরীরে প্রকটিত হল ও তিনি আকাশে উত্থিত হয়ে জন সমুদায়কে উপদেশ দিয়ে আকাশ পথে উত্তর হিমালয়ের নন্দমূল পর্বতের দিকে চলে গেলেন।

(২)

গান্ধার রাজ্যের তক্ষশিলা নগরে নগ্‌গজী নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি একদিন প্রাসাদে বসে একটী মেয়েকে দেখতে পেলেন। মেয়েটী বসে বসে বাঁটনা বাঁটছিল ও তার দুই হাতে এক একটী কঙ্কণ ছিল। রাজা দেখলেন মেয়েটীর হাতে এক একটী কঙ্কণ থাকবার জন্য তারা না পরস্পরের

সান্নিধ্যে আসছে, না শব্দ করছে। মেয়েটী বাঁটনা বাঁটতে বাঁটতে ডান হাতের কঙ্কণ বাঁ হাতে পরে নিল ও ডান হাতে মসলা তুলতে লাগল। এখন দুটো কঙ্কণ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবার জন্য ঘসা লেগে শব্দ করতে লাগল। তখন রাজা মনে মনে বিচার করতে লাগলেন কঙ্কণ দুটী যখন পৃথক ছিল তখন ঘষা লাগছিল না, শব্দও হচ্ছিল না। এখন একে অন্যের সান্নিধ্যে আসার জন্য ঘষা লাগছে ও শব্দ করছে। এইরকম জীবও যখন একেলা থাকে তখন ঘষা লাগে না, শব্দ করে না। আমি কাশ্মীর ও গান্ধার এই দুই রাজ্যের ওপর রাজত্ব করি। আমারো উচিত এখন একটী কঙ্কণের মতো অন্যের ওপর অধিপত্য না করা ও আত্ম বিচার করতে করতে বিচরণ করা। এইভাবে ঘষা লাগা কঙ্কণের ধ্যান করতে করতে বসে বসেই তিনি তিন লক্ষণের বিচার করে বিপশ্যনা ভাবনার অভিবৃদ্ধি করলেন ও প্রত্যেক বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হলেন।

পরবর্তী আখ্যায়িকা পুর্বের মতো।

(৩)

বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরে নিমি নামে এক রাজা রাজ্য করতেন। প্রাতঃকালের আহারের পর একদিন তিনি মন্ত্রীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলেন। সামনের দোকান হতে একখণ্ড মাংস নিয়ে একটী চিল তখন তখনি উড়ে গেল। শকুনাদি অন্যান্য পাখীরা তখন তাকে ঘিরে চঞ্চু দিয়ে আঘাত করে সেই মাংসখণ্ড ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। পাখা দিয়ে তাকে আঘাত করতে লাগল ও নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে সেই চিল সেই মাংস খণ্ড ফেলে দিল। তখন অন্য একটী পাখী তা নিয়ে উড়ে গেল। তখন সব পাখীরা চিলকে ছেড়ে দিয়ে সেই পাখীর পেছনে তাড়া করল। তার মুখ হতে স্খলিত হলে তৃতীয় এক পাখী তা গ্রহণ করল। তখন তারা তাকেও সেইরকম কষ্ট দিতে লাগল। রাজা তখন সেই পাখীদের দেখে মনে মনে এইরকম বিচার করতে লাগলেন :

যে যে পাখী সেই মাংস খণ্ড গ্রহণ করল তারাই দুঃখ পেল। যারা ফেলে দিল তারা সুখী হল। এই পাঁচ কাম ভোগকে যে যে গ্রহণ করে

সে দুঃখী হয়। যে ছাড়ে সে সুখী হয়। এই কাম ভোগ অল্পের কাছে সামান্যই আছে কিন্তু আমার ত ষোল হাজার স্ত্রী রয়েছে। যে মাংসখণ্ড ছেড়ে দিয়েছে সেই চিলের মতো পাঁচ কাম ভোগ পরিত্যাগ করে আমারো সুখ পূর্বক বিচরণ করা উচিত। তিনি এইভাবে ঠিক ঠিক বিচার করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিপশ্যনা ভাবনার অভিবৃদ্ধি করলেন ও প্রত্যেক বোধি জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন।

পরবর্তী আখ্যায়িকা পূর্বের মতো।

(৪)

উত্তর পাঞ্চাল রাজ্যে কম্পিলা নগরীতে দুর্মুখ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ভোর বেলায় খাবার পর সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে তিনি অমাত্যগণসহ অলিন্দে বসে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের দিকে চেয়েছিলেন। সেই সময় গোয়ালারা গো বাথানের দরজা খুলল। একটা ষাঁড় সেই বাথান হতে বেরিয়ে এল ও কামপরবশ হয়ে একটা গরুর পেছনে দৌড়ে গেল। সেখানে একটা তীক্ষ্ণ সিংওয়ালা বড় ষাঁড় দাঁড়িয়েছিল। সেও কামপরবশ হয়ে পূর্বোক্ত ষাঁড়ের পেটে তার তীক্ষ্ণ সিং প্রবেশ করিয়ে দিল। সিংয়ের আঘাত এত তীব্র হয়েছিল যে সেই এক আঘাতে সেই ষাঁড়ের পেটের নাড়ীভুঁড়ি সব বেরিয়ে এল ও সে সেইখানেই মারা গেল।

রাজা তাই দেখে ভাবতে লাগলেন পশু হতে আরম্ভ করে সমস্ত প্রাণী কামুকতার জন্য কষ্ট পায়। এই ষাঁড়টা কামুকতার জন্যই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। অন্য প্রাণীও কামুকতার জন্য কষ্ট পায়। আমার উচিত প্রাণীদের মৃত্যুর কারণ কাম ভোগের পরিত্যাগ করা। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিন লক্ষণের বিচার করে বিপশ্যনা ভাবনার অভিবৃদ্ধি করলেন ও প্রত্যেক বোধি জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন।

পরবর্তী আখ্যায়িকা পূর্বের মতো।

একদিন সেই চারজন প্রত্যেক বুদ্ধ ভিক্ষাটনের সময় নন্দমূল পর্বত হতে নির্গত হয়ে অনোতপ্ত সরোবরের ধারে প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করে নাগলতার দাঁতন দিয়ে মুখ প্রক্ষালিত করলেন। তারপর মণিশীলার ওপর দাঁড়িয়ে চীবর পরে পাঁচ চীবর আরো সঙ্গে নিয়ে যোগবলে আকাশ পথে বারাণসীর

দ্বারগ্রামের স্বল্প দূরে অবতরণ করলেন। তারপর চীবর পরিধান করে পাত্র নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলেন ও ভিক্ষাটন করতে করতে বোধিসত্ত্বের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বোধিসত্ত্ব তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আহার করালেন ও তাঁদের ভিক্ষু হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তাঁরা চারজন নিজের নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁদের ভিক্ষু হবার কারণ এক এক গাথায় বিবৃত করলেন।

প্রথম জন বললেন :

অম্বাহ মদ্দ্টং বনমন্তরস্মিং
নীলোভাসং ফলিতং সংবিরুলহং।
কং মট্টসং ফলহেতুবিভাগমং
তং দিস্বা ভিক্‌খাচরিয়ং চরামি॥

আমি ফলভারনম্র আম্র বৃক্ষকে বনে দেখলাম। ফলের জন্য তাকে আবার দুমড়ে মুচড়ে ফেলতেও দেখলাম। তাই দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম।

দ্বিতীয় জন বললেন :

সেলং সুভট্ঠং নরবীরনিট্ঠিতং
নারীযুগ ধারীয়ি অপসট্টং।
দুভিয়ং চ আগম্য অহোসি সট্টো
তং দিস্বা ভিক্‌খাচরিয়ং চরামি॥

চতুর কারিগর নির্মিত কঙ্কণ-যুগ্ম নারী যখন পৃথক পৃথক ধারণ করল তখন তারা নীরব ছিল কিন্তু যখন তারা এক হাতে এল তখন শব্দ করতে লাগল। তাই দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম।

তৃতীয় জন বলল :

দিজং দিজং কুণবমাহরন্তং
একং সমানং বহুকা সমেচ্চ।
আহার হেতুপরিপাতবিদ্ধতং
দিস্বা ভিক্‌খাচরিয়ং চরামি॥

যে পাখী মাংসের টুকরো নিয়ে যাচ্ছিল তাকে অন্য পাখীরা এসে মেরে ফেলে দিল। তাই দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম।

চতুর্থ জন বলল :

উসভাহ মট্টং যুথস্স মজ্ঝে
চলক্কুং বন্ন বলুপপন্নং।
তমদ্দসং কামহেতুবিতুন্নং
তং দিস্বা ভিক্খাচরিয়ং চরামি ॥

আমি বর্ণ ও বল যুক্ত ষাঁড়কে গোব্রজে দেখলাম। তাকে কাম বাসনার জন্ম মৃত্যু মুখে পতিত হতে দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম।

বোধিসত্ব তাঁদের এক একটী গাথা শুনে প্রত্যেক বুদ্ধদের স্তুতি করলেন ও বললেন, ভন্তে, এই ধ্যান আপনাদেরই যোগ্য। তারপর তাঁরা চলে গেলে বোধিসত্ব তাঁর স্ত্রীর নিকট নিজের প্রব্রজ্যা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নিম্নলিখিত গাথায় ব্যক্ত করলেন :

করণ্ডু নাম কলিংগানাং
গন্ধারানঞ্চ নগ্গজী
নিমি রাজাবিদেহানাং
পঞ্চালানাঞ্চ দুম্মুখো।
এতে রট্‌ঠা নিহিত্বান
পংব্বজিংসু অকিঞ্চনা ॥
সর্বেপি মে দেবসমা সমাগন্তা
অগ্নি যথা পংজলিতো তথাবিমে
অহংপি একোব বরিস্সামি ভগ্গবি
হিত্বান কামানি যথোধিকানি ॥

কলিঙ্গ নরেশ করণ্ডু, গান্ধার নরেশ নগ্গজী, বিদেহ নরেশ নিমি ও পাঞ্চাল নরেশ দুর্মুখ এই চারজন রাজ্য পরিত্যাগ করে অকিঞ্চন হয়ে প্রব্রজিত হয়েছেন। এঁরা প্রজ্বলিত অগ্নির মতো শোভায়মান দেবতাদের মতো আমাদের এখানে এলেন। হে সুলক্ষণা, আমিও কামভোগরূপ উপাধিকে পরিত্যাগ করে এখন একলা বিচরণ করব।

বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র এখানেই শেষ হচ্ছে। এখন জৈন সাহিত্যের কথা বস্তু অনুসারে এদের সাম্যের ওপর বিচার করব।

উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ১৮ প্রকরণে নিম্নলিখিত গাথায় চার প্রত্যেক বুদ্ধের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করা হয়েছে :

করকংডু কলিংগেসু
পাংচালেসু য দুম্মুহো।
নমী রায়া বিদেহেসু
গংধারেসু য নগ্‌গই ॥ ৪৬ ॥
এএ নরিংদবসভা
নিক্‌খংতা জিণসাসণে
পুত্তে রজ্জে ঠবিত্তাণং
সামন্নে পজ্জুবট্‌ঠিয়া ॥ ৪৭ ॥

কলিঙ্গ দেশে করকণ্ডু, পাঞ্চাল দেশে দুর্ম্মুখ, বিদেহে নমি ও গান্ধার দেশে নগ্‌গই নামে রাজা হয়েছেন। নরেন্দ্রদের মধ্যে বৃষভের সমান শ্রেষ্ঠ এই চারজন রাজা পুত্রদের রাজ্য ভার দিয়ে সংসার পরিত্যাগ করে শ্রমণ ধর্মে প্রব্রজিত হয়ে জিন শাসনে দীক্ষিত হন।

বৃহৎ বৃত্তিকার উপরোক্ত গাথার পাঠ এই প্রকার দিয়েছেন—

করকংডু কলিংগাণাং
পংচালাণং য দুম্মুহো
ণমিরায়া বিদেহাণাং
গংধারাণং য নগ্‌গই···

এই গাথায় সমস্ত পদ ষষ্ঠ্যন্ত যখন কি উপরিলিখিত গাথায় সপ্তমী বহু বচনান্ত। বৌদ্ধ সাহিত্য এই গাথা দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদের পরস্পর পরিবর্তনের অতিরিক্ত প্রায় একই রূপ। তবে সেখানে পাঠক অবশ্যই দেখবেন যে 'এতে রট্‌ঠা নিহিত্বান' ইত্যাদি পংক্তি আর একটী পংক্তির অপেক্ষা রাখে। সেই পংক্তি কী উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ৪৭ গাথার প্রথম পদ 'এ এ নরিংদবসভা' ইত্যাদি ?—যেখানে এই সব নৃপতিদের জৈন শাসনে দীক্ষিত হওয়া প্ররূপিত হয়েছে। এ হতে মনে হয় যে বৌদ্ধরা এই পংক্তিকে জানতঃই পরিত্যাগ করেছেন।

[ক্রমশঃ

বর্দ্ধমান মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

বর্দ্ধমানের স্পষ্টীকরণে পার্শ্বাপত্য স্থবিরদের সংশয় নিরসিত হয়েছে। বিশ্বাস হয়েছে যে ভগবান বর্দ্ধমান সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। তখন তাঁরা বর্দ্ধমানের বন্দনা করে বললেন, ভগবন্, আমরা চতুর্যাম ধর্মের পরিবর্তে আপনার কাছে পঞ্চযাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাই।

পার্শ্ব প্রবর্তিত চতুর্যাম ধর্ম অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ। বর্দ্ধমান এর সঙ্গে ব্রহ্মচর্য যোগ করে পঞ্চযাম ধর্ম প্রবর্তিত করেন।

বর্দ্ধমান বললেন, দেবানুপ্রিয়, তোমরা সানন্দে তা করতে পার।

বর্দ্ধমানের সঙ্গে পার্শ্বাপত্য শ্রমণদের যখন সেই বার্তালাপ চলছিল তখন শ্রমণ রোহ বর্দ্ধমান হতে খানিক দূরে বসে সেই বার্তালাপ শুনছিল। সেই বার্তালাপ শুনতে শুনতে তার মনে কয়েকটী প্রশ্নের উদ্ভব হল। সে তখন বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, ভগবন্, প্রথমে লোক পরে অলোক, না প্রথমে অলোক পরে লোক?

বর্দ্ধমান বললেন, রোহ, এদের প্রথমেও বলতে পার, পরেও বলতে পার। কারণ এ দুটীই শাশ্বত। তাই এদের মধ্যে আগে পরে নেই।

রোহ আবার প্রশ্ন করল, ভগবন্, প্রথমে জীব পরে অজীব, না প্রথমে অজীব পরে জীব?

বর্দ্ধমান বললেন, রোহ, জীব ও অজীব এ দুটী শাশ্বত ভাব। তাই এদের মধ্যে আগে পরে নেই।

রোহ এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল আর বর্দ্ধমান তার প্রত্যুত্তর দিতে লাগলেন। শেষে রোহ প্রশ্ন করল, ভগবন্, প্রথমে বীজ পরে গাছ, না প্রথমে গাছ পরে বীজ।

বর্দ্ধমান বললেন, রোহ, গাছ কি ভাবে হয়?

বীজ হতে।

আর বীজ?

গাছ হতে।

তবেই, বললেন বর্দ্ধমান, এ দুটী শাশ্বত ভাব। এদের মধ্যে আগে পরে নেই।

রোহ সন্তুষ্ট হয়ে নিরুত্তর হল।

রোহ নিরুত্তর হতে গৌতম লোকস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করলেন। বর্দ্ধমান তার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে বললেন আকাশের ওপর বায়ু, বায়ুর ওপর জল, জলের ওপর পৃথিবী, পৃথিবীর ওপর জীব প্রতিষ্ঠিত?

গৌতম প্রশ্ন করলেন, ভগবন্ বায়ুর ওপর জল কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত?

বর্দ্ধমান বললেন, গৌতম, কোনো একটী মশক হাওয়ায় ভরে তার মাঝখানে যদি শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় ও পরে ওপরের ভাগের হাওয়া বার করে জলে ভরে মাঝের বাঁধন আলগা করে দেওয়া হয়, তবে সেই জল হাওয়ার ওপর থাকবে কিনা?

গৌতম বললেন, হাঁ ভগবন্।

বর্দ্ধমান বললেন, ঠিক এই রকম।

বর্দ্ধমান সেই বর্ষাবাস রাজগৃহে ব্যতীত করলেন। বর্ষাকাল শেষ হতে রাজগৃহ হতে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের দিকে প্রস্থান করলেন ও নানা গ্রামানুগ্রামে বিচরণ করতে করতে কচংগলা নগরীর ছত্র-পলাশ চৈত্যে এসে আশ্রয় নিলেন।

সেই সময় শ্রাবস্তীর নিকটস্থ একটী মঠে গর্দভালি শিষ্য কাত্যায়ন গোত্রীয় স্কন্দক বাস করত। সে পরিব্রাজক ধর্মাবলম্বী ছিল ও বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ আদি বৈদিক সাহিত্যে প্রবীণ ছিল। যে সময় বর্দ্ধমান ছত্র-পলাশ চৈত্যে এসে অবস্থান করছিলেন সেই সময় স্কন্দক কোনো কাজে শ্রাবস্তী এসেছিল। সেখানে কাত্যায়ন গোত্রীয় পিঙ্গলক নামে এক নির্গ্রন্থ শ্রমণের সঙ্গে তার দেখা হয়। পিঙ্গলক তাকে প্রশ্ন করে, মাগধ, এই লোকের অন্ত আছে কি না? সিদ্ধির অন্ত আছে কি না? সিদ্ধের অন্ত আছে কি না? কোন মৃত্যুতে জীব বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়?

স্কন্দক সেই পাঁচটী প্রশ্ন শুনল, মনে মনে চিন্তা করল, বিচার করল কিন্তু তাদের উত্তর দিতে পারল না। যতই সে এ বিষয়ে চিন্তা করতে লাগল ততই যেন তার সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। পিঙ্গলক দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার সেই প্রশ্ন করল। কিন্তু স্কন্দক তার কোনো প্রত্যুত্তরই দিতে পারল না।

স্কন্দক যখন পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই প্রশ্নের কথা ভাবছিল তখন সহসা বর্দ্ধমানের ছত্র-পলাশ চৈত্যে অবস্থানের কথা তার কানে এল। সর্বজ্ঞ এসেছেন, তীর্থংকর এসেছেন—

স্কন্দকের তখন সহসা মনে হল, এই প্রশ্নের বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে কেন না সে সমাধান করে নেয়।

স্কন্দক তখন তাড়াতাড়ি নিজের আশ্রমে ফিরে এল ও ত্রিদণ্ড কুণ্ডিকাদিতে সজ্জিত হয়ে শ্রাবস্তীর মধ্যে দিয়ে ছত্র-পলাশ চৈত্যে গিয়ে উপস্থিত হল।

ওদিকে চৈত্যের মধ্যে বসে বর্দ্ধমান গৌতমকে তখন বলছিলেন, গৌতম, আজ তোমার পূর্বপরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা হবে।

কে ভগবন্?

পরিব্রাজক কাত্যায়ন স্কন্দক।

ভগবন্, সে কি রকম? স্কন্দকের সঙ্গে এখানে কি ভাবে দেখা হবে?

গৌতম, শ্রাবস্তীতে শ্রমণ পিঙ্গলক স্কন্দককে কয়েকটী প্রশ্ন করে যার সে প্রত্যুত্তর দিতে পারে নি। আমি এখানে আছি জেনে সে সেই প্রশ্নের সমাধানের জন্য এখানে আসছে। চৈত্যের দরজায় সে এসে পড়েছে। আর একটু পরেই সে ভিতরে আসবে।

ভগবন্, স্কন্দকে কি আপনার শিষ্য হবার যোগ্যতা আছে?

হাঁ গৌতম, স্কন্দকের সে যোগ্যতা আছে এবং সে আমার শিষ্য হবেও।

বর্দ্ধমানের কথা শেষ হতে না হতেই স্কন্দককে আসতে দেখা গেল। তাকে দেখতেই গৌতম উঠে তার নিকটে গেলেন ও তাকে স্বাগত করে বললেন, মাগধ, একথা কি সত্যি যে শ্রাবস্তীতে পিঙ্গলক তোমায় কয়েকটী প্রশ্ন করে যার প্রত্যুত্তর না দিতে পেরে তুমি এখানে এসেছ?

স্কন্দক বলল, হাঁ গৌতম, তা সত্যি। কিন্তু গৌতম, এমন কোন

জ্ঞানী ও তপস্বী এখানে রয়েছেন যিনি আমার মনের কথা তোমায় বলে দিয়েছেন ?

স্কন্দক, আমার আচার্য শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমানই সেই জ্ঞানী ও তপস্বী। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তিনি তোমার মনের কথা আমায় বলে দিয়েছেন।

তবে আমায় তাঁর কাছে নিয়ে চল। তাঁকে গিয়ে আমি প্রণাম করি।

এসো।

এক সঙ্গেই গৌতম ও স্কন্দক বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বর্দ্ধমানকে দেখা মাত্র স্কন্দকের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেল। বর্দ্ধমানের দিব্য দেহ, করুণাময় চোখ, মধুক্ষরা বাণী তার মনে অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার করল। সে তাই করজোড়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

বর্দ্ধমান বললেন, স্কন্দক, লোক সাদি না অনন্ত—এই তোমার প্রশ্ন ?

হাঁ ভগবন্।

স্কন্দক, দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ভেদে লোক চার রকম। দ্রব্য স্বরূপে লোক সান্ত। কারণ তা ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, জীব ও পুদ্গলরূপ পঞ্চদ্রব্যময়। ক্ষেত্র স্বরূপে লোক বহু বিস্তৃত হলেও সান্ত। কাল স্বরূপে তা পূর্বেও ছিল, এখনো আছে পরেও থাকবে তাই অনন্ত, নিত্য ও শাশ্বত। আর ভাব রূপেও লোক অনন্ত কারণ তা অনন্ত বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শ-সংস্থান, গুরু-লঘু, অগুরু-লঘু পর্যায়াত্মক। অনন্ত পর্যায়াত্মক বলেই তা অনন্ত।

স্কন্দক, এভাবে জীবেরও দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব দ্বারা বিচার করতে হবে। দ্রব্য স্বরূপে জীব দ্রব্যের সঙ্গে এক হওয়ায় সান্ত। ক্ষেত্র স্বরূপে জীব অসংখ্য আকাশ প্রদেশ ব্যাপী হলেও সান্ত। কাল স্বরূপে জীব অনন্ত কারণ তা পূর্বে ছিল, এখনো আছে, পরেও থাকবে। ভাব স্বরূপেও জীব অনন্ত। কারণ তা জ্ঞান, দর্শন ও চরিত্রের অনন্ত পর্যায়ে পরিপূর্ণ ও অনন্ত অগুরু-লঘু পর্যায় স্বরূপ।

স্কন্দক, এ ভাবে দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ভেদে সিদ্ধি ও সিদ্ধও চার-প্রকার। সান্ত, সান্ত, অনন্ত, অনন্ত। আর কোন মৃত্যুতে জীব বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয় ? স্কন্দক, মৃত্যু দু'রকমের : এক বাল-মরণ, অন্য পণ্ডিত-মরণ। সংসার চক্রে ভ্রমণ করতে করতে যে মরণে মানুষ সাধারণতঃ মৃত্যু

প্রাপ্ত হয় তা বাল-মরণ। সেই মৃত্যুতে তার সংসার ভ্রমণ আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্কন্দক, এ ভাবে মৃত্যুতে জীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিত-মরণে যে আসনে বসে অনশন স্বীকার করা হয় সেই আসনে ধর্ম ধ্যান করতে করতে মৃত্যু বরণ করা হয়। এই মৃত্যুতে জীবের সংসার চক্রে ভ্রমণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তাই এই মৃত্যুতে জীবের হ্রাস হয়।

বর্দ্ধমানের স্পষ্টীকরণে স্কন্দকের সংশয় ছিন্ন হল। সে প্রতিবুদ্ধ হয়ে বর্দ্ধমানের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করে পণ্ডিত-মরণে অনশনে দেহ ত্যাগ করে সংসার ভ্রমণ হ্রাস করে দিল।

ছত্র পলাশ চৈত্য হতে বর্দ্ধমান শ্রাবস্তীর কোষ্ঠক চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন। সেখানে সালিহীপিতা প্রমুখ ব্যক্তিদের শ্রাবক ধর্মে দীক্ষিত করে তিনি বাণিজ্যগ্রামে এলেন। সেই বছরের বর্ষাবাস তিনি বাণিজ্যগ্রামেই ব্যতীত করবেন।

[ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ ৬ ॥

জীবন ধারণের জন্য অন্নের প্রয়োজন আছে। যা পোষণ করে তা গ্রহণ না করে কেউ বাঁচতে পারে না। এ কথা যদি সত্যি হয়, তবে আচার্য কোণ্ডিন্য বা তাঁর মতো অন্য কুলপতির তাপসেরা অন্নের অভাবে বা কণিকা মাত্র আহার গ্রহণ করে, বা ক্ষেতের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা নীবারের ওপর কি করে বছরের পর বছর বেঁচে থাকে?

দ্বিতীয় মাসের উপবাস টানবার সময় অগ্নিশর্মাকে হাড়ের পিঁজরা ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কয়েকটা হাড়ের একটা খাঁচা যেন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে বা বসে রয়েছে। কেউ যদি তাকে একটু ধাক্কা দেয় তবে তা ভেঙে ছড়িয়ে যায়। তা সত্বেও তার মুখে তপস্যার যে দিব্য লাবণ্য ফুটে উঠেছিল তা দেখে একথা না বলেও আবার পারা যায় না যে অন্তরের নিগূঢ় পরিতৃপ্তির প্রবাহ বা আত্মার অনিঃশেষ আনন্দ ধারাই জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন।

অগ্নিশর্মা যখন দ্বিতীয় মাসের উপবাস আরম্ভ করে তখন তার মনে ক্ষোভ ত ছিলই, ক্রোধ ও নিরাশাও তাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গুণসেনের আসা ও ক্ষমা যাচনা তার অঙ্গে অঙ্গে আবার নূতন করে এক আত্ম পরিতৃপ্তির আনন্দ প্রবাহিত করে দিয়ে গেল। তখন তার মনে হতে লাগল যে অনাহারই আত্মার স্বভাব, আহার উপাধি মাত্র—যে উপাধির জন্য নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যের মতো বিকৃতি দেহ ও অন্তরকে বিকল ও পরতন্ত্র করে রেখেছে।

দুই-দুই তিন-তিন মাস উপবাসকারী এই সব তাপসেরা ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট

সহ্য করা কঠিন—সাধারণ মানুষের মনের এই ধারণাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দিয়েছিল। ক্ষুধাতুর মানুষ যে কোনো দুরাচার করতে পারে এই লোকোক্তিকেও তারা আরো মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছিল ও সংযমময় জীবনই যে জীবন তাও তাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করে দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে ভোগোপভোগ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকার চাইতে ত্যাগ ও সংযমের ঐশ্বর্য আরো বেশী শ্রেয়। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তারাই কাতর হয় যারা দুর্বলচিত্ত। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণাকেও অঙ্কুশের দ্বারা বশ করা যায়। যাঁরা বশ করেন তাঁরা মহারথী। এই কারণেই নগর হতে দূরে অবস্থিত এই সব তপস্বীদের দেখবার জন্য ও যথাশক্তি সেবা করবার জন্য নগর হতে লোক প্রয়াশঃই এসে থাকে। অগ্নিশর্মা ক্ষুধার উপর জয় লাভ করেছে, দেহ ও দেহাশ্রিত বাসনাকে গৃহপালিত পশুর মতো বশীভূত করেছে—তাই সে এখন সকলের নমস্য।

নাগরিকদের এদের উপেক্ষা না করবার আরো একটা কারণ ছিল। যারা আজ বিষয়রূপ মত্ত মাতঙ্গের ওপর জয় লাভ করেছে, কে জানে তারা একদিন আত্মার ওপর জয়লাভ করে আত্মার অনন্ত শক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে কিনা? ভৌতিক ঐশ্বর্যের চাইতে আত্মিক ঐশ্বর্য আরো বেশী লোভনীয় তা সেদিনের মানুষ কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেছিল।

অগ্নিশর্মা ও গুণসেন বস্তুতঃ সেযুগের দুই প্রতিনিধি ছিল। এক নীচ বর্গের অন্যে উচ্চ বর্গের। অগ্নিশর্মা নীচ বর্গের প্রতিনিধি ছিল। কিন্তু সেই বর্গের নীচেও আরো অনেক বর্গ ছিল। কুল ও জাতির অহংকারের জন্যই উঁচু নীচুর এই বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং একবার বিভেদের সৃষ্টি হয়ে গেলে ক্রমশঃ তা বাড়তেই থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাও একে অপরকে হীন বলে মনে করত। বস্তুতঃ প্রতিবর্গ দাঁড়িয়ে গেলেই সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। প্রাচীন সাহিত্যে ব্রাত্য কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণেরা ব্রাত্য বলে হীনমন্য করত অপরপক্ষে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের ভিক্ষুক বলে নিন্দিত করত। ব্রাত্যরা অসংস্কৃত ও অসভ্য বলে অধিক সংখ্যায় যেখানে বাস করত সেখানে পা রাখাও ব্রাহ্মণদের আবার পাপ বলে মনে হত।

এই সব ভেদ বিভেদের সঙ্কীর্ণতায় যদি কখনো কোনো জ্ঞানী, তপস্বী বা

পরাক্রমীর জন্ম হত, তবে সেই সঙ্কীর্ণতার সীমারেখাগুলো আবার স্বভাবতঃই মিলিয়ে যেত। শক্তিশালীকে সকলেই শিরোধার্য করে নিত।

অগ্নিশর্মা ভিক্ষুক কুলে জন্মগ্রহণ করেছিল। তবুও কঠোর তপস্যা ও দেহ দমনের জন্য সে এখন বহু লোকের পূজ্য হয়ে গিয়েছিল। অগ্নিশর্মা ব্রাহ্মণকুলের মাথায় গৌরবের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল। যে কুলে এমন তপস্বীর জন্ম হয় সে কুলকে আর ভিক্ষুক বলা যায় না। এভাবে সঙ্কীর্ণ সীমারেখাগুলোও আবার ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল।

॥ ৭ ॥

গুণসেন আজ সকাল হতেই সাবধান ছিল। অগ্নিশর্মার দ্বিতীয় মাসের উপবাস পূর্ণ হওয়ায় আজ সে ভিক্ষার জন্য আসবে—দ্বিতীয়বার যাতে তার ভুল না হয়।

অগ্নিশর্মাকে কি কি আহার্য দ্রব্য সে ভিক্ষা দেবে সে কথাই সে চিন্তা করছিল। তারপর যখন পাচককে ডেকে সে কথা বলতে যাবে সেই সময় তার ঘরে মহামাত্য এসে প্রবেশ করলেন।

মহামাত্যকে কেমন যেন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তাঁর গম্ভীর মুখে চিন্তার এক প্রগাঢ় ছাপ পড়েছিল। যদিও বাইরে তিনি নিরুদ্বিগ্নতার ভাব দেখাচ্ছিলেন তবুও তাঁর উদ্বিগ্নতার পরিমাপ করতে গুণসেনের একটুও সময় লাগল না।

আসুন বলে গুণসেন তার প্রতিদিনের বিনয়নম্র শৈলীতে তাঁকে স্বাগত জানাল।

মহামাত্য প্রস্তাবনা বা ভূমিকা করবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করলেন না। সহসাই বলে উঠলেন: সীমান্তবর্তী রাজাদের এখন দুঃসাহস বেড়ে গেছে। এই বলে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

গুণসেন তার শ্বশুরের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিল। তাঁর ঔদার্যের অপব্যবহার হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক ঔদার্য বশেই তিনি সে সব সহ্য করে যেতেন।

কিন্তু আজ আর শ্বশুরের শাসন নয়, গুণসেনের শাসন। তাকেও হয়ত

তারা তাঁর মতোই ভেবে নিয়েছে, সেকথা তার মনে হল। মহামাত্যের মুখে তাই সে সম্পূর্ণ তথ্য জানবার জন্ত উৎসুক হয়ে উঠল।

মহামাত্য তখন বললেন গুপ্তচরেরা এইমাত্র সংবাদ নিয়ে এসেছে যে আমাদের সীমান্তবর্তী পাহাড়ের ওপর আক্রমণ চালিয়ে আমাদের নিদ্রিত সৈনিকদের মানতুঙ্গ হত্যা করেছে।

মহামাত্য আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গুণসেন তার মধ্যেই বলে উঠল: আপনি তার চিন্তা করবেন না। সৈন্তদের সজ্জিত হতে বলুন। আমার সামান্ত একটু কাজ আছে এর মধ্যে তা আমি সেরে নিচ্ছি।

কাজ যে অগ্নিশর্মাকে ভিক্ষা দেবার সেকথা সে মহামাত্যকে বলল না। বলবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করল না।

যেতে যেতে মহামাত্য বলে গেলেন আমি সেনাপতিকে তৈরী হতে বলে যাচ্ছি।

গুণসেন মৌনভাবে তার সম্মতি জানাল।

সীমান্তবর্তী ভিন্ন রাজ্যের এই ধরণের উৎপাত কেবল রাজনৈতিক ঘটনা মাত্রই ছিল না। সেই সংবাদ অতিশয়োক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাগরিকদের কাছে এসেও পৌছুত ও বিপত্তি যে তাদের ঘরের দরজায় এসে পড়েছে সেকথা মনে করে তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠত। যিনি থানার চৌকীদারদের অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করেছেন তিনি গুণসেনের অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে যে নগরে প্রবেশ করবেন না সে কথা কে বলতে পারে? ভয়ের আশঙ্কায় রাজপথ প্রায় জনশূন্ত হয়ে গিয়েছিল।

সেনাপতির কানে যেই সেই সংবাদ পৌছুল, তিনিও অমনি সৈন্তদের তৈরী হতে বলে গুণসেনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি যখন তার কাছে নাগরিকদের আশঙ্কা ও ভয়ের কথা বিবৃত করছিলেন সেই সময় মহামাত্য কর্তৃক প্রেরিত নৈমিত্তিকেরাও তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার
কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ
কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

May 1975

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

"The *Jain Journal* is a distinct addition to the tale of research periodicals published in India dealing specially with Jainism. There are original articles of very nigh value on Jaina thought and culture, life and religion, art and literature, history and biography, legend and story, and nothing which comes within what may be called Jainistics, is omitted. The printing is beautiful and the general get-up is quite artistic, with its well-reproduced illustrations, some in colours."

—Dr. Suniti Kumar Chatterji

Emeritus Professor of Comparative Philology, University of Calcutta and National Research Professor of India in Humanities.

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
তৃতীয় বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

চব্বিশজন তীর্থংকর সহ আদিনাথ

চালুক্য, খৃষ্টীয় ৯-১০ শতক

বৰ্দ্ধমান মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাণিজ্যগ্রাম হতে বর্ষাশেষ হতে বর্দ্ধমান এলেন ব্রাহ্মণকুণ্ডপুরের বহুশাল চৈত্যে।

বর্দ্ধমান যখন বহুশাল চৈত্যে অবস্থান করছিলেন তখন জমালি একদিন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন্, আমি আমার পাঁচশ' জন শিষ্যসহ পৃথক বিচরণ করতে চাই।

বর্দ্ধমান এর কোনো প্রত্যুত্তর দিলেন না।

জমালি তখন পর পর ত্বার আরো তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু বর্দ্ধমান কোনোবারেই তার প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন জমালি বর্দ্ধমানের অনুমতি ছাড়াই বর্দ্ধমানের শ্রমণ সংঘ হতে নিজেকে পৃথক করে নিলেন।

পাঁচশ জন শিষ্যসহ জমালি চলে যেতেই বর্দ্ধমান সেস্থান পরিত্যাগ করে বৎসভূমি হয়ে কৌশাম্বী এলেন। কৌশাম্বী হতে কাশী। তারপর রাজগৃহ।

বর্দ্ধমান যখন রাজগৃহে গুণশীল চৈত্যে অবস্থান করছিলেন তখন পার্শ্বাপত্য স্থবিরদের পাঁচশ জন বিচরণ করতে করতে রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী তুংগীয় নগরীতে পুষ্পবতী চৈত্যে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা এসেছেন জানতে পেরে তুংগীয়বাসীরা তাঁদের কাছে ধর্ম শ্রবণ করতে গেল। ধর্ম শ্রবণের পর তাঁরা প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, সংযমের কি ফল? তপস্যার কি ফল?

স্থবিরেরা প্রত্যুত্তর দিলেন, সংযমের ফল অনাস্রব, তপস্যার ফল নির্জরা।

শ্রমণোপাসকেরা তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, তাই যদি হয় তবে দেবলোকে দেবতা কি করে উৎপন্ন হয়?

প্রত্যুত্তরে কালিপুত্র স্থবির বললেন, প্রাথমিক তপস্যায় দেবলোকে দেব উৎপন্ন হয়।

মেহিল স্থবির বললেন, প্রাথমিক সংযমে দেবলোকে দেব উৎপন্ন হয়।

আনন্দরক্ষিত স্থবির বললেন, কার্ম্মিকতার জন্য দেবলোকে দেব উৎপন্ন হয়।

কাশ্যপ স্থবির বললে সংগিকতা বা আসক্তির জন্য দেবলোকে দেব উৎপন্ন হয়।

তাঁদের প্রত্যুত্তরে তুংগীয়বাসীরা সন্তুষ্ট হল ও স্থবিরদের বহুমান করে ঘরে ফিরে গেল।

ইন্দ্রভূতি গৌতম ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে শ্রমণোপাসকদের প্রশ্ন ও স্থবিরদের প্রত্যুত্তরের কথা শুনে এলেন। এসেই বর্দ্ধমানকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, রাজগৃহে স্থবিরদের প্রশ্নোত্তরের বিষয়ে যা শুনে এসেছি তা কি ঠিক? স্থবিরেরা কি সঠিক উত্তর দিয়েছেন? সেই উত্তর দিতে তাঁরা কি সমর্থ?

বর্দ্ধমান বললেন, তুংগীয়বাসীদের পার্শ্বাপত্য শ্রমণেরা যে প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তা ঠিক। তাঁরা যা কিছু বলেছেন তা সত্য। গৌতম, এ বিষয়ে আমারো এই মত যে পূর্ব সংযম ও পূর্ব তপের জন্যই শ্রমণেরা দেবলোকে দেবরূপে উৎপন্ন হন।

গৌতম তখন প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, এরকম জ্ঞানী শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের যাঁরা পর্যুপাসনা করেন তাঁরা কি ফল পান?

বর্দ্ধমান বললেন গৌতম, সে ধরণের জ্ঞানী শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের পর্যুপাসনার ফল সৎশাস্ত্র শ্রবণ।

ভগবন্, সৎশাস্ত্র শ্রবণের কি ফল?

গৌতম, সৎশাস্ত্র শ্রবণের ফল জ্ঞান।

ভগবন্, জ্ঞানের কি ফল?

জ্ঞানের ফল বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান।

জ্ঞান যখন আত্ম স্বরূপে ভাসমান হয় তখনি তা বিজ্ঞান।

ভগবন্, বিজ্ঞানের কি ফল?

বিজ্ঞানের ফল প্রত্যাখ্যান, অর্থাৎ আত্মস্বরূপে যখন তা ভাসিত হয় তখন সমস্ত প্রকার বৃত্তি আপনা আপনি শান্ত হয়ে যায়।

গৌতম আবার প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, প্রত্যাখ্যানের কি ফল?

বর্দ্ধমান বললেন, সংযম। অর্থাৎ বৃত্তি যখন আপনা আপনি শান্ত হয়ে যায় তখনি সর্বস্ব ত্যাগ রূপ সংযম উপলব্ধ হয়।

গৌতম আবারো প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, সংযমের কি ফল?

গৌতম, সংযমের ফল আস্রবরহিতত্ব। অর্থাৎ সংযম যার বিশুদ্ধ, পাপ ও পুণ্য তাকে স্পর্শ করে না, সে আত্মস্বরূপে অবস্থান করে।

ভগবন্, আস্রবরহিতত্বের কি ফল?

তপ।

এ সামান্য তপস্যা নয়, এ 'ত' বর্গ হতে 'প' বর্গে আসা। 'ত' বর্গ অহংকার, 'প' বর্গ পুরুষ সত্তা। তাই 'প' থেকে 'ত' নয় (পতন) 'ত' থেকে 'প' (তপস্)। অবরোহণ নয়, আরোহণ। অহংকার নাশে স্ব-স্বরূপ লাভ।

ভগবন্, তপের কি ফল?

গৌতম, তপের ফল কর্মমল নাশ।

ভগবন্, কর্মমল নাশের কি ফল?

নিষ্ক্রিয়তা।

ভগবন্, নিষ্ক্রিয়তার কি ফল?

নিষ্ক্রিয়তার ফল সিদ্ধি। অজরামরত্ব।

বর্দ্ধমান সেই বর্ষাবাস রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন।

শ্রেণিকের মৃত্যুর পর কূণিক মগধের রাজধানী রাজগৃহ হতে চম্পায় স্থানান্তরিত করেছিলেন। তাই অধিকাংশ রাজপুরুষেরা এখন চম্পায় বাস করে।

বর্দ্ধমান রাজগৃহ হতে চম্পার পূর্ণভদ্র চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন। তারপর সেখান হতে চলে গেলেন বিদেহ ভূমির দিকে। কাকন্দীতে কিছু-কাল অবস্থান করে তিনি এলেন মিথিলায়। সেই বর্ষাবাস তিনি মিথিলায় ব্যতীত করলেন।

মিথিলা হতে তিনি আবার অঙ্গদেশে ফিরে এলেন। কারণ বৈশালী তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। একদিকে মগধাধিপতি কূণিক ও তার বৈমাত্রেয় ভাইগণ, অন্যদিকে বৈশালী গণতন্ত্রের মুখ্যাধিনায়ক চেটক ও কাশী ও কোশলের আঠারো গণরাজ। যুদ্ধে কূণিকের বৈমাত্রেয় ভাইদের সকলে নিহত হলেও কূণিকের হাতে বৈশালী গণতন্ত্রের পতন হল। কূণিক বৈশালীকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে চম্পায় ফিরে এলেন।

বর্দ্ধমান কিছুকাল চম্পায় অবস্থান করে আবার মিথিলায় ফিরে গেলেন। সেই বছরের বর্ষাবাসও তিনি মিথিলায় ব্যতীত করলেন।

বর্ষাবাস শেষ হলে বৈশালীর নিকট দিয়ে তিনি শ্রাবস্তীর দিকে গমন করলেন ও শ্রাবস্তীতে এসে ঈশান কোণ স্থিত কোষ্ঠক চৈত্যে অবস্থান করলেন।

মংখলীপুত্র গোশালকও সেই সময় শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। বস্তুতঃ বর্দ্ধমানের সঙ্গ ত্যাগ করবার পর অধিকাংশ সময়ই তিনি শ্রাবস্তীতে ব্যতীত করেছিলেন। এই শ্রাবস্তীতেই তিনি তেজোলেশ্যা লাভ করেন ও নিমিত্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নিজেকে তীর্থংকর বলে প্রচারিত করে দেন।

শ্রাবস্তীতে গোশালকের দু'জন ভক্ত ছিলেন। এক, কুমোর পত্নী হালাহলা, দুই গাথাপতি অয়ংপুল। গোশালক সাধারণতঃ হালাহলার ভাণ্ড-শালাতেই অবস্থান করতেন।

বর্দ্ধমানের দীক্ষা গ্রহণের প্রায় দু'বছর পর গোশালক বর্দ্ধমানের সঙ্গ নেন ও প্রায় ছয় বছর তাঁর সঙ্গে থাকেন। তারপর বর্দ্ধমান হতে পৃথক স্বতন্ত্র আজীবিক মতের প্রতিষ্ঠা করেন।

গোশালক যতদিন বর্দ্ধমানের সঙ্গে ছিলেন ততদিন তিনি তাঁর প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন ছিলেন। অন্যে বর্দ্ধমানের সম্বন্ধে কিছু বললে তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু এখন আর তিনি সেই গোশালক নন তাঁর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন তিনি আজীবিক সম্প্রদায়ের নেতা ও তীর্থংকর। তাই বর্দ্ধমানের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী।

ইন্দ্রভূতি সেদিন ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে শুনে এলেন শ্রাবস্তীতে এখন দুই জন তীর্থংকর বিচরণ করছেন। এক, শ্রমণ বর্দ্ধমান, দুই আজীবিক গোশালক। তিনি এসেই সে কথা বর্দ্ধমানকে বললেন। বললেন, ভগবন্, গোশালক কি সত্যই সর্বজ্ঞ তীর্থংকর?

না গৌতম। গোশালক নিজেকে সর্বজ্ঞ তীর্থংকর বলে বলে বেড়ালেও সে তীর্থংকর নয়। প্রথম দিকে সে আমার সঙ্গে ছিল। পরে স্বতন্ত্র হয়ে স্বচ্ছন্দ বিহার করছে।

বর্দ্ধমানের সেই প্রত্যুত্তর সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা শুনলেন। তাঁরা ঘরে ফেরার পথে সে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন। ক্রমে সে কথা গোশালকের কানে গিয়ে উঠল। বর্দ্ধমান বলেছেন, গোশালক সর্বজ্ঞ তীর্থংকর নয়।

[ক্রমশঃ

জৈনাগম ও জাতকে বর্ণিত
চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথা

শ্রী বি. এল. নাহটা

[পূর্বানুবৃত্তি]

জাতকে এই চার প্রত্যেক বুদ্ধের প্রতিবোধ পাবার কারণস্বরূপ যে গাথা পাওয়া যায় তার পরিবর্তে উত্তরাধ্যয়নের চুর্ণিতে এই গাথা পাওয়া যায় :

বসহে য ইংদকেউ
বলএ অংবে য পুপ্ফিএবোহী।
করকংডু দুমুহস্সা
নমিস্স গংধার রন্নো য ॥

উত্তরাধ্যয়নের টীকা আদিতে চার প্রত্যেক বুদ্ধের জীবন চরিত্র যেভাবে পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

(১)

চম্পানগরে দধিবাহন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল পদ্মাবতী। পদ্মাবতী বৈশালী গণতন্ত্রের অধিনায়ক চেটকের মেয়ে ছিলেন। সন্তান সম্ভবা হলে তাঁর এক সময় দোহদ হয় যে তিনি হাতীতে চড়ে ছত্রধারী রাজার সঙ্গে বনে বিচরণ করবেন। রাজা তাঁর সেই দোহদ পূর্ণ করলেন কিন্তু বনে বিচরণ করবার সময় বর্ষার জলে ভেজা গুল্মের গন্ধে অভিভূত হয়ে হাতী তাঁদের গভীর হতে গভীরতর অরণ্যে নিয়ে গেল। ফলে সঙ্গী সাথীরাও পেছনে পড়ে গেল। শেষে হাতীর থামবার লক্ষণ না দেখে তাঁরা বটগাছের শাখা ধরে নীচে নামবেন স্থির করলেন। রাজা সেভাবে নেবে গেলেও, রাণী নামতে পারলেন না। হাতী তাঁকে আরো গভীর অরণ্যে নিয়ে গেল। শেষে সে এক সরোবরের ধারে এসে দাঁড়াল। রাণী তখন তার পীঠ হতে ধীরে

ধীরে নীচে নেমে এলেন। তিনি কোথায় এসেছেন, কোনদিকে যাবেন কিছুই স্থির করতে না পেরে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, খানিক দূর যেতে না যেতেই তাঁর এক তপস্বীর সঙ্গে দেখা হল। তপস্বী তাঁকে সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে বললেন। বললেন—খানিকদূর যাবার পর তুমি দন্তপুর যাবার পথ পাবে। দন্তপুরে গিয়ে সেখান হতে কোন সার্থবাহদের সঙ্গে চম্পানগরী চলে যেয়ো।

পদ্মাবতী দন্তপুরে গিয়ে এক উপাশ্রয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখান হতে চম্পানগরী না গিয়ে সাধ্বীদের উপদেশ শুনে সাধ্বীধর্ম গ্রহণ করলেন। তিনি যে আসন্ন-প্রসবা সেকথা কাউকে বললেন না। তারপর তাঁর যখন এক পুত্র হল তখন তাকে কম্বলে মুড়ে রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রাসহ শ্মশানে রেখে এলেন। শ্মশানপালক কচি জাতককে পেয়ে নিজের ছেলের মতো বড় করে তুলল ও তার হাতে চুলকানি থাকায় তার নাম রাখল করকণ্ডু। করকণ্ডু বড় হয়ে শ্মশানপালকের কাজ করতে লাগল।

করকণ্ডুর আবাসস্থানের কাছে এক সময় দণ্ডরত্ন উৎপন্ন হল। এই দণ্ডরত্ন সম্বন্ধে সাধুরা বললেন যে এই দণ্ডরত্ন যার কাছে থাকবে এর প্রভাবে সে রাজা হবে। সেকথা শুনে এক ব্রাহ্মণ সেই দণ্ডরত্ন নিতে এল কিন্তু করকণ্ডু তাকে তা নিতে দিল না। তখন সকলে বলল করকণ্ডু যখন রাজা হবে তখন সে যেন সেই ব্রাহ্মণকে একটা গ্রাম দান করে। করকণ্ডু তাতে স্বীকৃত হল কিন্তু দণ্ডরত্ন চুরী যাবার ভয়ে সে দন্তপুর পরিত্যাগ করে দণ্ডরত্ন নিয়ে কাঞ্চনপুরে চলে গেল।

কাঞ্চনপুরের রাজার সেই সময় মৃত্যু হয়। তাঁর কোনো পুত্র না থাকায় ও পাঁচটী দিব্য প্রকট হওয়ায় নগরবাসীরা করকণ্ডুকে রাজপদে অভিষিক্ত করল। নগর প্রবেশের সময় সেই দণ্ডরত্নের প্রভাবে করকণ্ডু সমস্তরকম বাধা প্রশমিত করল। করকণ্ডু রাজ্যলাভ করেছে শুনে সেই ব্রাহ্মণ করকণ্ডুর কাছে এসে তার গ্রাম প্রার্থনা করল। করকণ্ডু তাকে অভিপ্সিত গ্রাম নিয়ে নিতে বলল। ব্রাহ্মণ তখন বলল যে সে চম্পারাজ্যের অধিবাসী। সেখানকার কোনো গ্রাম যদি সে পায় তবে ভালো হয়।

করকণ্ড তখন পত্র দিয়ে দধিবাহনকে কাঞ্চনপুরের একটি গ্রামের বিনিময়ে

ব্রাহ্মণকে চম্পারাজ্যের একটি গ্রাম দিতে অনুরোধ জানালেন। দধিবাহন এতে অস্বীকৃত হলে করকণ্ডু চম্পারাজ্য আক্রমণ করল।

পিতাপুত্রের মধ্যে যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে সাধ্বী পদ্মাবতী সেখানে এসে পিতাপুত্রের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যুদ্ধ বন্ধ হল। দধিবাহন চম্পার রাজ্য করকণ্ডুকে দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

তারপর অনেককাল পরের কথা। করকণ্ডু তাঁর এক হৃষ্টপুষ্ট বৃষকে কালে জরাজীর্ণ হতে দেখে সংসারের বিতৃষ্ণ হলেন ও স্বয়ং প্রতিবোধ লাভ করে প্রত্যেকবুদ্ধ হলেন। তিনি নিজের হাতে চুল উৎপাটিত করেন ও দেবতাদের প্রদত্ত সাধুবস্ত্র পরিধান করে বিচরণ করতে লাগলেন।

সেযং সুজায়ং সুবিভত্ত সিংগং
জো পাসিয়া বসভং গোট্ঠ মজ্ঝে।
রিদ্ধিং অরিদ্ধিং সমুপেহিয়াণং
কালিংগ রায়া হি সমেক্খ ধম্মং॥

কম্পিলপুরে হরিকুলোদ্ভব জয় নামে এক রাজা রাজ্য করতেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল গুণমালা।

একবার রাজা জয় তাঁর দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর রাজ্যে এমন কী নেই যা অন্যের রাজ্যে রয়েছে। দূত প্রত্যুত্তর দিল তাঁর রাজ্যে চিত্র সভা নেই।

রাজা তখন চিত্র সভা নির্মাণের আদেশ দিলেন।

চিত্রসভার জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে এক প্রভাসম্পন্ন মুকুট পাওয়া গেল। রাজা ধুমধামের সঙ্গে সেই মুকুট মাথায় দিলেন। মুকুটের প্রভাবে তাঁর দুই মুখ দেখা যেতে লাগল। দুই মুখ দেখা যাবার জন্য লোকে তাঁকে দুম্মুহ বলে ডাকতে লাগল।

কালে দুম্মুহর সাত পুত্র হল। কন্যা না হওয়ায় রাণী গুণমালা এক যক্ষীর উপাসনা করে এক কন্যা রত্ন লাভ করলেন। তার নাম রাখা হল মদনমঞ্জরী। মদনমঞ্জরী যখন বড় হয়ে উঠেছে তখন দুম্মুহর মুকুটের কথা

উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের কানে গিয়ে পৌঁছল। তিনি সেই মুকুট প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। প্রত্যুত্তরে দুম্মুহ বলে পাঠালেন যে চণ্ডপ্রদ্যোৎ যদি তাঁকে তাঁর অনলগিরি হাতী, অগ্নিভীরু রথ, শিবাদেবী ও লোহজংঘ লেখবাহককে দেন তবেই তিনি তাঁকে সেই মুকুট দিতে পারেন। চণ্ডপ্রদ্যোৎ সেই প্রত্যুত্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে উজ্জয়িনী আক্রমণ করলেন কিন্তু সেই মুকুটের প্রভাবে যুদ্ধে পরাজিত হলেন।

চণ্ডপ্রদ্যোৎ যুদ্ধে পরাজিত হলেন কিন্তু মদনমঞ্জরীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর পাণি প্রার্থনা করায় দুম্মহ চণ্ডপ্রদ্যোতের সঙ্গে মদনমঞ্জরীর বিবাহ দিয়ে দিলেন।

একবার ইন্দ্রোৎসবের সময় দুম্মুহ ইন্দ্রধ্বজকে সুসজ্জিত করবার আদেশ দেন। সাতদিন পর উৎসব শেষে সেই ইন্দ্রধ্বজের দণ্ডটীকে শোভাহীনভাবে অমেধ্য ও অপবিত্র স্থানে পড়ে থাকতে দেখে পুদ্গল পরিণামের কথা চিন্তা করে দুম্মুহ সংসার বিরক্ত হন ও স্বয়ং প্রতিবোধ লাভ করে প্রব্রজিত হন।

জো ইংদকেউং সুয়লং কিয়েত্তং
দট্ঠুং পড়ংতং পবিলুপ্পমাণং।
রিদ্ধিং অরিদ্ধিং সমুপেহিয়াণং
পংচাল রায়াত্তি সমেক্খ ধম্মং ॥

[ক্রমশঃ

জৈন দর্শনে ধ্যান

পূরণচাঁদ নাহার

[নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনে দর্শন শাখায় 'জৈনদর্শনে ধ্যান' পঠিত হয় (৮ই-৯ই আষাঢ় ১৩৩০)। পরে ইহা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয় (শ্রাবণ ১৩৩০)। কার্যবিবরণীতে প্রবন্ধটির সারাংশ নিম্নরূপ: জৈনদর্শনে আত্মার ত্রিবিধ বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে—বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। যে আত্মা জড় বস্তুতেই নিজের অস্তিত্ব বোধ করে, নিজেকে চেতন স্বরূপ বলিয়া যে ধারণা করিতে পারে না, তাহাই বহিরাত্মা। যে আত্মা নিজেকে জড় হইতে পৃথক্ মনে করিয়া জড়ের উপর নিজ আধিপত্য স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই অন্তরাত্মা এবং যিনি পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মা। কোন বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাকেই ধ্যান বলা যাইতে পারে। উপরিউক্ত ত্রিবিধ অবস্থার প্রত্যেক অবস্থায় আত্মা যেরূপ ধ্যানক্রিয়াপরায়ণ থাকে, জৈন দর্শন হইতে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় আলোচ্য প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

—কার্যবিবরণী, ২য় ভাগ, পৃ, ১১১]

আস্তিক দার্শনিক মাত্রই আত্মা ও তাহার পুনর্জন্ম, বিকাশ ও মোক্ষ-যোগ্যতা কোন না কোন ভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিনটি প্রাচীন দর্শনে আত্মা সম্বন্ধীয় নানা প্রকার বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত তিনটি দর্শন শাস্ত্রে জড় ও চেতন এই উভয় বস্তুরই অস্তিত্ব এবং তাহাদের লক্ষণ, গুণ ও পর্যায়াদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। জৈন দর্শনে আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ সূক্ষ্ম বিচার থাকা সত্ত্বেও তাহার মূল গ্রন্থগুলি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হওয়ায় ও সেগুলি রীতিমত বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজের জানিবার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য থাকিলেও অনেক সময়ে তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন না। সুখের বিষয় এই যে বর্তমান সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই ক্রমশঃ জৈন দর্শন গ্রন্থ সমূহ সম্পাদিত হইতেছে। যদিও অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থের

সংখ্যা অধিক নহে তথাপি আশা করা যায় যে অচিরে অনেক গ্রন্থই অনায়াস-লভ্য হইবে এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ হইবে।

কর্মেন্দ্রিয় ও অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের বৃত্তি সকল নিরোধ পূর্বক মনকে ঈশ্বর বিষয়ে বা অন্য কোন উচ্চ লক্ষ্যে অভিমুখী করতঃ চিন্তা করাকে সচরাচর ধ্যান বলে। বস্তুতঃ যে কোন বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাই ধ্যান। জৈন মতে এই ধ্যান পূর্বোক্তরূপ কেবল ঈশ্বরারাধনাদি বিষয়ে নিয়োজিত না হইয়া নানা প্রকার হীন-বিষয়েও হইতে পারে। সুতরাং ধ্যানকে শুভ ও অশুভ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং শুভ ধ্যানই ক্রমশঃ উন্নত হইয়া শুদ্ধ ধ্যানে পরিণত হয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে জৈন দর্শনের ধ্যান সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করাও সম্ভবপর নহে, তবে নাম মাত্র যাহা বলা হইবে তাহা বুঝিবার জন্য জৈন-দর্শনে আত্মার স্বরূপ কিরূপ বর্ণিত আছে তাহা জানা আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথমে আত্মা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত অবতারণা করা হইল।

বেদান্তাদি অন্যান্য দর্শনে পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে পৃথক। কিন্তু জৈন দর্শনে অন্যরূপ—যাহা জীবাত্মা তাহাই পরমাত্মা। বেদান্ত মতে প্রত্যেক জীবাত্মাই পরমাত্মার বিকাশ মাত্র। ইহাতে জীবাত্মার অধিকারী জীবের তারতম্য অনুসারে জীবাত্মার কোন ইতর বিশেষ হয় না। কিন্তু জৈন দর্শনে জীবাত্মার এই অভেদ ভাব নাই। উক্ত মতে প্রত্যেক জীবে নিহিত জীবাত্মা বিভিন্ন। এই ব্যক্তিগত পার্থক্য বাদ দিলে জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভিন্নতা বিষয়ে বেদান্ত ও জৈন দর্শনের মত একই বলিয়া অনুমিত হইবে। যখন পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবই পরমাত্মার অধিকারী তখন তাহাদের মধ্যে মোহ ও অজ্ঞানতাদি দোষ থাকিবার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে জৈন দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক জীবাত্মারই পরমাত্মা হইবার সামর্থ্য আছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই সামর্থ্য প্রচ্ছন্নভাবে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা পরমাত্মা ভাবে অনুভূত হয় না। এই বিষয় বুঝাইবার জন্য দার্শনিকগণ আত্মার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হইতে তাহাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা: বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। এই বিভাগ আত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের ভাব ও অভাব

হইতেছেই করা হইয়াছে। প্রথমতঃ যে আত্মা আধ্যাত্মিক বিকাশ রহিত অর্থাৎ যে আত্মা জড়ত্বেই মাত্র আপনার অস্তিত্ব মনে করে ও যাহা জড়ের বশীভূত, তাহাই বহিরাত্মা। দ্বিতীয়তঃ যে আত্মা জড়ত্ব হইতে আপনাকে পৃথক বিবেচনা করে ও জড়ের প্রভাবে সর্বদা দলিত হয় না অর্থাৎ যাহা জড় বিকারের ও বাসনার উপর নিজের অধিকার স্থাপন আরম্ভ করিয়াছে তাহাই অন্তরাত্মা। তৃতীয়তঃ যে আত্মা মোহ ও অজ্ঞানতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই পরমাত্মা। আত্মার এই প্রকার বিভাগের তাৎপর্য এই যে একই আত্মা যতক্ষণ অজ্ঞানতা ও বিকারের দাস থাকে, ততক্ষণ বহিরাত্মা, আর যখন অধীনতা ও বিকারের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিজের স্বাভাবিক জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পায় এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হইয়া নিজের মধ্যেই আত্মার পবিত্র-মূর্তি দর্শন করে তখনই তাহা অন্তরাত্মা নামে অভিহিত হয়। আবার যখন অন্তরাত্মা সাধক-দশা হইতে সিদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়া পরমাত্মার ভাবকে প্রকাশিত করিতে পারে তখনই তাহার নাম পরমাত্মা। একণে দেখা যাইতেছে যে জীবাত্মাই আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারা পরমাত্মা পদ প্রাপ্ত হয় এবং পরমাত্মা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহার আবির্ভাব না হইলে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিকাশ না হইলে পরমাত্মা বহিরাত্মাই থাকিয়া যায়। একণে প্রশ্ন হইতে পারে এই অবস্থায় কি কি সাধনের দ্বারা আত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে জৈন দর্শন মতে প্রথম অবস্থায় আত্মা সর্বদা প্রবৃত্তিতে মগ্ন থাকে এবং যখন আত্মা বাসনা ও তদুৎপন্ন আপাত-তৃপ্তিতে মগ্ন থাকে তখন আত্মার বিকাশ অসম্ভব। সেই অবস্থায় আত্মার চিন্তাকে জৈন দার্শনিকগণ অশুভ ধ্যান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই আত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের অন্তরায় এবং পুনর্জন্মাদি দুঃখরাশির বৃদ্ধিকারক। কিন্তু যখন শুভ ধ্যান আরম্ভ হয় তখন বহিরাত্মার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের সূত্রপাত হয়। ফলতঃ জীবাত্মার শুভ ধ্যান অতিক্রম করিয়া যখন শুদ্ধ ধ্যান আরম্ভ হয় তখনই আধ্যাত্মিক বিকাশের মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে এই শুদ্ধ ধ্যানের পূর্ণতা হইবামাত্রই আত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের চরমোৎকৃষ্ট সাধিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই

অনুমিত হইতেছে যে অশুভ ধ্যান সংসার বৃদ্ধির কারণ; শুভ ধ্যান সংসার হ্রাসের কারণ; এবং একমাত্র শুদ্ধ ধ্যানই মোক্ষের কারণ। এই অশুভ ধ্যানকে জৈন দর্শনে আর্ত ও রৌদ্র নামক দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং শুভ ধ্যানকে ধর্মধ্যান রূপে ও শুদ্ধ ধ্যানকে শুক্লধ্যান রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৃষ্ণা, হিংসা, অসত্য, কাম, বাসনা, ইষ্ট-বিয়োগ জনিত শোক ও অনিষ্ট-সংযোগজনিত খেদাদি মানসিক বিকার আর্ত ও রৌদ্র ধ্যানের অন্তর্গত; শাস্ত্র চিন্তন ও তাত্ত্বিক বিচারাদি শুভ ধর্ম ধ্যানের অন্তর্গত এবং আত্ম নিরীক্ষণ ও নির্বিকল্পতাদি মানসিক ভাবগুলি শুক্ল ধ্যানের অন্তর্গত।

প্রাকৃত মূল জৈন সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী উভয় সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ধ্যান সম্বন্ধে তাঁহাদিগের গ্রন্থের নানা স্থানে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে 'স্থানাঙ্গ সূত্র' নামক তৃতীয় অঙ্গ ও 'ঔপপাতিক সূত্র' নামক প্রথম উপাঙ্গ প্রধান উল্লেখযোগ্য। জিনভদ্রগণি ক্ষমাশ্রমণ কৃত 'ধ্যান-শতক' নামক প্রাকৃত গ্রন্থে, যাহা 'আবশ্যক সূত্রে'র বৃত্তি টীকায় পাওয়া যায়, তাহাতে ধ্যানের সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। এতদ্ব্যতীত উমাস্বাতীকৃত 'তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র' ও শুভচন্দ্রাচার্যকৃত 'জ্ঞানার্ণব'-আদি গ্রন্থে চারি প্রকার ধ্যানের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাস ভাষ্যে চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ় এবং বিক্ষিপ্ত যে তিন ভূমিকার উল্লেখ আছে তাহাই জৈন মতে আর্ত ও রৌদ্র ধ্যান, উক্ত ভাষ্যে চিত্তের যে একাগ্র ভূমিকা বলা হইয়াছে তাহাই ধর্ম ধ্যান এবং তাহার যে নিরুদ্ধ ভূমিকা তাহাই শুক্ল ধ্যান। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মজ্ঝিম নিকায়', 'দীঘ নিকায়' আদি পাঠ করিলে যে ধ্যানের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাই জৈন দর্শনের ধর্ম ও শুক্ল ধ্যান এবং এই ধ্যানই প্রকৃত যোগ। মধ্য যুগের জৈনাচার্যেরা যোগ বিষয়ে যে গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যেও ধ্যান সম্বন্ধে বহুতর আলোচনা দেখা যায়। সচরাচর জৈন দার্শনিকগণ পূর্বোক্ত অশুভ ধ্যান অর্থাৎ চিত্তের একাগ্র ভাবে তুচ্ছ চিন্তাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: আর্ত ও রৌদ্র। এই আর্ত ধ্যান চারি প্রকার:

১। ইষ্ট বিয়োগ আর্ত ধ্যান। ইষ্ট অর্থাৎ প্রিয় বস্তুর বিয়োগ জনিত চিন্তা, শোক বিলাপনাদি অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি

স্বজন অথবা বন্ধু বান্ধব বিচ্ছেদ বা পশু পক্ষী প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী বা অন্য যে কোন বস্তু নষ্ট হইলে তজ্জন্য যে মানসিক দুঃখ ও সদা সর্বদা একমাত্র তদ্বিষয়ের চিন্তা তাহা এই আর্ত ধ্যানের বিষয়ীভূত।

২। অনিষ্ট সংযোগ আর্ত ধ্যান। অনিষ্ট অর্থাৎ অপ্রিয়, অমনোজ্ঞ বিষয়ের সংযোগ হইলে ইষ্ট বিয়োগের ন্যায় সর্বদাই তদ্‌গত চিন্তায় মগ্ন থাকাই দ্বিতীয় আর্ত ধ্যান।

৩। রোগ-চিন্তা আর্ত ধ্যান। শরীরম্ ব্যাধি-মন্দিরম্। অতএব এবিষয় অনেকেই বিদিত আছেন যে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত হইলে তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার চিন্তাই এই আর্ত ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত।

৪। অগ্র-শৌচ আর্ত ধ্যান। ভবিষ্যৎ চিন্তাও সময় সময় এরূপ প্রবল হয় যে অন্যান্য শুভাশুভ চিন্তাকে নষ্ট করিয়া একাই আধিপত্য করে। অগ্র-শৌচ আর্ত ধ্যানের বিষয় সংখ্যা অসীম, সাধারণতঃ কৃত কার্যের ইচ্ছা মত ভবিষ্যতে ফল প্রাপ্তি হইবে কি না ; বিষয়-সুখ সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভবিষ্য কামনাদিতে তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চিত্তকে উপহত করিয়া জীবাত্মাকে এই অগ্র-শৌচ আর্ত ধ্যানে আবদ্ধ রাখে।

উপরিউক্ত ইষ্ট-বিয়োগ, অনিষ্ট-সংযোগ রোগ জনিত বেদনাদি আর্তধ্যানের বাহ্য লক্ষণ চারি প্রকারে বর্ণিত আছে।

(ক) ক্রন্দনতা—চীৎকারাদি, (খ) শোচনতা—দীনতা প্রকাশ, (গ) তেপনতা —অশ্রু বিমোচনাদি ও (ঘ) পরিবেদনতা—পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট ভাষণাদি।

অশুভ ধ্যানের পরবর্তী বিভাগ রৌদ্র ধ্যান। ইহাকেও চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। হিংসানুবন্ধী আর্তধ্যান। প্রাণিঘাত অথবা বন্ধনাদি দ্বারা জীবকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রকার চিন্তাই হিংসানুবন্ধী রৌদ্র ধ্যান।

২। মৃষানুবন্ধী রৌদ্র ধ্যান। অসত্য ও মিথ্যা কথনের ও ছল কপটাদি অসৎ প্রবৃত্তিতে অধ্যবসায় যখন মানসিক বিচারে প্রবল থাকে সেই চিন্তাই মৃষানুবন্ধী রৌদ্র ধ্যান।

৩। স্তেয়ানুবন্ধী রৌদ্র ধ্যান। ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির বশে অপরের দ্রব্যাপহরণ অথবা প্রলোভনাদির দ্বারা অন্য জীবকে বঞ্চনা করিবার সর্বদা চিন্তা করাই স্তেয়ানুবন্ধী রৌদ্র ধ্যান।

৪। সংরক্ষণানুবন্ধী রৌদ্র ধ্যান। নিজের অর্থাদি সাধন রূপয়ের যাহাতে নষ্ট না হয় ইত্যাদি মানসে অপরের অনিষ্টচিন্তা করা এই বিভাগের অন্তর্গত।

উপরোক্ত রৌদ্র ধ্যানের চারি প্রকার বাহ্য লক্ষণ ঃ

(ক) ওসন্ন দোষ অর্থাৎ হিংসাদি দোষে অবিশ্রান্ত প্রবৃত্তি।

(খ) বহুল দোষ অর্থাৎ বহুবিধ হিংসা অনৃতাদি দোষে প্রবৃত্তি।

(গ) অজ্ঞান দোষ অর্থাৎ কুশাস্ত্র সংস্কার জন্য হিংসাদিতে প্রবৃত্তি।

(ঘ) আমরণান্ত দোষ অর্থাৎ আমরণান্ত হিংসাদিতে প্রবৃত্তি।

এক্ষণে শুভ ধ্যান অর্থাৎ চিত্তের যে একাগ্র চিন্তায় আত্মোন্নতি হয় তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে।

এই শুভ ধ্যানের প্রথমাবস্থা অর্থাৎ জীবাত্মার প্রথম বিকাশ ধর্ম ধ্যান নামে জৈন দর্শনে অভিহিত আছে। ইহা চারি প্রকার ঃ

১। আজ্ঞা বিচয় ধর্মধ্যান। জ্ঞান, দর্শন, চারিত্র এবং বৈরাগ্য ভাবনা দ্বারা বীতরাগের উক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, নিজের মতি অল্প, ভ্রমাত্মক কিন্তু কেবলী প্রভৃতি জ্ঞানীর উক্তি সত্যপূর্ণ ইত্যাদি প্রকার চিন্তা করাই প্রথম ভেদ।

২। অপায় বিচয় ধর্মধ্যান। অনুরাগ, দ্বেষ প্রভৃতি আশ্রব অর্থাৎ আত্মাকে কলুষিত করিবার নানা প্রকার চিত্তের বিকারগুলি ইহলোক পর লোকের বিশেষ অনর্থকারী এইরূপ চিন্তা করাই দ্বিতীয় ভেদ।

৩। বিপাক বিচয় ধর্মধ্যান। সাংসারিক নানা প্রকার সুখ-ভোগ ও শোক-পীড়া, আধি ব্যাধি দুঃখ ভোগ উপস্থিত হইলে তাহাতে হর্ষ যুক্ত বা খিন্ন না হইয়া ভোগ-গুলি কেবলমাত্র পূর্বকৃত কর্মের ফল এইরূপ সর্বদা চিন্তা করাই তৃতীয় ভেদ।

৪। সংস্থান বিচয় ধর্মধ্যান। আকাশ, কাল, জীব, পরমাণু, ধর্মাস্তিকায় ও অধর্মাস্তিকায় এই ষট্ দ্রব্যের লক্ষণ, সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিচার ও চিন্তা করাই চতুর্থ ভেদ।

উপরোক্ত ধর্মধ্যানের বাহ্যলক্ষণ চারি প্রকার। যথা ঃ

(ক) আজ্ঞারুচি—বীতরাগ জিনের আজ্ঞা, উপদেশ, ও ব্যাখ্যা, নির্যুক্তি প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা।

(খ) নিসর্গরুচি—গুরূপদেশ ব্যতিরেকে জাতিস্মরণ অথবা স্বতঃ জ্ঞান, ও বীতরাগ ভাসিত দ্রব্যাদি তত্ত্বের নৈসর্গিক জ্ঞান

(গ) সূত্ররুচি—কেবলা অর্থাৎ জ্ঞানীজন-প্রণীত সিদ্ধান্ত পাঠে বা শ্রবণে শ্রদ্ধা।

(ঘ) অবগাঢ়রুচি—আগম নিয়মাদির নির্যুক্তি, ভাষ্য, চূর্ণী, টীকা প্রভৃতি বিস্তার বর্ণনায় শ্রদ্ধা।

এই ধর্ম-ধ্যান রূপ সৌধে আরোহণার্থ চারি প্রকার অবলম্বনের বর্ণনা আছে। যথা :

(ক) বাচনা—কর্ম নির্জরার্থ যাদশাদী প্রভৃতি সূত্রাদির দানাদি ক্রিয়া।

(খ) প্রতিপৃচ্ছনা—শাস্ত্রাদির শঙ্কা অপনোদনার্থ গুরুর নিকট জিজ্ঞাসাদি ক্রিয়া।

(গ) পরিবর্তনা—সূত্রাদি পাঠের অবিস্মরণ জন্য অভ্যাসাদি ক্রিয়া।

(ঘ) অনুপ্রেক্ষা—সূত্রার্থ স্মরণ বা চিন্তন করার জন্য পর্যালোচনাদি ক্রিয়া।

এই ধর্মধ্যানের অনুপ্রেক্ষাও চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(ক) একানুপ্রেক্ষা—আমি একা অসহায়, নিজকৃত কর্মকে একাকী ভোগ করিতে হইবে ইত্যাদি চিন্তা।

(খ) অনিত্যানুপ্রেক্ষা—শরীর, অর্থ, পরিবারাদি সবই বিনশ্বর কেবল জীবের মূল ধর্মই অবিনশ্বর নিত্য ইত্যাদি আলোচনা।

(গ) অশরণানুপ্রেক্ষা—জন্ম জরা মরণ ভয় হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র ধর্মই সহায় ইত্যাদি চিন্তা।

(ঘ) সংসারানুপ্রেক্ষা—আমার আত্মা ভব ভ্রমণ করিতে করিতে নানা প্রকার সম্বন্ধ, সুখ-দুঃখ, শত্রুতা-মিত্রতাদি সমস্ত অবস্থা অনুভব করিয়াছে ইত্যাদি সংসারের চতুর্গতি চিন্তা।

এই ধর্মধ্যানের চারিপ্রকার ভাবনাও বর্ণিত আছে।

(ক) মৈত্রীভাবনা—সর্বজীবের প্রতি সমদৃষ্টি, মৈত্রীভাবের চিন্তা।

(খ) প্রমোদভাবনা—জীবের গুণে আকৃষ্ট হইয়া হর্ষপ্রকাশ, তৎপ্রতি প্রীতি দর্শনাদি বিষয়ে চিন্তা।

(গ) মধ্যস্থ ভাবনা—ধার্মিক পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, অধার্মিকের প্রতি ক্রোধ, দ্বেষ ভাব ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থ ভাবে চিন্তা।

(ঘ) কারুণ্য ভাবনা—সর্বজীবের প্রতি করুণা করিতে অর্থাৎ কোন কারণে

কোন জীবকে দুঃখী না করিবার অথবা তাহাদিগের দুঃখ দেখিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা চিন্তাই কারুণ্য ভাবনা।

এইরূপে আত্মার বিকাশ প্রারম্ভের পর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে শুভ ধ্যানের দ্বিতীয় বিভাগ শুক্লধ্যান আরম্ভ হয়। শুক্লধ্যানের ক্রম বিকাশও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। পৃথক-বিতর্ক-সবিচার। প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপাত্ত, ব্যয় ও ধ্রুব এই তিন পর্যায়ের বিভিন্নতা চিন্তা করা, শব্দ হইতে শব্দান্তরে অর্থ হইতে অর্থান্তরে ও দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে, মনোযোগ, বচন যোগ, কায়যোগ সম্বন্ধে এক হইতে অন্য যোগের বিষয় সংক্রমণ করা ইত্যাদি তত্ত্ব বিষয়ে গভীর চিন্তাই শুক্লধ্যানের প্রথম ভেদ।

২। একত্ব-বিতর্ক-নির্বিচার। উৎপাত্ত, ব্যয়, ধ্রুবাদি পর্যায় স্মৃতিপটে রাখিয়া নির্বাত স্থানে স্থিত দীপবৎ ও নিকম্প চিত্ত হইয়া সূক্ষ্ম বিচারে মগ্ন থাকাই শুক্লধ্যানের দ্বিতীয় ভেদ।

৩। সূক্ষ্ম-ক্রিয়া-অনিবৃত্তি। মনোযোগ, বচন যোগ উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবলমাত্র কায়যোগ সম্বন্ধ যখন অতি সামান্য থাকে ও পূর্বোক্ত বচন ও মনোযোগাতীত অবস্থায় সূক্ষ্ম চিন্তাই তৃতীয় ভেদ।

৪। ব্যুপরত ক্রিয়া অনিবৃত্তি। যখন মন বচন শরীর এই তিন প্রকারেই ক্রিয়া বিচ্ছিন্ন হইবার পর মেরু পর্বতবৎ নিকম্প অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াই আত্মার চরম বিকাশ, তখন ইহাই জীবাত্মার সর্বোচ্চ অবস্থা ও অচির মোক্ষের কারণ ভূক্ত বলিয়া জৈন দর্শনে বর্ণিত আছে। ইহাই পাতঞ্জল দর্শনের নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা।

শুক্লধ্যানের লক্ষণ চারিপ্রকার বর্ণিত আছে।

(ক) অব্যথা—উপসর্গাদি জনিত ভয় অথবা চঞ্চলতাদির অভাব।

(খ) অসম্মোহ—দেবাদি কৃত মায়া জনিত সূক্ষ্ম পদার্থ বিষয়ে মুগ্ধতার অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের জড়তার অভাব।

(গ) বিবেক—দেহ হইতে আত্মার ও আত্মা হইতে দেহের ও অন্যান্য সংযোগের বিবেচন ও চিন্তা।

(ঘ) ব্যুৎসর্গ—নিঃসঙ্গ হেতু দেহাদি উপকরণের ত্যাগ।

শুক্ল ধ্যানের অবলম্বন চারি প্রকার। যথা: (ক) ক্ষমা, (খ) নির্লোভতা, (গ) মার্দব—কোমলতা ও (ঘ) আর্জব—সরলতা। এই সকল আলম্বন সহায়ে আত্মা উৎকৃষ্ট ধ্যানরূপ সৌধে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

শুক্ল ধ্যানের অনুপ্রেক্ষা চারি ভাগে বিভক্ত:

(ক) অনন্ত বর্ত্তিতানুপ্রেক্ষা বা অনন্ত বৃত্তিতানুপ্রেক্ষা। জীব অনাদি-কাল হইতে নারক, তির্যক, মনুষ্য ও দেবতাদি চারিগতিতে বহুবার ভ্রমণ করিতেছে ইত্যাদি বিবেচন।

(খ) বিপরিনামানুপ্রেক্ষা—দ্রব্যাদির বিবিধ প্রকার পরিণমনের বিবেচন।

(গ) অশুভানুপ্রেক্ষা—সংসারের অশুভত্ব অর্থাৎ জন্ম জরাদি দুঃখময় সংসারের বিবেচন।

(ঘ) অপায়ানুপ্রেক্ষা—ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভাদি চারি কষায় দুঃখের মূলীভূত কারণ ইত্যাদি বিবেচন।

ধ্যানের আরও অন্য প্রকার চারিটী বিভাগ জৈন-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা: পদস্থ, (২) পিণ্ডস্থ, (৩) রূপস্থ ও (৪) রূপাতীত।

(১) জিনদেব—তীর্থংকরাদি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের গুণ স্মরণ পূর্বক পরমাত্মার চিন্তে ধ্যান করা পদস্থ ধ্যান।

(২) শরীর স্থিত নিজ আত্মায় পরমাত্মার গুণাদি চিন্তা করাই পিণ্ডস্থ ধ্যান। প্রাণায়ামাদি যোগ ক্রিয়াগুলি এই ধ্যানের অন্তর্গত।

(৩) স্থূল বস্তুতে স্থিত হইলেও আমার আত্মা রূপশূন্য, অনন্তশক্তিময় ইত্যাদি চিন্তাই রূপস্থ ধ্যান।

(৪) নিরঞ্জন, নির্মল, সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত, অভেদ, চিদানন্দ, অনন্ত গুণ পর্যায় শালী ইত্যাদি আত্মস্বরূপ চিন্তাই রূপাতীত ধ্যান। এই ধ্যানই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মোক্ষের কারণভূত হইয়া থাকে।

এই প্রকারে জৈন দর্শনানুসারে ধ্যানের নামমাত্র অর্থ ও বিভাগাদি বলা হইল। ধ্যান সম্বন্ধে বহুবিধ জৈন দার্শনিক গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং আশা করি অনুসন্ধিৎসু শ্রোতৃগণ এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়াস করিলে অন্যান্য জৈন দর্শনের তাত্ত্বিক বিষয়ের বিচার করিবার বহু সাধনও প্রাপ্ত হইবেন, ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা।

বঙ্গভাষায় জৈনচর্চা : কালক্রমিক পঞ্জী

প্রথম পর্যায়

অশোক উপাধ্যায়

অক্ষয়কুমার দত্ত—উপাসক সম্প্রদায় । জৈন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৭৪ শক [১২৫৯], পৃ. ১৫০-১৫৩ ; বৈশাখ ১৭৭৫ শক [১২৬০], পৃ. ৬-৯ [পুনর্মুদ্রণ, হিতৈষী, পৌষ ১৩০৫, পৃ. ৫-১১ ; ফাল্গুন, পৃ. ১৪১-১৪৪ ; চৈত্র, পৃ. ১৫৩-১৫৬] ; শ্রাবণ ১৭৭৫ শক, পৃ. ৪৮-৫২।

যা. কৃ. সি. [যাদব কৃষ্ণ সিংহ]—মহাবীর, বিবিধার্থ সংগ্রহ, ফাল্গুন ১৭৭৯ শক [১২৬৪ সাল], পৃ. ২৫৬-২৬০ ।

রামদাস সেন—হেমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০, পৃ. ৫৩-৫৭ [পুনর্মুদ্রণ, রামদাস গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, বহরমপুর, ১৩০৯, পৃ. ৪৯-৫৫]।

রামদাস সেন—জৈনধর্ম, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১, পৃ. ১৭৯-১৮৪ ; ভাদ্র ১২৮১, পৃ. ২০৬-২০৯ [পুনর্মুদ্রণ, রামদাস গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, পৃ. ১৪৯-১৬৪]।

রামদাস সেন—জৈনমত সমালোচন, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮৪, পৃ. ১৯-২৮ [পুনর্মুদ্রণ, রামদাস গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, পৃ. ২৯৫-৩০৮]।

রামদাস সেন—কুমারপাল, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৪, পৃ. ১১৩-১২০ [পুনর্মুদ্রণ, রামদাস গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, ১৩০৯, পৃ. ৩৩১-৩৪১]।

হরিমোহন বিদ্যাভূষণ—জৈনধর্ম, বিভা, আশ্বিন ১২৯৪, পৃ. ৭৩-৭৬ ; কার্তিক ১২৯৪, পৃ. ৭৯-৮২।

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—জৈন গৃহী ও জৈন সন্ন্যাসী (আইন-ই আকবরী অবলম্বনে), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮১৬ শক [১৩০১], পৃ. ৫৪-৫৫।

অনিন্দগোপাল ঘোষ—জৈনদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, পূর্ণিমা, মাঘ ১৩০৬, পৃ. ২৯৪-২৯৭ ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [মাঘ-চৈত্র] ১৩০৪, পৃ. ২৯৩-২৯৬।

অবিনাশচন্দ্র দাস—জৈন সম্প্রদায়, ভারতী, ভাদ্র ১৩০৬, পৃ. ৮১১-৮১৭।

নগেন্দ্রনাথ বসু—জৈন পুরাকাহিনী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [শ্রাবণ-আশ্বিন] ১৩০৭, পৃ. ৭০-৭৮।

পূরণচাঁদ সামসুখা—দিওয়ালি, সুধা, মাঘ ১৩০৮ [পুনর্মুদ্রণ, শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ৬৫-৬৯]।

পূরণচাঁদ সামসুখা—হীরবিজয় সূরী, ভারতী, মাঘ ১৩১৯, পৃ. ৯১৭-৯২১।

বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়—জৈনধর্ম, ভারতী, পৌষ ১৩১০, পৃ. ৮৫৯-৮৮৩।

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—জৈনধর্ম, উপাসনা, আষাঢ় ১৩১৬, পৃ. ১২১-১২৮; কার্তিক ১৩১৬, পৃ. ২৮৯-৩০০ [পুনর্মুদ্রণ, ঐ—ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা, কলিকাতা, ভারতী লাইব্রেরী, ভাদ্র ১৩৭২, পৃ. ৪৭৮-৫০৯]।

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—প্রমাণপঞ্জী। জৈন ও জৈনধর্ম, বাণী, বৈশাখ ১৩১৭, পৃ. ৪৭-৪৮; জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, পৃ. ১১১-১১২; আষাঢ় ১৩১৭, পৃ. ১৭৫-১৭৬ [গ্রন্থপঞ্জী]।

অচ্যুতানন্দ সরস্বতী—বেদান্ত দর্শনে জৈন-মত খণ্ডন, সাহিত্য সংহিতা, বৈশাখ ১৩১৭, পৃ, ১৪-২০।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শাস্ত্র-বিশারদ জৈনাচার্য শ্রীবিজয়ধর্মসূরি, বাণী, আষাঢ় ১৩১৭, পৃ. ১৫০-১৬১।

মনোরঞ্জন চৌধুরী—জৈন সম্প্রদায় ও তাহাদের মন্দির, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮৩৩ শক [১৩১৮], পৃ. ২১৬-২১৮।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত—জৈন কথা-সাহিত্য। ভট্টাকলংকদেব (ব্রহ্মচারী নৈমিদত্তের কৃত আরাধনা-কথাকোষ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে), সাহিত্য, মাঘ ১৩১৮, পৃ. ৭৭২-৭৮০।

বিধুশেখর ভট্টাচার্য—জৈনদর্শনের জীবতত্ত্বের একাংশ, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ. ৪৩৮-৪৪০।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত—জৈন কথা-সাহিত্য, সংসার-চিত্র (অমিতগত্যাচার্য-

বিরচিত ধর্ম পরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত), সাহিত্য, চৈত্র ১৩১৮, পৃ. ৯১৮-৯২১।

বিজয়ধর্মসূরি, জৈনাচার্য—অহিংসা-দিগ্‌দর্শন, কাশী, যশোবিজয় জৈন পাঠশালা, বীরসম্বৎ ২৪৩৮ [১৩১৯], পৃ. ॥৶•+১১৮+ক-ছ। [অনুবাদকের নাম নেই]।

হরিহর ভট্টাচার্য, অনুবাদক—সার্বধর্ম, কাশী, বঙ্গীয় সার্বধর্ম পরিষৎ, ১৩১৯, পৃ. (i)-(x)+৪৮+ক-ঘ, ভূমিকা, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, Introduction, J. L. Jaini, dated 29 July 1912, [হিন্দী সার্বধর্মের অনুবাদ, মূল লেখক—গোপালদাস বরৈয়া (মোরেনা); বঙ্গীয় সার্বধর্ম-পরিষৎ পুস্তকমালা-১]।

সম্পাদক, উদ্বোধন—জৈনধর্ম, উদ্বোধন, পৌষ ১৩১৯, পৃ. ৭৬২-৭৭১; ফাল্গুন ১৩১৯, পৃ. ১০৫-১২৭ [পুনর্মুদ্রণ, উপেন্দ্রনাথ দত্ত—জৈনধর্ম, পৃ. অ-র]।

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল—জৈন ধর্মগ্রন্থাবলী, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২০, পৃ. ২৮২-২৮৬।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—জৈন সম্প্রদায় ও বল্লভাচার্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮৩৫ শক [১৩২০], পৃ. ১৩২-১৩৫।

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল—জৈনাচার্য জিনসেন, ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২০, পৃ. ৪৪৯-৪৫৪।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত—জৈনধর্ম, কাশী, বঙ্গীয় সার্বধর্ম পরিষৎ, [কার্ত্তিক] ১৩২০, পৃ. অ-র+১১৭+৮।

[সূচি : জৈনধর্ম, জৈনধর্মের মুখ্যতত্ত্ব, জৈনধর্মের উপদেশক্রম, স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ, দার্শনিক সিদ্ধান্ত, তুলনামূলক দার্শনিকত্ব, নাস্তিকতা এবং আস্তিকতা, জৈন ধর্মের এবং তদতিরিক্ত ধর্মের সাম্য, বহির্জীবন, ঐতিহাসিকতা, পরিশিষ্ট।

: ক—চতুর্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্কর, খ—পন্থ এবং উহার বিভাগ। বঙ্গীয় সার্বধর্ম পরিষৎ গ্রন্থমালা]। ভূমিকা, উদ্বোধন সম্পাদকের লেখা।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত—জৈন দর্শনের ইতিহাস, উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩২১, পৃ. ৫০৬-৫১৮।

পূরণচাঁদ নাহার—জৈন মতে জীবভেদ, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ. ১০৯-১১২ [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, কার্তিক ১৩৮১, পৃ. ২০৭-২১২]।

সুধীরচন্দ্র সরকার—জৈন মূর্তি, মর্মবাণী, ২৮ শ্রাবণ ১৩২২, পৃ. ৫১০-৫১২। [কুন্তারিয়ায় প্রাপ্ত মুনি সুব্রতর নামাঙ্কিত শিলালিপির আলোচনা]।

বিধুশেখর শাস্ত্রী—বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম কোথা হইতে আসিল, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২২, পৃ. ১৩৪-১৩৯।

নলিনীমোহন রায়চৌধুরী—গোয়ালিয়রে খোদিত জৈনশিল্প, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৩, পৃ. ২৫৩-২৫৬।

অমূল্যাক্ষ সরকার—জৈনধর্ম ও দর্শন, মানসী ও মর্মবাণী, আষাঢ় ১৩২৩, পৃ. ৪৯৭-৫০৫ ; শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ. ৬১৮-৬২৫।

প্রমথনাথ চৌধুরী—জৈনধর্ম, মানসী ও মর্মবাণী, কার্তিক ১৩২৪, পৃ. ৩১৭-৩২৫।

হরিহর শাস্ত্রী—জৈন দর্শন, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৭, পৃ. ২৬৫-২৭২।

হরগোপাল দাস কুণ্ডু—বারেন্দ্রে জৈন তীর্থ (কোটিবর্ষ), মানসী ও মর্মবাণী, ভাদ্র ১৩২৭, পৃ. ৭৮-৮৩।

পুলিনবিহারী দত্ত—জৈনযুগের মথুরা, মানসী ও মর্মবাণী, আষাঢ় ১৩২৯, পৃ. ৪৫৭-৪৬৭।

অমৃতলাল শীল—মোগল দরবারে জৈনাচার্য সাধু, প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৯, পৃ. ৮৫৩-৮৫৭।

অমৃতলাল শীল—সম্রাট আকবর ও জৈনাচার্যগণ, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃ. ১৪৯-১৫৬।

অমৃতলাল শীল—জৈনদের প্রাগৈতিহাসিক গুরু বা তীর্থকর [তীর্থংকর], মানসী ও মর্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃ. ২৮৯-২৯৮।

অমৃতলাল শীল—জৈনদের ঐতিহাসিক যুগের তীর্থকর, মানসী ও মর্মবাণী, আষাঢ় ১৩৩০, পৃ. ৩৯৫-৩৯৭।

হরগোপাল দাস কুণ্ডু—বাঙ্গালী জৈন শ্রুতকেবলী, কার্যবিবরণী ১৪শ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, আষাঢ় ১৩৩০, পৃ. ১০৫-১১২।

পূরণচাঁদ নাহার—জৈন-দর্শনে নয়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ. ৫৫৬-৫৬০।
[পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ পৃ. ৪৩-৫৩]

হরিহর শাস্ত্রী—জৈন সাহিত্যে রামায়ণের কথা, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩০, পৃ. ৩৬৭-৩৭২।

অমৃতলাল শীল—আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের উত্তর ভারতের ধর্মস্থাপক, মানসী ও মর্মবাণী, পৌষ ১৩৩০, পৃ, ৩৮৫-৩৮৮।

অমৃতলাল শীল—জৈনদের চতুর্বিংশতিতম (বা শেষ) তীর্থংকর মহাবীর স্বামী (জীবন চরিত), মানসী ও মর্মবাণী, মাঘ ১৩৩০, পৃ. ৪৮১-৪৮৮।

হরিমোহন ভট্টাচার্য—জৈন দর্শনে স্যাদবাদ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [মাঘ-চৈত্র] ১৩৩০, পৃ. ১৪৩-১৬০ ; প্রথম সংখ্যা, [বৈশাখ-আষাঢ়] ১৩৩১, পৃ. ১-১০।

অমৃতলাল শীল—জৈন-সাহিত্যে রামকথা, মানসী ও মর্মবাণী, চৈত্র ১৩৩০, পৃ. ১২২-১২৯।

অমৃতলাল শীল—তীর্থংকর মহাবীর স্বামী (জীবন চরিত) মানসী ও মর্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, পৃ. ৩২৮-৩৩৩।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—পার্শ্বনাথ-চরিত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৮৪৬ শক [১৩৩১], পৃ. ২৬৬-২৬৯ ; চৈত্র, পৃ. ৩৩৬-৩৩৮ ; জ্যৈষ্ঠ, ১৮৪৭ শক [১৩৩২], পৃ. ৫০-৫৩ ; কার্তিক, পৃ ২১৭-২১৯ ; পৌষ, পৃ. ২৭৮-২৮০।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—জৈনদিগের দৈনিক ষট্‌কর্ম, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [মাঘ-চৈত্র] ১৩৩১, পৃ. ১২৯-১৩৬।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—জৈন পদ্মপুরাণ (কথাসার), কলিকাতা, বঙ্গবিহার অহিংসাধর্ম পরিষৎ, ২৪৫০ বীরনির্বাণ সংবৎ [১৩৩১], পৃ. [২]+৷০+৪৮। [অহিংসাধর্মপুস্তকমালা—২] [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, বৈশাখ ১৩৮০, পৃ. ১৯-২৬ ; জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫১-৫৬ ; আষাঢ়/৮৩-৮৬ ; শ্রাবণ/১১০-১১৬ ; ভাদ্র/১৩৯-১৪৩ ; আশ্বিন/১৭৪-১৭৬, অগ্রহায়ণ/২৩২-২৩৭ ; পৌষ/২৬৩-২৬৭ ; মাঘ/২৮৭-২৯১ ; চৈত্র/৩৪৫-৩৫২]।

অমৃতলাল শীল—রূপক, মানসী ও মর্মবাণী, আষাঢ় ১৩৩১, পৃ. ৫০৭-৫০৮।

হরিসত্য ভট্টাচার্য—জৈন দর্শনে ধর্ম ও অধর্ম, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [শ্রাবণ-আশ্বিন] ১৩৩৪, পৃ. ৯৯-১০৯।

পূরণচাঁদ সামসুখা—বৃক্ষপত্র, মানসী ও মর্মবাণী, ভাদ্র ১৩৩৪ [পুনর্মুদ্রণ, অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ২০৪-২০৬। অমৃতলাল শীলের বৃক্ষপত্র প্রবন্ধের প্রতিবাদে লেখা]।

পূরণচাঁদ নাহার—জৈন-মূর্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [মাঘ-চৈত্র] ১৩৩৫, পৃ. ১৮২-১৯৩ [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, পৌষ ১৩৮১, পৃ. ২৬৭-২৭২, মাঘ ১৩৮১, পৃ. ৩০১-৩১০]।

অমৃতলাল শীল—জৈনী শ্রাবক ও ওসওয়াল, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৫, পৃ. ৮৪২-৮৪৪।

পূরণচাঁদ সামসুখা—জৈনধর্ম ও সম্প্রদায়ের উন্নতি, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ [পুনর্মুদ্রণ, অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ১১৬-১২০। জৈনী শ্রাবক ও ওসওয়াল প্রবন্ধের প্রতিবাদে লেখা]।

পূরণচাঁদ নাহার—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা, পঞ্চপুষ্প, মাঘ ১৩৩৬, পৃ. ১৪৮১-১৪৮৭ [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, ফাল্গুন ১৩৮০, পৃ. ৩১৫-৩২৫]।

বিভূতিভূষণ দত্ত—জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্যা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [বৈশাখ-আষাঢ়] ১৩৩৭, পৃ. ২৮-৩৯।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—জৈনধর্ম। আর্যপট্ট, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৭, পৃ. ৮১১-৮১৭।

অজিত ঘোষ—জৈন-চিত্রের বিকাশ, পঞ্চপুষ্প, মাঘ ১৩৩৭, পৃ. ৪৮১-৪৯০।

হরিহর শাস্ত্রী—জৈন শলাকা-পুরুষ, পঞ্চপুষ্প, আষাঢ় ১৩৩৮, পৃ. ৩৮৪-৩৮৯।

রমেশচন্দ্র মজুমদার—বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে কৃষ্ণ-চরিত্র, পঞ্চপুষ্প, ভাদ্র ১৩৩৮, পৃ. ৬৩০-৬৩৫ [পুনর্মুদ্রণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৮৫৩ শক / ১৩৩৮, পৃ. ২১৩-২১৮]।

ক্ষিতিমোহন সেন—জৈন মরমী আনন্দঘন, প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৮, পৃ. ৬১-৭১।

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—জৈন-সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্র, পঞ্চপুষ্প, কার্তিক-অগ্রহায়ণ (যুগ্ম) ১৩৩৮, পৃ. ৯৪৭-৯৪৮।

কালিদাস দত্ত—সুন্দরবনে আবিষ্কৃত জৈন মূর্তি, পঞ্চপুষ্প, আষাঢ় ১৩৩৯, পৃ. ১৩৪–১৩৭।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অভিষেক সম্বৎসর, ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৯, পৃ. ২৪৩-২৪৭; ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৩৭৮-৩৮৪।

পূরণচাঁদ সামসুখা—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অভিষেক সম্বৎসর সমালোচনা, ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৯ [পুনর্মুদ্রণ, অভিনন্দন গ্রন্থ, পৃ. ১৪৫-১৪৯। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর প্রবন্ধের প্রতিবাদ]।

*পূরণচাঁদ নাহার—জৈন ভাস্কর্যের নমুনা, বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৪০।

প্রবোধচন্দ্র সেন—বাংলার আদিধর্ম, বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, পৃ. ৬৫৯-৬৭৩। [পুনর্মুদ্রণ, দর্শক, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬/১৩৭৩]।

হরিশচন্দ্র সরাক—শ্রীআদিদেব, ঝরিয়া, শ্রীজৈনধর্ম প্রচারক সভা, ১৩৩৪, পৃ. ১২। [শ্রীজৈনধর্ম প্রচারক গ্রন্থমালা-দুই]।

হরিশচন্দ্র সরাক—শ্রীআদিদেব পূজা বা ধর্মদত্ত নৃপ কথা, ঝরিয়া, শ্রীজৈনধর্ম প্রচারক সভা, ১৩৪৫, পৃ. ২৭। [শ্রীজৈনধর্ম প্রচারক গ্রন্থমালা-তিন]।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী—বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, [বৈশাখ-আষাঢ়] ১৩৪৬, পৃ. ১-৩ [পুনর্মুদ্রণ, জয়ন্তী উৎসব স্মারক গ্রন্থ, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আশ্বিন ১৩৮০, পৃ. ১৫৪-১৫৭]।

*বিমলাচরণ লাহা—জৈনগুরু মহাবীর, কলিকাতা, প্রাচ্যবাণী মন্দির, ১৯৪৪ [১৩৫১], পৃ. ৬৯। [প্রাচ্যবাণী সার্বজনীন গ্রন্থমালা-দ্বিতীয় পুষ্প]।

যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—মূল সূত্রম্ অথবা জিন গীতা, কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৫ পৌষ ১৩৫৩, পৃ. ৬১+১৩৮+26।

*সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—জৈন ও হিন্দু, কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৭ [১৩৫৪], পৃ. ১॥০+৩১২।

পূরণচাঁদ শ্যামসুখা—জৈন দর্শনের রূপরেখা, কলিকাতা, আর. এন. চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, আশ্বিন ১৩৫৫, পৃ. ॥৶০+১১৫।

[সূচি : দ্রব্য, নয়বাদ, স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ, কর্মবাদ, গুণস্থান ক্রমারোহ। ভূমিকা, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার]।

পূরণচাঁদ শ্যামসুখা—জৈন ধর্মের পরিচয়, কলিকাতা, গ্রন্থাকার, পি-৯২ লেক রোড, ফাল্গুন ১৩৫৬, পৃ. ৩৬।

[সূচি : জিন ও জৈন, কাল বিভাগ, তীর্থঙ্কর, সাধু ও সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা, নবতত্ত্ব, ত্রিরত্ন, অহিংসা, সৃষ্টির অনাদিত্ব [পুনর্মুদ্রণ, ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, পৃ. ১-৫, ৪৩-৭০]।

গণেশ লালওয়ানী—চিত্র ও সম্ভূত, গল্পভারতী, শ্রাবণ ১৩৫৭ [পুনর্মুদ্রণ, অতিমুক্ত, পৃ. ৬-১৩]।

অমূল্যচন্দ্র সেন—জৈনধর্ম, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃ. ৫৬। [বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-৯৩]।

পূরণচাঁদ শ্যামসুখা—জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর, কলিকাতা, গ্রন্থকার, পি-৯২ লেক রোড, কার্তিক ১৩৫৮, পৃ. ৵০+৫১। প্রস্তাবনা, কালিদাস নাগ [পুনর্মুদ্রণ, ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, পৃ. ৫-৪২, ৭১-৭৬ ; প্রস্তাবনা বর্জিত]।

হীরাকুমারী বোথরা, অনুবাদক—আচারাঙ্গ-সূত্র। প্রথম শ্রুত স্কন্ধ, কলিকাতা, শ্রীজৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা, [চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী] ২০০৯ সম্বৎ [১৩৫৮], পৃ. ।০+৭১।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনুবাদক ও সম্পাদক—কল্পসূত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, [জুন] ১৯৫৩ [১৩৬০], পৃ. চৌদ্দ+৯৸৶০+১২৭+৩১১। ভূমিকা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। [ঈশান অনুবাদমালা-১]।

ধর্মরাজ শর্মা, অনুবাদক—নির্গ্রন্থ-প্রবচন, ব্যাবর (আজমীর), দিবাকর দিব্যজ্যোতি কার্যালয়, দীপাবলী ২০১২ সম্বৎ [১৩৬২], পৃ. ।০+১৭৭+(৭)। [ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত বাংলাদেশ ও জৈনধর্ম (১৬ ভাদ্র ১৩৬১) এই গ্রন্থের শেষে সংযোজিত]।

পূরণচাঁদ শ্যামসুখা ও অজিত রঞ্জন ভট্টাচার্য, অনুবাদক ও সম্পাদক—উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০ [১৩৬৭], পৃ. ১৲+৪৬১। [ঈশান অনুবাদমালা-২]।

গণেশ লালওয়ানী—সাতটি জৈন তীর্থ, হিমাদ্রি, ২৬ জ্যৈষ্ঠ; ১ আষাঢ়; ২২ আষাঢ়; ২৯ আষাঢ়; ১২ শ্রাবণ; ২৬ শ্রাবণ ১৩৬৮ [পুনর্মুদ্রণ, সাতটি জৈনতীর্থ, জৈন ভবন, চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী, বীরাব্দ ২৪৯০/১৩৭০, পৃ. ৫৪।

[সূচি: সম্মেত শিখর, দেলওয়াড়া, শত্রুঞ্জয়, গিরনার, শ্রবণ বেলগোল, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি, পাওয়াপুরী]।

কালিদাস নাগ, ভঁবরমল সিংহী, গণেশ লালওয়ানী, সম্পাদক—শ্রীপূরণ চাঁদ শ্যামসুখা অভিনন্দন গ্রন্থ, কলিকাতা, শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা অভিনন্দন সমিতি, ৪৮ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, ১ আগষ্ট ১৯৬১ [১৩৬৮], পৃ. [২১]+ ৩৮+২০৮+৩২+44. [এই গ্রন্থের রচনা অংশে পূরণচাঁদ শ্যামসুখার লেখা ৪৬টি বাংলা প্রবন্ধ সঙ্কলিত]।

বিমলাচরণ লাহা—সুপ্রসিদ্ধ জৈনগুরু [ঋষভদেব, পার্শ্বনাথ, নেমিনাথ], প্রবন্ধমালা, কলিকাতা, ভারতবিদ্যাবিহার, ১৩৭০, পৃ. ৯০-১০৭।

ধীরজলাল শাহ, শতাবধানী—ভগবান মহাবীর (ঐতিহাসিক জীবনরেখা), কলিকাতা, শ্রীজৈন সভা, [জুলাই ১৯৬৩/১৩৭০], পৃ. ৩২। [অনুবাদকের নাম নেই]।

গণেশ লালওয়ানী—বাঙলায় জৈন ধর্ম, কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ সঙ্ঘ, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ [১৩৭০], তিন পৃষ্ঠা।

প্রেমময় দাশগুপ্ত—'বিম্বিসার-খারবেল' ক্রমানুপঞ্জী ও হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্যের জৈন ব্যাখ্যা, কলিকাতা, সাম্প্রতিক প্রকাশনী, গাঙ্গুলী-বাগান গভঃ কোয়ার্টার—১০/৫৮, ২ নভেম্বর ১৯৬৩ [১৩৭০], পৃ. ক-চ + ৭৪।

[সূচি: সূচনা, বৌদ্ধ স্মৃতি, হাতিগুম্ফা শিলালিপি তথ্য, জৈন স্মৃতি, পুরাণ স্মৃতি, বিম্বিসার-খারবেল তারিখপঞ্জী]।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—অকলঙ্ক [জৈন নৈয়ায়িক], অঙ্গ, অনন্তনাথ, অনেকান্তবাদ, অভয়দেবসূরি, উদয়প্রভ সূরি, উমাস্বাতি-স্বাতি, ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আশ্বিন ১৩৭১, পৃ. ১,১৫, ৪৯, ৫৬-৫৭, ৯২-৯৩, ৬১৯, ৬৪৯।

গণেশ লালওয়ানী—তীর্থংকর পরিচয়, দর্শক, ৩১ আগষ্ট ১৯৬৫ [১৩৭২] নানা পৃষ্ঠায়।

গণেশ লালওয়ানী—[জৈন সাহিত্যে] উৎসব, দর্শক, ১৫ মার্চ, ১৯৬৬ [১৩৭৩]। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, আশ্বিন, ১৩৮১, পৃ. ১৮৫-১৯০]।

অরুণ চৌধুরী—বীরভূমে জৈন প্রভাব, দর্শক ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬ [১৩৭৩]।

গণেশ লালওয়ানী—জৈন ধর্ম. সরাক—প্রাচীন জৈন জাতি, বাঙলার জৈন প্রত্নতত্ত্ব, জৈন ধর্মের পরিচয়, তীর্থংকরগণের লাঞ্ছনাদি পরিচয়, দর্শক, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬ [১৩৭৩]।

হাইন্‌ৎস্ মোদে—জৈন শিল্পবিচার, দর্শক, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬ [১৩৭৩]।

গণেশ লালওয়ানী—জৈনধর্ম ও বাংলা সাহিত্য, দর্শক ১৫ এপ্রিল ১৯৬৬ [১৩৭৩]। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, কার্তিক ১৩৮১, পৃঃ ২১৩-২১৯]।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—ঋষভদেব, কুন্দকুন্দাচার্য, ভারতকোষ, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, পৃঃ ৭,৩৫৩।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—গণধর, গোম্মট, গোসাল মখলিপুত্ত, ভারতকোষ, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৌষ ১৩৭৪, পৃঃ ১৯৪-২১৫।

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী—জৈন দর্শন, ভারতকোষ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৫৪৮-৫৫২।

গণেশ লালওয়ানী, জৈন মন্দির ও গুহা, দর্শক ১৫ জানুয়ারী ১৯৬৮ [১৩৭৪]।

গণেশ লালওয়ানী—সহরওয়ালী, দর্শক, ৩১ জানুয়ারী ১৯৬৮ [১৩৭৪]।

গণেশ লালওয়ানী—জৈন উপাঙ্গে নাট্যবিধি, দর্শক, ৩০ জুন ১৯৬৮ [১৩৭৫]।

গণেশ লালওয়ানী—জৈন সাহিত্যে কল্পবৃক্ষ, দর্শক, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ [১৩৭৫]।

গণেশ লালওয়ানী—জৈন রামায়ণ, শারদীয়া শিখা, ১৩৭৫, পৃ. ১৭-২৩। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, পৌষ ১৩৮১, পৃ. ২৭৩-২৭৭; মাঘ ১৩৮১, পৃ. ৩১১-৩১৯]।

রামচন্দ্র অধিকারী, সঙ্কলক—জৈন শাসনের দিগ্‌দর্শন, কলিকাতা, পরীচাঁদ বোথরা, ৭/২ দেওয়ান স্ট্রীট, ১৯ এপ্রিল ১৯৭০ [১৩৭৭], পৃ. ৫২।

রামপ্রসাদ মজুমদার—বঙ্গদেশে জৈনপ্রভাব, প্রবাসী, মাঘ ১৩৭৭, পৃ. ৪৩৬-৪৩৮।

গণেশ লালওয়ানী—জৈন মন্দির, চিত্রাঙ্গদা, চৈত্র ৭৭-বৈশাখ ৭৮, পৃ. ১৪-২০।

রামপ্রসাদ মজুমদার—বঙ্গদেশে গুরুর ভূমিকায় জৈন দান, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৭৮, পৃ. ২৯৩-২৯৬।

গণেশ লালওয়ানী—অতিমুক্ত, কলিকাতা, জৈন ভবন, ১৩ চৈত্র ১৩৭৮, পৃ. ১২২।

[সূচি : অতিমুক্ত (কথাশিল্প আশ্বিন, ১৩৬৩), চিত্র ও সম্ভূত (গল্পভারতী, শ্রাবণ ১৩৫৭), চিলাতীপুত্র (ঐ মাঘ ১৩৫৭), কপিল (ঐ শ্রাবণ ১৩৫৮), আর্দ্রককুমার (ঐ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১), সনৎকুমার (কথাশিল্প, ফাল্গুন ১৩৬১), মেতার্য (গ. ভা. আষাঢ় ১৩৫৮), ধন্য ও শালীভদ্র (ঐ চৈত্র ১৩৫৭), প্রসন্নচন্দ্র (ঐ ফাল্গুন ১৩৫৮), উদায়ী (ঐ ফাল্গুন ১৩৬১), নাগিলা (ঐ ভাদ্র ১৩৫৮), থাবরাচ্চা পুত্র [জন্ম ও মৃত্যু] (ঐ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩), মল্লী (ঐ বৈশাখ ১৩৫৯), বাহুবলী (ঐ ফাল্গুন ১৩৫৯), স্থূলভদ্র (ঐ ফাল্গুন ১৩৫৭), নন্দীসেন (কথাশিল্প, আশ্বিন ১৩৬৪)।

হরিশ চন্দ্র সরাক—শ্রীতীর্থঙ্কর গীতাবলী, ধানবাদ, কুমারদী-মোহোদা, প্রাচীন জৈন সরাক সমিতি, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ (২য় সংস্করণ), পৃ. ৩০।

পূরণচাঁদ নাহার—হস্তলিখিত গ্রন্থে চিত্রশিল্প, শ্রমণ, আষাঢ় ১৩৮০, পৃ. ৬২-৬৪।

সুধীরকুমার নন্দী—স্যাদ্‌বাদ, ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শ্রাবণ ১৩৮০, পৃ. ৫৯৬।

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়—ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, ভঁোয়রলাল বোথরা, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, ২৬ কার্তিক ১৩৮১, পৃ. ২৭। ভূমিকা, বিজয়সিংহ নাহার।

পূরণচাঁদ শ্যামসুখা—ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, কলিকাতা, বিমলচাঁদ শ্যামসুখা, পি-৯২ লেক রোড, কার্তিক ১৩৮১, পৃ. ৭৬। ভূমিকা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। [জৈন ধর্মের পরিচয় ও জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এই দুই গ্রন্থের কিয়দংশ বর্জিত ও একত্রীকৃত সংস্করণ]।

তারিখহীন প্রকাশন

হরিহর শাস্ত্রী—জৈন দর্শন, কলিকাতা, ভারতীয় জৈন সিদ্ধান্ত প্রকাশিনী সংস্থা, পৃ. ২৩ [ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৭ হইতে উদ্ধৃত]।

রজনীভূষণ ভট্টাচার্য, অনুবাদক—দশবৈকালিক সূত্র, জয়পুর, পার্শ্বনাথ জৈন লাইব্রেরী, পৃ. [১৮]+১৮৪। বাঁঠিয়া সিরিজ নং ৬। [মূল ও বাংলা পদ্যানুবাদ, সম্পূর্ণ নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত]।

* তারকাচিহ্নিত রচনাগুলি সঙ্কলকের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সঙ্কলক এজন্য দুঃখিত।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. III. No. Sraman June 1975

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

"The *Jain Journal* is a distinct addition to the tale of research periodicals published in India dealing specially with Jainism. There are original articles of very high value on Jaina thought and culture, life and religion, art and literature, history and biography, legend and story, and nothing which comes within what may be called Jainistics, is omitted. The printing is beautiful and the general get-up is quite artistic, with its well-reproduced illustrations, some in colours."

—Dr. Suniti Kumar Chatterji

Emeritus Professor of Comparative Philology, University of Calcutta and National Research Professor of India in Humanities.

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
তৃতীয় বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৮২ ॥ তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

মহাবীর, পাক্‌বিড়রা, পুরুলিয়া
খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী

বৰ্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]
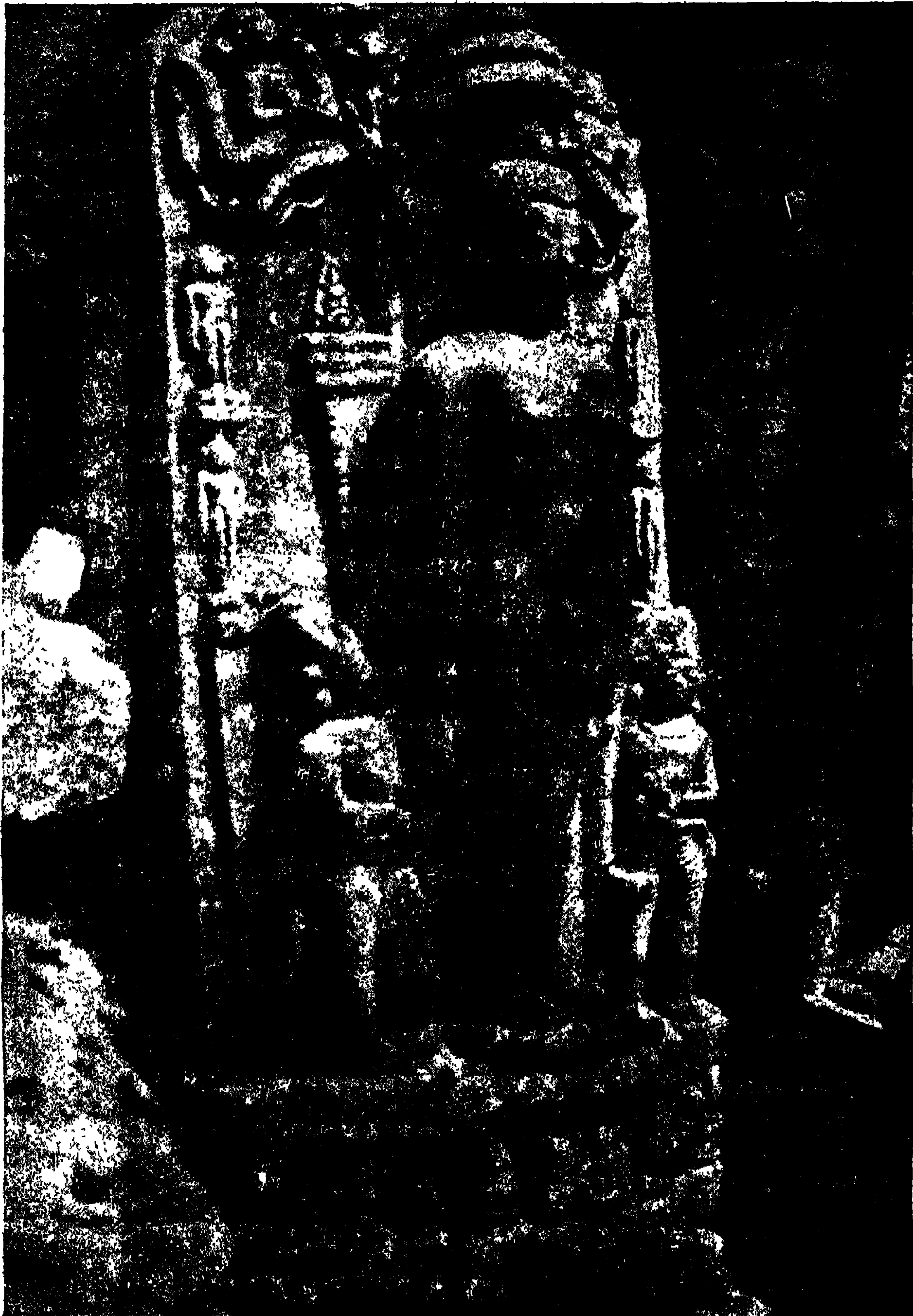
বৰ্দ্ধমান শিষ্য আনন্দ সেদিন ভিক্ষাচর্যায় হালাহলার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর হতে তাঁকে দেখতে পেয়ে গোশালক ডাক দিয়ে বললেন, শোনো আনন্দ, তোমায় একটা কথা বলি।

আনন্দ সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গোশালক বললেন, আনন্দ তোমায় একটি গল্প বলি শোন। সে অনেক কাল আগের কথা। একদল বণিক গরুড় গাড়ীতে মাল বোঝাই করে বিদেশে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিল। বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় এক সময় তাদের পথ হারিয়ে গেল। তারা বন হতে মহাবনে গিয়ে পড়ল। সেই মহাবনের যেন আর শেষ নেই। তারপর মহাবনে অনেক দিন ব্যতীত হওয়ায় তাদের সঙ্গে যে খাবার জল ছিল সেই জলও ফুরিয়ে গেল। তখন তারা সেই মহাবনে জলের সন্ধান করতে লাগল। সন্ধান করতে করতে তারা এক নিম্ন ভূমিতে গিয়ে পড়ল। সেখানে জল ছিল না তবে চারটী জলার্দ্র বল্মীক ছিল। বল্মীক জলাদ্র´থাকায় জল পাওয়া যেতে পারে ভেবে তারা প্রথম বল্মীক ভেঙে ফেলল। ভাঙতেই তার নীচে স্বচ্ছ জল পাওয়া গেল। সেই জল তারা আঁজলা ভরে পান করল ও সেই জলে তাদের জলপাত্রগুলোও ভরে নিল। বণিকেরা তখন ভাবতে লাগল যে প্রথম বল্মীকের নীচে যখন জল পাওয়া গেছে তখন অন্য বল্মীকের নীচে না জানি কি পাওয়া যেতে পারে। তখন তারা দ্বিতীয় বল্মীক ভাঙতে গেল। বণিকদের মধ্যে সুবুদ্ধি নামে এক বণিক ছিল। সে কিন্তু সেই লোভী বণিকদের নিরস্ত করবার জন্য বলল, আমাদের কাজ যখন হয়ে গেছে তখন অন্য বল্মীক ভাঙার কি প্রয়োজন? কিন্তু লোভী বণিকেরা তার কথা শুনল না। দ্বিতীয় বল্মীকটিও ভেঙে ফেলল। বল্মীকটি ভাঙতেই তার নীচে সোনা পাওয়া গেল।

তখন তাদের লোভ আরো বেড়ে গেল। দ্বিতীয়টিতে যখন সোনা পাওয়া গেছে তখন তৃতীয়টিতে নিশ্চয়ই মণি-রত্ন পাওয়া যাবে। সুবুদ্ধি আবারো নিষেধ করল কিন্তু তার কথা কেউ কানে নিল না। তৃতীয় বল্মীকটি ভাঙতেই সত্যি মণি-রত্ন বেরিয়ে এলো। তখন তারা চতুর্থ বল্মীকটি ভাঙতে গেল। ভাবল, এতে হীরে-পান্না পাওয়া যাবে। সুবুদ্ধি আবারো নিষেধ করল। বলল, অতি লোভ ভালো নয়, যা পেয়েছ তাইতেই সন্তুষ্ট থাক। কে জানে এ হতে হীরে-পান্নার পরিবর্তে যদি সাপ বেরিয়ে যায়! কিন্তু তার কথা কে শুনবে? তার কথা শুনলে কি তারা সোনা ও মণি-রত্ন পেত? তাই তারা চতুর্থ বল্মীকটিও ভেঙে ফেলল। ভেঙে ফেলতেই সেই বল্মীক হতে দৃষ্টিবিষ সাপ বেরিয়ে এলো ও লোভী বণিকদের ভস্ম করে দিল।

আনন্দ, এই উপমা তোমার ধর্মাচার্যের জন্য। তিনি ধর্মাচার্যের যা পাবার তা সবই পেয়েছেন। নিজেকে তীর্থংকরও ঘোষিত করে দিয়েছেন। কিন্তু এতেও তাঁর সন্তোষ নেই। কিন্তু সংসারে তিনিই কি একমাত্র জিন, তীর্থংকর ও সর্বজ্ঞ? অন্য কেউ কি জিন, তীর্থংকর ও সর্বজ্ঞ হতে পারে না? তবে কেন তিনি আমার সম্বন্ধে যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন, গোশালক মংখলীপুত্র, তীর্থংকর নয়। আনন্দ, তুমি যাও। গিয়ে তোমার গুরুকে সাবধান করে দাও যে আমি এখুনি আসছি ও তাঁর অবস্থা দুর্বুদ্ধি বণিকদের মতো করছি।

আনন্দের আর ভিক্ষাচর্যায় যাওয়া হল না। তাড়াতাড়ি বর্দ্ধমান যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে ফিরে এলেন ও সমস্ত বিষয় তাঁকে নিবেদন করে বললেন, ভগবন্, গোশালক কি তপস্তেজে অন্যকে ভস্মীভূত করতে সমর্থ? ভস্মীভূত করা কি তাঁর শক্তির অন্তর্গত?

বর্দ্ধমান বললেন, হাঁ আনন্দ, গোশালক তেজোলেশ্যায় অন্যকে ভস্মীভূত করতে সমর্থ, ভস্মীভূত করা তার শক্তির অন্তর্গত। কিন্তু তবুও সেই তেজোলেশ্যায় তীর্থংকরকে ভস্মীভূত করা যায় না। যত তপোবল গোশালকে আছে তার অনন্ত গুণ তপোবল নিগ্রন্থ শ্রমণে আছে। কিন্তু নিগ্রন্থ শ্রমণ ক্ষমাশীল হন, তাঁরা সেই তপোবলের ব্যবহার করেন না। যত তপোবল নিগ্রন্থ শ্রমণে আছে তার অনন্তগুণ তপোবল নিগ্রন্থ স্থবিরে আছে।

কিন্তু স্থবিরেরা ক্ষমাশীল হন, সেই তপোবলের ব্যবহার করেন না। যত তপোবল নির্গ্রন্থ স্থবিরে আছে তার অনন্তগুণ তপোবল নির্গ্রন্থ তীর্থংকরে আছে। কিন্তু নির্গ্রন্থ তীর্থংকরেরা ক্ষমাশীল হন, সেই তপোবলের ব্যবহার করেন না। আনন্দ, তুমি গৌতমাদি স্থবিরদের গিয়ে একথা জানিয়ে দাও যে গোশালক এখন ক্রুদ্ধ ও বৈরভাব নিয়ে এখানে আসছে। তাই সে যাই বলুক, যাই করুক, কেউ যেন তার প্রতিবাদ না করে। এমন কি কেউ যেন তার সঙ্গে শাস্ত্রার্থেও প্রবৃত্ত না হয়।

আনন্দ সেকথা তাড়াতাড়ি সবাইকে গিয়ে জানিয়ে দিল।

কিন্তু সে ফিরে আসবার আগেই গোশালক আজীবিক শ্রমণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বর্দ্ধমান যেখানে বসেছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, কাশ্যপ, তুমিত খুব বলে বেড়াচ্ছ, আমি গোশালক মংখলীপুত্র, তোমার ধর্মশিষ্য। কিন্তু কি অজ্ঞান! আয়ুষ্মন্, তুমি কি জান, তোমার ধর্মশিষ্য মংখলীপুত্র গোশালকের কবে মৃত্যু হয়েছে? শোনো কাশ্যপ, আমি তোমার শিষ্য মংখলীপুত্র গোশালক নই, আমি এক ভিন্ন আত্মা। গোশালকের শরীর উপসর্গ সহক্ষম দেখে তাতে প্রবেশ করেছি মাত্র। আমি উদায়ী কুণ্ডিয়ান নামক ধর্ম প্রবর্তক। এই আমার সপ্তম শরীর প্রবেশ। তুমি জিগ্যেস করবে, আমি এভাবে অন্যের শরীরে প্রবেশ করি কেন? তার প্রত্যুত্তর আমাদের ধর্মশাস্ত্রানুসারে তোমায় দিচ্ছি। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে রয়েছে চৌরাসী লক্ষ মহাকল্পের পর সাত দিব্য সংযূথিক ও সাত সংনিগর্ভক জীবন যাপন করে সাত শরীরান্তর প্রবেশের ভিতর দিয়ে সমস্ত জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কাশ্যপ, আমি সাত দিব্য সাংযূথিক ও সাত সংনিগর্ভক জীবন যাপনের পর সপ্তম মনুষ্যভবে সাত শরীরান্তর গ্রহণ করেছি। সপ্তম মনুষ্যভবে আমি উদায়ী কুণ্ডিয়ান হয়ে জন্মগ্রহণ করি। রাজগৃহের বাইরে মণ্ডিতকুক্ষি চৈত্যে আমি উদায়ী কুণ্ডিয়ানের শরীর পরিত্যাগ করে ঐণেয়কের শরীরে প্রবেশ করি এবং সেই শরীরে বাইশ বছর বাস করি। উদ্দণ্ডপুর নগরে চন্দ্রাবতরণ চৈত্যে আমি ঐণেয়কের শরীর পরিত্যাগ করে মল্লরামের শরীরে প্রবেশ করি ও সেই শরীরে একুশ বছর বাস করি। চম্পা নগরীর অঙ্গমন্দির চৈত্যে মল্লরামের শরীর পরিত্যাগ করে মাল্যমণ্ডিতের

শরীরে প্রবেশ করি ও সেই শরীরে কুড়ি বছর বাস করি। বারাণসীর কাম মহাবনে মাল্যমণ্ডিতের শরীর পরিত্যাগ করে রোহের শরীরে প্রবেশ করি ও সেই শরীরে উনিশ বছর বাস করি। আলভিকার পত্তকালয় চৈত্যে রোহের শরীর পরিত্যাগ করে ভারদ্বাজের শরীরে প্রবেশ করি ও সেখানে আঠারো বছর বাস করি। বৈশালীতে কোণ্ডিয়ায়ন চৈত্যে ভারদ্বাজের শরীর পরিত্যাগ করে গৌতমপুত্র অর্জুনের শরীরে প্রবেশ করি ও সতেরো বছর সেখানে বাস করি। শ্রাবস্তীর হালাহলার ভাণ্ডশালায় অর্জুনের শরীর পরিত্যাগ করে স্থির, দৃঢ় ও কষ্টক্ষম গোশালকের শরীরে প্রবেশ করি। এই শরীরে ষোল বছর থাকবার পর আমি মোক্ষপদ লাভ করব। আর্য কাশ্যপ, এখন তুমি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছ, আমি কে? তুমি যদিও আমাকে গোশালক বলে অভিহিত করছ তবু আমি বাস্তবে গোশালক নই, গোশালকের শরীরধারী উদায়ী কুণ্ডিয়ান।

গোশালক একটুখানি থামতেই বর্দ্ধমান তাঁর দিকে চেয়ে বললেন গোশালক, চোর যেমন নিজেকে গোপন করবার জন্য অন্য পরিচয় দেয়, নিজেকে তেমনি তুমিও অন্য লোক বলে প্রমাণিত করতে চাইছ। কিন্তু মহানুভব, এভাবে নিজেকে ভিন্ন আত্মা বলে প্রমাণিত করা যায় না। এবং তার জন্য তুমি বৃথাই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করছ। তুমিই সেই মংখলীপুত্র গোশালক যে কিছুকাল আমার সঙ্গে ছিল। আর্য, তোমাতে এই মিথ্যাচরণ শোভা পায় না।

গোশালক এতে বিনীত হওয়াত দূরের কথা, আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। রূঢ় স্বরে বর্দ্ধমানের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, শোন ধূর্ত কাশ্যপ, তোমার বিনাশকাল এখন সমুপস্থিত। তুমি এখন নষ্ট হতে বসেছ। মনে করো তুমি যেন পৃথিবীতে কোনো কালেই জন্মগ্রহণ করোনি। আমি তোমাকে সহজে অব্যাহতি দেব না।

বর্দ্ধমানের প্রতি এই কটূক্তি, এই হীন শব্দ প্রয়োগ, বর্দ্ধমান শিষ্য সর্বানুভূতি সহ্য করতে পারল না। সে গোশালকের কাছে গিয়ে বলল, শোনো মহানুভব গোশালক, যদি কেউ ধর্ম প্রবক্তার কাছে ধর্ম প্রবচন শোনে সে তবে তাকে বন্দনা ও নমস্কার করে। আর ইনিত তোমার ধর্মগুরু।

এঁর প্রতি এত হীন কটূক্তি! মহানুভব, এ তোমায় শোভা পায় না। এ তোমার উচিত নয়।

সর্বানুভূতির সেই হিতবাক্য গোশালকের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করল। শান্ত হবার পরিবর্তে তিনি আরো প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন ও সর্বানুভূতির ওপর তেজোলেশ্যার প্রয়োগ করে বসলেন। সর্বানুভূতি সেই তেজলেশ্যার প্রচণ্ড জ্বালায় দগ্ধ হয়ে সেইখানেই মৃত্যুবরণ করল।

গোশালক তখন বর্দ্ধমানকে আরো কটূক্তি করে বলতে লাগলেন, অক্ষম! অপারগ! কোথায় তোমার সেই শীতলেশ্যা, যে শীতলেশ্যায় তুমি গোশালককে এক সময় রক্ষা করেছিলে? তুমি ভূয়ো তীর্থংকর! জনসাধারণকে বৃথাই তুমি প্রতারিত করছ। কই চুপ করে বসে রয়েছ কেন? অনুতাপ হচ্ছে না নিজের শিষ্যকে এ ভাবে বিনষ্ট হতে দেখেও? ধিক্ তোমাকে!

শান্ত হও গোশালক, শান্ত হও—বলে এগিয়ে এলো শ্রমণ সুনক্ষত্র। তার ধর্মগুরুর অপমান সেও আর সহ্য করতে পারছিল না। সে গোশালককে শান্ত করতে গেল।

সহ্য হচ্ছে না বুঝি তোমার ধর্মগুরুর অপমান? আচ্ছা, তার জ্বালা হতে তোমায়ও আমি মুক্তি দিচ্ছি বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন গোশালক। তারপর দেখতে দেখতে সর্বানুভূতির মতো সুনক্ষত্রও সেইখানে তেজলেশ্যার প্রচণ্ড জ্বালায় দগ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

গোশালক তখন আত্ম পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বর্দ্ধমানের দিকে চেয়ে বললেন, দেখলে কাশ্যপ, দেখলে আমার তপঃ-প্রভাব! তোমার দু'দু'জন শিষ্য কি ভাবে আমার তেজোলেশ্যায় মৃত্যুবরণ করল! এর পরও কি তুমি বলবে আমি মংখলীপুত্র গোশালক, আমি তোমার শিষ্য?

যা সত্য তা বলতেই হবে গোশালক! তুমি নিজেই আমাকে তোমার ধর্মাচার্যরূপে বরণ করেছিলে। আমি তোমাকে স্বীকার করেছিলাম। তাই আমি তোমার ধর্মগুরু। গোশালক, তুমি এখন ক্রোধের আবেশে রয়েছ তাই যথার্থ বিবেচনা শক্তি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি যা করেছ তা গর্হিত, তা অনুচিত।

তোমার দু'জন শিষ্যকে মৃত্যুবরণ করতে দেখেও এখনো তোমার দম্ভ গেল না কাশ্যপ! আমি তোমার শিষ্য? কখনো না। আমি উদায়ী কুণ্ডিয়ান। চরম তীর্থংকর।...কাশ্যপ, তুমি নিবীর্য। যদি তোমার মধ্যে একটুকু শক্তি ও মনুষ্যত্ব থাকত তবে তুমি এদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে। না, তা তোমার মধ্যে নেই...তবে চির জীবনের এই অনুশোচনার হাত হতে তোমাকেও আমি মুক্তি দেব। তোমার উপর আমি আমার তেজোলেশ্যার প্রয়োগ করব, যদি ক্ষমতা থাকে তবে প্রতিরোধ কর।

তীর্থংকর যেমন রক্ষাও করেন না তেমনি প্রতিরোধও করেন না, গোশালক। তবে তেজলেশ্যা তীর্থংকরকে দগ্ধ করে না। মেরুপর্বতে প্রতিহত বাতাসের মতো তা ফিরে যায় এবং যে তার প্রয়োগ করে তার শরীরে প্রবেশ করে' তাকে দগ্ধ করে। তোমার প্রযুক্ত তেজোলেশ্যা আমার এখান হতে প্রতিহত হয়ে তোমার কাছেই ফিরে গেছে। তার জ্বালায় তুমিই এখন দগ্ধ হচ্ছ।

তার জ্বালায় সত্যি তখন দগ্ধ হচ্ছিলেন গোশালক কিন্তু সেকথা প্রকাশ্যে স্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি জ্বালায় পীড়িত হয়েও উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে উঠলেন, মিথ্যে কথা বলছ কাশ্যপ, আমার তেজোলেশ্যা আমার শরীরে প্রবেশ করেনি। তোমার শরীরেই প্রবেশ করেছে। এর প্রভাবে ছ'মাসের মধ্যে তুমি পিত্ত ও দাহ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ছদ্মস্থ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে।

না গোশালক। ছ'মাসের মধ্যে পিত্ত ও দাহজ্বরে আমার মৃত্যু হবে না। আমি এখনো ষোল বছর আরো বেঁচে থাকব। আর তুমি তোমার নিজের তেজলেশ্যায় দগ্ধ হয়ে সাতদিনের মধ্যে ছদ্মস্থ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। গোশালক, তুমি ভালো করোনি। এখনো সময় রয়েছে। পশ্চাত্তাপ করো, প্রতিক্রমণ করো যাতে উর্দ্ধগতি লাভ করতে পার।

তোমার উপদেশ দিতে হবে না, কাশ্যপ। তুমি তোমার নিজের কথা চিন্তা কর, আমার কিসে ভাল হবে সে আমি নিজেই স্থির করে নেব।

সে তো ভাল কথা, বলে বর্দ্ধমান একটু হাসলেন, তারপর নিজের শ্রমণ সংঘের দিকে চেয়ে বললেন, এবারে তোমরা ওর সঙ্গে কথা বলতে পার,

ওর সঙ্গে বাদ-বিবাদ করতে পার। গোশালকের তেজোলেশ্যা চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু আর কথা বলবার বা বাদ-বিবাদ করবার মতো অবস্থা তখন গোশালকের ছিল না। তেজোলেশ্যার জ্বালায় তাঁর সমস্ত শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তাই তার প্রয়োজন নেই, বলে তিনি সশিষ্য সেই স্থান পরিত্যাগ করে হালাহলার ভাণ্ডশালায় ফিরে গেলেন।

[ক্রমশঃ

জৈনাগম ও জাতকে বর্ণিত
চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথা

শ্রী বি. এল. নাহটা

[পূর্বানুবৃত্তি]

(৩)

মালব দেশে সুদর্শন নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে মণিরথ নামে এক রাজা রাজ্য করতেন। তাঁর ভাইয়ের নাম ছিল যুগবাহু। যুগবাহুর স্ত্রীর নাম ছিল মদনরেখা ও পুত্রের নাম চন্দ্রযশ।

যুগবাহুর স্ত্রী মদনরেখা অসম্ভব রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। এক সময় তাঁকে দেখে রাজা মণিরথ তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন। মদনরেখা তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করলে মণিরথ ভাবলেন যে তাঁর ভাই যুগবাহু বেঁচে থাকতে মদন-রেখাকে পাওয়া যাবে না। তখন তিনি তাকে হত্যা করবার কথা ভাবতে লাগলেন।

কিছুদিন পরের কথা। মদনরেখা তখন গর্ভবতী। তাঁকে নিয়ে যুগবাহু সেদিন নগর-প্রান্তস্থিত উপবনে বেড়াতে গেলেন। রাত্রে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন না করে তাঁরা সেখানেই কদলী গৃহে রয়ে গেলেন। মণিরথ ভাইকে হত্যার এই উত্তম সুযোগ দেখে একাকী কদলী গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও ভাইকে ডেকে প্রাসাদে ফিরে যেতে বললেন। যুগবাহু জাগরিত হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখে যেই তাঁকে প্রণাম করতে যাবেন অমনি মণিরথ তাঁর খড়্গ দিয়ে তাঁকে হত্যা করলেন।

মদনরেখা মণিরথের মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাই সেখানে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে গভীর বনে প্রবেশ করলেন ও সমস্ত রাত পথ হেঁটে ভোরের দিকে এক সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রসব বেদনা ওঠায় কদলী বৃক্ষের তলে তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব

করলেন। পুত্রকে পিতার নামাঙ্কিত কবচ পরিয়ে শরীর শুদ্ধির জন্য যখন তিনি জলে নামলেন তখন এক জলহস্তী তাঁকে শুঁড়ে জড়িয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল। সেই সময় আকাশ পথ দিয়ে এক বিদ্যাধর কুমার তাঁর সাধু পিতাকে বন্দনা করবার জন্য নন্দীশ্বর দ্বীপে যাচ্ছিলেন। তিনি মদনরেখাকে শূন্যে লুফে নিলেন ও তাঁকে বৈতাঢ্য পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি মদনরেখার কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখলেন কিন্তু মদনরেখা তাঁকে তাঁর পুত্রের কাছে পৌছে দিতে বললেন। বিদ্যাধর কুমার বললেন যে তোমার পুত্রকে মিথিলার রাজা পদ্মরথ নিয়ে গেছেন। তাঁর পুত্র না থাকায় তিনি তাকে পুত্রবৎ পালন করছেন। বিদ্যাধর কুমার আবার বিবাহের প্রস্তাব করায় মদনরেখা বললেন যে আপনি আগে পিতার বন্দনা করে আসুন, তারপর যা হয় করা যাবে।

বিদ্যাধর কুমার পিতার কাছে গিয়ে মদনরেখার সমস্ত কথা জানতে পারলেন। তাঁর জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হল। তিনি তখন ফিরে এসে মদনরেখার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। মদনরেখা তখন সাধ্বীধর্ম গ্রহণ করলেন।

মদনরেখার পুত্রের প্রভাবে শত্রু রাজারাও পদ্মরথের কাছে নতি স্বীকার করতে লাগল। পদ্মরথ তাই তার নাম রাখলেন নমি। নমি বড় হলে পদ্মরথ তাকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

ওদিকে যুগবাহুকে হত্যা করে মণিরথ রাজা যখন রাজধানীতে ফিরে আসছিলেন তখন সর্প দংশনে তাঁর মৃত্যু হল। মন্ত্রীরা তখন যুগবাহুর পুত্র চন্দ্রযশকে সিংহাসনে বসিয়ে মণিরথ ও যুগবাহুর এক সঙ্গে অগ্নি সংস্কার করলেন।

একবার রাজা নমির শ্বেতহস্তী উন্মত্ত হয়ে বিন্ধ্যাচলের দিকে ছুটে গেল। সে যখন সুদর্শনপুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তার খবর পেয়ে চন্দ্রযশ অনেক পরিশ্রমে তাকে তার রাজধানীতে প্রবেশ করাল।

নমির কাছে যখন এই সংবাদ পৌছল তখন নমি তাকে ফেরৎ দেবার জন্য চন্দ্রযশের কাছে দূত পাঠাল। চন্দ্রযশ হাতী ফেরৎ দিতে অস্বীকার করলে নমি সুদর্শনপুর আক্রমণ করল।

যুদ্ধের খবর পেয়ে সাধ্বী মদনরেখা নমির কাছে গিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ না করবার জন্য তাকে অনেক বোঝালেন কিন্তু নমি তাঁর কথা একটিও কানে নিল না। তখন মদনরেখা চন্দ্রযশের কাছে গেলেন। মাকে দেখে চন্দ্রযশ খুব খুসী হল ও ছোট ভাইয়ের খবর পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। শুধু তাই নয়, সে তাকে নিজের রাজ্য দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করল।

নমি দুই রাজ্যের আধিপত্য লাভ করে রাজ্য করতে লাগলেন। তারপর এক সময় রোগাক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রোগ দুরারোগ্য বলে চিকিৎসকেরা অভিমত ব্যক্ত করল।

নমি আর কিছুতে শান্তি পেতেন না, যা পেতেন সে কেবল চন্দন প্রলেপে। তাই তাঁর জন্য অন্তঃপুরিকারা চন্দন ঘষতে আরম্ভ করল। চন্দন ঘষবার সময় কঙ্কণের যে কণ্ কণ্ আওয়াজ হচ্ছিল তাতে যখন তাঁর কষ্ট হতে লাগল তখন তারা হাতে এক একটী কঙ্কণ রেখে আর সব কঙ্কণ খুলে ফেলল। কঙ্কণের আওয়াজ না হওয়ায় নমি ভাবলেন যে অন্তঃপুরিকারা চন্দন ঘষা বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি সে কথা জিজ্ঞাসা করলে মন্ত্রীরা বললেন, দেব, তা নয়। আপনার কষ্ট হচ্ছিল বলে তারা হাতে এক একটী কঙ্কণ রেখে বাকি কঙ্কণ খুলে ফেলেছে। তাই শব্দ হচ্ছে না।

নমি তখন ভাবতে লাগলেন, যেখানে অনেক সেখানেই দোষ, যদি একা থাকা যায় তবে সেই ভালো। যদি তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে একাকী বিচরণ করবেন। কি আশ্চর্য! সেদিন রাত্রেই তিনি ব্যাধিমুক্ত হলেন। পরদিন সকালে উঠেই নমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

(৪)

গান্ধার দেশে পুণ্ড্রবর্ধন নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে সিংহরথ নামে এক রাজা ছিলেন। কোনো সময়ে উত্তরাপথের এক রাজা তাঁকে দুটী ঘোড়া উপহার পাঠান। এ দুটী ঘোড়ার একটী ছিল বিপরীত শিক্ষাসম্পন্ন। রাজা বিপরীত শিক্ষাসম্পন্ন ঘোড়ায় নিজে ও অন্যটীতে রাজপুত্রকে বসিয়ে তাদের পরীক্ষা করবার জন্য বার হলেন।

রাজার ঘোড়া তীরের মতো ছুটছিল তাই তাকে ধীরে করবার জন্য রাজা

রাশ টানতে লাগলেন। রাজা যত রাশ টানেন ঘোড়া তত জোরে ছোটে। এভাবে ছুটতে ছুটতে ঘোড়া তাঁকে তাঁর রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে এক গভীর বনে নিয়ে এল। রাজা যখন রাশ টেনে তাকে কিছুতেই থামাতে পারলেন না তখন ক্লান্ত হয়ে রাশ ছেড়ে দিলেন। রাজা রাশ ছাড়তেই ঘোড়াও দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘোড়াটাকে যে বিপরীত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে রাজা তখন তা বুঝতে পারলেন।

রাজা তখন ঘোড়াটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে বন ফল খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন ও তারপর রাত্রের জন্য আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে সামনের পাহাড়ে এক সাতমহলা প্রাসাদ দেখতে পেলেন। তিনি সেই প্রাসাদে উপস্থিত হলে এক কন্যা তাঁকে সাদরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কন্যাটি বলল যে আগে আপনি আমায় বিবাহ করুন পরে পরিচয় দেব। রাজা তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাই গান্ধর্ব মতে তাকে বিবাহ করে নিলেন।

বিবাহের পর সেই কন্যা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল যে ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠ-পুরে জিতশত্রু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এক সময় তাঁর রাজধানীতে এক বিরাট চিত্রসভা নির্মাণ করান। সেই চিত্র সভা চিত্রিত করবার জন্য তিনি শিল্পী নিয়োগ করেন ও তাদের মধ্যে কাজ বণ্টন করে দেন। সেই শিল্পীদের মধ্যে এক বৃদ্ধ শিল্পী ছিল যার নাম ছিল চিত্রাঙ্গদ। চিত্রাঙ্গদের পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তার কাজে সাহায্য করবারও কেউ ছিল না।

সেই বৃদ্ধ শিল্পীর কণকমঞ্জরী নামে এক মেয়ে ছিল। সে প্রতিদিন তার খাবার নিয়ে চিত্রসভায় যেত। একদিন সে যখন খাবার নিয়ে চিত্রসভায় যাচ্ছিল তখন সামনে হতে এক ঘোড়সোয়ারকে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখল। পথ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় কোনোমতে আত্মরক্ষা করে সে চিত্রভায় গিয়ে উপস্থিত হল। তার বাবা যতক্ষণ খাবার খাচ্ছিলেন ততক্ষণ সে বসে বসে মাটিতে ময়ূরের পালক আঁকল। তার পালক আঁকাও শেষ হল কি রাজাও সহসা সেই চিত্রসভা দেখতে এলেন। চিত্র দেখতে দেখতে মাটিতে ময়ূরের পালক দেখে তিনি তা তুলে নিতে গেলেন। তাতে তাঁর আঙুলে আঘাত লাগল।

সেই মেয়েটী তখন হেসে উঠল ও বলল মূর্খরূপী পালঙ্কের এতক্ষণ তিন পায়া

ছিল এখন চার পায়া পূর্ণ হল। রাজা সেকথা শুনে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। মেয়েটী তখন বলল আজ আমি যখন বাবার জন্য খাবার নিয়ে আসছিলাম তখন এক ঘোড়সোয়ারকে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখলাম। রাজপথ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সকলে ব্যবহার করে। তাই রাজপথে জোরে ঘোড়া ছোটান মূর্খের কাজ। তাই সে মূর্খরূপী পালঙ্কের প্রথম পায়া। দ্বিতীয় পায়া এই নগরের রাজা। আমার পিতা বৃদ্ধ ও পুত্রহীন। তবুও তার শক্তি ও সামর্থ্য পরিজ্ঞাত না হয়ে তিনি অন্যের সমান কাজ তাঁকে ভাগ করে দিয়েছেন। সে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয় পায়া আমার পিতা। আমি নিয়ত সময়ে তাঁর খাবার নিয়ে আসি। অথচ তিনি আমি আসার পর স্নানাদি করতে যান। তাতে খাবার ঠাণ্ডা হয়। তিনি আমার আসার আগেই স্নানাদি শেষ করে রাখতে পারেন। আর চতুর্থ পায়া আপনি। কারণ যেখানে ময়ূরের পালক আসবার সম্ভাবনা নেই আর যদি এসেও থাকে তবে বাতাসে নড়বে চড়বে, সেকথা বিবেচনা না করেই তা মাটি হতে তুলতে গেলেন।

তার প্রত্যুত্তর শুনে তার স্পষ্টবাদিতা, বুদ্ধি ও বাকচাতুর্যে রাজা মুগ্ধ হলেন ও তাকে বিবাহ করে নিলেন।

সেই কন্যা মৃত্যুর পর দৃঢ়শক্তি রাজার ঘরে কণকমালা হয়ে জন্মগ্রহণ করল ও তার পিতা আকাশচারী দেবতা হয়ে। কণকমালা বড় হলে এক বিদ্যাধর তাকে অপহরণ করে এই প্রাসাদে বন্দী করে রাখে। সেই সময় তার পিতা প্রকট হন ও তার কার সঙ্গে বিবাহ হবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, তার পূর্ব জন্মের স্বামী জিতশত্রু এখন সিংহরথ হয়ে জন্মগ্রহণ করছেন। তিনি ঘোড়ায় করে এখানে আসবেন। তাঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে।

কণকমালা একথা বললে রাজারো পূর্ব জন্মের স্মৃতি মনে পড়ে গেল। তিনি তখন কণকমালার সঙ্গে সেখানে কিছুকাল বাস করলেন। তারপর নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেও প্রায়ই এখানে এসে বাস করতে লাগলেন। তিনি প্রায়ই পাহাড়ে বাস করতেন বলে তাঁর নাম হল নগ্গতি।

নগ্গতি একদিন নগর ভ্রমণে বার হলেন। পথে আম গাছে মঞ্জরী ধরে

থাকতে দেখে তার একটী মঞ্জরী ভেঙে নিলেন। তাঁকে মঞ্জরী ভেঙে নিতে দেখে তাঁর অনুচর ও দাসদাসীদের সকলে এক একটী মঞ্জরী ভেঙে নিল। শেষে পল্লব, পাতা, কচি ডাল পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলল। ফেরার পথে রাজা সেই গাছের দুরবস্থা দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ও কারণ অবগত হয়ে বিচার করতে লাগলেন যে লক্ষী কত চঞ্চলা।

জো চুয় অকৃখং সুমণাভিরামং
সমংজরীপল্লব পুপ্ফ চিত্তং।
রিদ্ধিং অরিদ্ধিং সমুপেহিয়াণং
গংধার রায়া বি সমেক্‌খ ধম্মং॥

যে আমগাছ পত্র, পুষ্প, পল্লব ও মঞ্জরীযুক্ত ছিল তাকে সমৃদ্ধিহীন দেখে গান্ধার-রাজ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

এই চার প্রত্যেক বুদ্ধ বিচরণ করতে করতে একবার ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠপুরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে এক যক্ষায়তন ছিল যাতে প্রবেশের চারটী দরজা ছিল। পূবের দরজা দিয়ে করকণ্ডু সেই যক্ষায়তনে প্রবেশ করলেন। সেই যক্ষায়তনের প্রতিমার মুখ পূবদিকে ছিল। তারপর দুর্মুহ দক্ষিণের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। তখন যক্ষ দক্ষিণ দিকে একটী নূতন মুখ বার করল। এভাবে পরপর নমি ও নগ্‌গতি যখন পশ্চিম ও উত্তরের দরজা দিয়ে যক্ষায়তনে প্রবেশ করলেন তখন যক্ষও পর পর পশ্চিম ও উত্তর দিকে মুখ বার করল। এভাবে সে চতুর্মুখ হয়ে গেল।

করকণ্ডু রাজ্য বৈভবাদি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করলেও হাতে চুলকানির জন্য একটী কাষ্ঠশলাকা নিজের কাছে রাখতেন। তাই দেখে দুর্মুহ বললেন, হে মুনি, আপনি যখন রাজ্যাদি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করেছেন তখন এই কাষ্ঠশলাকা কেন রেখেছেন?

জয়া রজ্জং চ রট্‌ঠং চ পুরং অংতউরং তহা।
সব্ব মেয়ং পরিচ্চজ্জ সংচয়ং কিং করেসিমং॥

করকণ্ডু কিছু প্রত্যুত্তর দেবার পূর্বেই নমি দুর্মুহকে উদ্দেশ করে বললেন, হে মুনি, আপনি যখন রাজ্যাদি পরিত্যাগ করেছেন তখন আপনি কেন অন্যের দোষ দেখছেন?

নগ্‌গতি তখন বললেন, হে মুনি, মুক্তির জন্য যখন সব কিছু ত্যাগ করেছেন তখন মুক্তির প্রযত্ন করুন, অন্যের দোষ দেখবেন না।

করকণ্ডু তখন বললেন, মুক্তিকামী মুনির যদি কোন ত্রুটি থাকে আর যদি তা কেউ দেখিয়ে দেয় তবে তা নিন্দনীয় নয়। দোষ দর্শন তখনি নিন্দনীয় যখন তা ঈর্ষ্যা জন্য।

সকলে তখন করকণ্ডুর কথা স্বীকার করে নিলেন ও পূর্ববৎ পৃথক পৃথক ভাবে বিচরণ করতে লাগলেন।

যদিও এই চার প্রত্যেক বুদ্ধের জন্ম, প্রব্রজ্যা ও মুক্তিলাভের স্থান স্বতন্ত্র তবে এই তিনটী ঘটনা প্রত্যেকের জীবনে একই সময়ে সংঘটিত হয়।

দিগম্বর সাহিত্যে চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথা

দিগম্বর সাহিত্যে চার প্রত্যেক বুদ্ধের কেবল করকণ্ডুর জীবন চরিত্রই পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে মুনি কণকামর রচিত করকণ্ডু-চরিউ-ই সব চাইতে বেশী প্রাচীন। গ্রন্থটী একাদশ শতকে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত হয়। ডাঃ হীরালাল জৈন কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে কারঞ্জা হতে তা কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে শ্বেতাম্বর ও বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রাপ্ত বর্ণনার সামান্য মিল আছে তবে অনেক অন্য ঘটনা ও অবান্তর কথা ও কাহিনী দিয়ে গ্রন্থটীকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে দধিবাহনের নাম ধাড়ীবাহন ও তিনি মালীর গৃহে পালিতা কৌশাম্বীর রাজকন্যা পদ্মা-বতীকে বিবাহ করেন। পদ্মাবতী গর্ভবতী হলে দোহদ পূর্তির জন্য হাতীর পিঠে চড়ে বন ভ্রমণে যান ও হাতী কর্তৃক আহত হয়ে মালীর ঘরে আশ্রয় নেন। শ্মশানে পুত্র প্রসব করলে মাতঙ্গ নামক বিদ্যাভ্রষ্ট বিদ্যাধর তাকে পালন করেন। হাতে চুলকানি থাকবার জন্য তার নাম হয় করকণ্ডু। যৌবনে তিনি দন্তীপুরের রাজা হন ও গিরনারের রাজকন্যা মদনাবলীকে বিবাহ করেন।

একবার চম্পানগরের দূত তাঁর কাছে আসে ও তাঁকে চম্পানরেশ ধাড়ীবাহনের আধিপত্য স্বীকার করতে বলে। করকণ্ডু ক্রুদ্ধ হয়ে চম্পা আক্রমণ করলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। শেষে পদ্মাবতী এসে পিতাপুত্রের মিলন

করিয়ে দেন। মিলনের পর ঘাড়ীবাহন চম্পা রাজ্যও করকুণ্ডুকে দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

রাজ্য বিস্তারের জন্য করকণ্ডু দ্রাবিড় দেশ জয় করতে যান। পথে তেরাপুরের রাজা শিব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন ও তাঁকে পাহাড়ের গুহা মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পার্শ্বনাথের প্রতিমা দর্শন করান। সেখানে এক বিদ্যাধর সেই প্রাচীন প্রতিমার ইতিবৃত্ত বিবৃত করে। সেই ইতিবৃত্ত শুনে করকণ্ডু সেখানে আরো ছুটী গুহা মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। এরপর সেই বিদ্যাধর হাতী হয়ে করকণ্ডুর স্ত্রী মদনাবলীকে হরণ করে।

করকণ্ডু তখন মদনাবলীর সন্ধানে সিংহল দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন ও সেখানকার রাজকন্যা রতিবেগার পাণি গ্রহণ করেন। জলপথে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছেন তখন এক ভীমকায় মৎস্য তাঁর নৌকো আক্রমণ করে। করকণ্ডু তাকে হত্যা করে যখন আবার নৌকায় উঠতে যাবেন তখন এক বিদ্যাধরী তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যায়। তাকে বিবাহ করে করকণ্ডু রতিবেগার কাছে আবার ফিরে এলেন। চোল ও পাণ্ড্য-রাজকে পরাজিত করে তিনি নিজের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। ফেরবার পথে তিনি আবার তেরাপুরে এলেন। সেখানে মদনাবলীকে তিনি তিনি ফিরে পেলেন।

করকণ্ডু তারপর চম্পানগরে অবস্থান করে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। কালান্তরে শীলমুখ্য মুনির কাছে নিজের পূর্বজন্ম জ্ঞাত হয়ে পুত্রকে রাজ্য দিয়ে মুনি ধর্ম অবলম্বন করলেন। ঘোর তপশ্চর্যায় সেই জন্মেই তিনি মুক্তিলাভ করলেন।

কণকামর রচিত এই জীবন চরিত্রে নয়টী অবান্তর গল্প আছে। দ্রাবিড় দেশ জয়ের কথাও এই গ্রন্থের বিশেষত্ব যা বৌদ্ধ বা শ্বেতাম্বর সাহিত্যে পাওয়া যায় না। অন্যান্য বিষয় মোটামুটি মেলে। দিগম্বর সাহিত্যে যে গুহামন্দির নির্মাণের কথা আছে তেরাপুরে আজো তা বিদ্যমান। সেখানে ভগবান পার্শ্বনাথের প্রাচীন প্রতিমাও রয়েছে।

শ্বেতাম্বর সাহিত্য

শ্বেতাম্বর পরম্পরায় চার প্রত্যেক বুদ্ধ সম্বন্ধীয় সাহিত্য প্রচুর পাওয়া যায়। মূল উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে ত কেবল তাদের নাম ও স্থানের নাম রয়েছে। কিন্তু এর সব চাইতে প্রাচীন টীকা বা জিনদাস গণি মহত্তরের চূর্ণিতে পাওয়া যায় তা খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের। উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের নবম নমি অধ্যয়নের টিপ্পনীতে চার প্রত্যেক বুদ্ধ যে যে কারণে প্রতিবুদ্ধ হন সেই কারণ সম্বলিত গাথা ও তার বিবেচন পাওয়া যায়। কল্পসূত্রের পর যে জৈন আগমের সব চাইতে বেশী টীকা রচিত হয়েছে তা উত্তরাধ্যয়ন। সেই সব টীকাতেও চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথা লিপিবদ্ধ। কোনো কোনো টীকায় প্রাকৃতে পদ্য ছন্দে সবিস্তার এদের জীবন বৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো টীকায় জীবন চরিত্র গদ্যপদ্যময় ও সংস্কৃতে। স্বতন্ত্র ভাবেও অনেক প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র পাওয়া যায়। তার কয়েকটী এখানে উল্লেখ করছি।

(১) প্রাকৃত প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র চন্দ্র গচ্ছীয় শিবপ্রভ শিষ্য তিলক দ্বারা রচিত। শ্লোক সংখ্যা ৬০০০। এই গ্রন্থের প্রতিলিপি বরোদা, পুনা, ছানী প্রভৃতি স্থানের জ্ঞান ভাণ্ডারে রক্ষিত রয়েছে।

(২) সংস্কৃত মহাকাব্যে প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র খরতর গচ্ছীয় শ্রীজিনেশ্বর সূরি শিষ্য লক্ষ্মীতিলক দ্বারা ১৩১১ সম্বতে রচিত। গ্রন্থটী ১৭ সর্গে বিভক্ত। এর প্রাচীনতম প্রতিলিপি জৈসলমীরের বৃহৎ জ্ঞান ভাণ্ডারে রক্ষিত। সেখানে গ্রন্থের রচয়িতা ও লিপিকারের প্রশস্তি বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হয়েছে।

(৩) প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র—খরতর গচ্ছাধিরাজ শ্রীজিনবর্দ্ধন সূরি রচিত। এই গ্রন্থের চারিটী প্রকাশ মাত্রই পাওয়া যায়, যেখানে নমির চরিত্র পর্যন্তই বর্ণিত হয়েছে। একথা আজ বলা শক্ত, যে গ্রন্থকার গ্রন্থটী পূর্ণ করে যেতে পারেন নি না তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। আমি আরো দুটী হস্ত লিখিত প্রতিলিপি দেখি। সেখানেও নমি চরিত্র পর্যন্তই পাওয়া যায়। এদুটীর প্রথমটী বারাণসীর রামঘাট জৈন মন্দির স্থিত আচার্য হীরাচন্দ্রসূরী জ্ঞান ভাণ্ডারের। সময় ষোড়শ শতাব্দী। দ্বিতীয়টি ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিট্যুট, পুনার। জিনবর্দ্ধন সূরি রচিত প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র গ্রন্থাকারে হীরালাল হংসরাজ দ্বারা

জাম নগর হতে প্রকাশিতও হয়েছে। তবে সেখানে রচয়িতার নাম দেওয়া হয়নি।

লোক ভাষায় মহাকবি সমর-সুন্দর আদির প্রত্যেক বুদ্ধ চৌপাই পাওয়া যায়। এ ছাড়া অনেক অনামা লেখকের কৃতিও পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের তুলনাত্মক অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন। এবিষয়ে খুব বেশী কাজ আজো হয়নি। যেমন আগেই বলেছি এমন অনেক শব্দ রয়েছে তার অর্থ ও ভাব পরম্পরা এবং এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার আশয় বোঝবার ও ভারতীয় লোক গাথার অনুসন্ধানের জন্য এই দুই সাহিত্যের তুলনাত্মক আলোচনা শিক্ষাপ্রদই নয়, একান্ত আবশ্যক।

মহাবীর বলেছিলেন

যাত্রা সম্বন্ধীয়

পাথেয় না নিয়ে
যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে
পথে সে যেমন কষ্ট পায়,

ধর্মাচরণ না করে
যে পরলোক যাত্রা করে
আধি ও ব্যাধিতে পীড়িত হয়ে
পথে সেও তেমনি কষ্ট পায়।

পাথেয় নিয়ে
যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর না হয়ে
পথে সে যেমন সুখী হয়,

ধর্মাচরণ করে
যে পরলোক যাত্রা করে
সামান্য কর্মাবশেষ থাকে বলে
পথে সেও তেমনি সুখী হয়।

ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ
এ চারটি কষায়
যা পাপ বৃদ্ধি করে ;
আত্মহিতেচ্ছু এদের পরিহার করবে।

ক্রোধ প্রীতিকে নষ্ট করে,
মান বিনয়কে,
মায়া মৈত্রীকে নষ্ট করে,
লোভ সমস্ত কিছুকে।

উপশমের দ্বারা ক্রোধ জয় কর,
মৃদুতার দ্বারা মান,
সরলতার দ্বারা মায়া জয় কর,
সন্তোষের দ্বারা লোভ।

ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ
এই চারটি কষায়
যা আত্মাকে মলিন করে ;
এদের পরিজ্ঞাত হয়ে
অর্হৎ ও মহর্ষিরা
পাপ কর্ম করেন না
বা অন্তকে পাপ কর্মে
নিযুক্ত করেন না।

অনিগ্রিহীত ক্রোধ ও মান
ও প্রবর্দ্ধমান মায়া ও লোভ
সেই মলিন কষায়
যা পুনর্জন্ম রূপ বৃক্ষের
মূল সিঞ্চন করে।

ভগবন্,
ক্রোধ বিজয়ে সে কি লাভ করে ?
ক্রোধ বিজয়ে সে ক্ষান্তি লাভ করে,

ক্রোধ বর্দ্ধক নূতন কর্মের আগমন হয় না
ও পূর্ব বদ্ধ ক্রোধ কর্মের ক্ষয় হয়।

ভগবন্,
মান বিজয়ে সে কি লাভ করে?
মান বিজয়ে সে মৃদুতা লাভ করে,
মান বর্দ্ধক নূতন কর্মের আগমন হয় না
ও পূর্ব বদ্ধ মান কর্মের ক্ষয় হয়।

ভগবন্,
মায়া বিজয়ে সে কি লাভ করে?
মায়া বিজয়ে সে সরলতা লাভ করে,
মায়া বর্দ্ধক নূতন কর্মের আগমন হয় না
ও পূর্ব বদ্ধ মায়া কর্মের ক্ষয় হয়।

ভগবন্,
লোভ বিজয়ে সে কি লাভ করে?
লোভ বিজয়ে সে সন্তোষ লাভ করে,
লোভ বর্দ্ধক নূতন কর্মের আগমন হয় না
ও পূর্ব বদ্ধ লোভ কর্মের ক্ষয় হয়।

বাধা সম্বন্ধীয়

কাম পরিহার সত্যিই কঠিন,
যারা অধীর তাদের পক্ষে
সম্ভব নয় কখনো।
কিন্তু যাঁরা ধীর
তাঁরা পারেন বণিকদের মতো
এই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করতে।

এই দেহই নৌকো,
আর তুমি নাবিক,
এই সংসারই সমুদ্র
যা মহর্ষিরা অতিক্রমণ করেন।

একথা বোঝ, আর কেনই বা বুঝবে না?
পরে বোধিলাভ করব, তা হয় না।
যে দিন গত হয় সেদিন ফেরে না,
আর পরজন্মে যে মানুষ হয়েই জন্মাবে
তারি বা নিশ্চয়তা কী?

জগতে শত্রু বা মিত্র
সকলের প্রতি সমভাব রাখা সহজ নয়,
সহজ নয় আজীবন
জীবহত্যা হতে বিরত থাকা।

সহজ নয়
ভুলেও মিথ্যা কথা না বলা,
সহজ নয়
প্রিয় ও সত্য কথা বলা।

সহজ নয়
কাম ভোগের পর
কাম ভোগ হতে বিরত থাকা
ও সংযম পালন করা।

সহজ নয়
পরিগ্রহময় সংসারে
সন্তোষ লাভ করে পরিতুষ্ট থাকা,

কারণ সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্যও
কাউকে পরিতুষ্ট করতে পারে না।

তবু আমি শুনেছি
এবং জেনেছি—
বন্ধন হতে মুক্তিলাভ
সে তোমার ইচ্ছাধীন।

[ক্রমশঃ

একটি শিশির বিন্দু

পাকবিড়রার পদ্মপ্রভ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমার রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার কথা মনে হচ্ছিল :

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু,
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

সত্যিই তাই। আমরা সিদ্ধাচলে যাই কি মাউণ্ট আবুতে, গির্ণার কি রণকপুরে কিন্তু ঘরের কাছের পাকবিড়রায় ক'জন আসি? বোধ হয় সে ঘরের কাছে বলেই।

ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈন পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখে। দেখে এসেছি ধারাপত, বহুলারা, হাড়-মাসরা, পরেশনাথ, অম্বিকানগর। কিন্তু আজ যা দেখছি—পদ্মপ্রভের মুখে লাগা একটুখানি হাসি—সে হাসির তুলনা হয় না।

কি আছে সেই হাসিতে? প্রেম, করুণা, দয়া, বৈরাগ্য, নিস্পৃহতা—না, এর কোনো একটা বললে কিছুই বলা হয় না। যে সেই হাসি দেখেছে, সেই বুঝবে এমন হৃদয়-হরা হাসি আর সে কখনো দেখে নি, যে হাসি পার্থিব জগতের সমস্ত ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে মানুষের মনকে মুক্তি দেয় মহাকাশের নিঃসীমতায়, যেখানে সে অনুভব করে আনন্দের সেই অজস্র প্রবাহ, যে প্রবাহে চঞ্চল বিশ্বের পরমাণু, যেখানে পার্থিব জগতের বোধ থাকে না, সব কিছু হারিয়ে যায়, এক হয়ে যায়।

আশ্চর্য হয়ে ভাবি কি করে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছিল সেই হাসি ? কোন ধ্যানের গভীরতায় ডুবে গিয়ে সে পেয়েছিল এই হাসির ত্যোতনা ?—যা আমাকে এমন মুগ্ধ করেছে। দেখেছি আবুর শিল্পীর কাজ। বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি। পদ্মের পাঁপড়ি পাথরের বলে মনে হয় নি। কাছে গিয়ে দেখতে গিয়ে মুখ সরিয়ে নিয়েছি ; ভয় হয়েছে পাছে নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় তা শুকিয়ে যায়। এত সূক্ষ্ম, এত সজীব ! নর্তকীদের লীলায়িত দেহ ভঙ্গী জাগিয়ে দিয়েছে এক মাদকতা, মনে হয়েছে এই বুঝি মুখর হয়ে উঠবে সভামণ্ডপ নৃত্যের তালে তালে দেবাঙ্গনাদের চঞ্চল পদ পাতে। ঝম ঝম করে বেজে উঠবে হার, কেয়ূর, মেখলা, মণি বলয়। মণি বলয় এতো আলতো হয়ে লেগে রয়েছে যে ভয় হয়েছে এই বুঝি খুলে পড়ে যাবে। কিন্তু না, সেই সব কিছুকে হার মানিয়ে গেছে কায়োৎসর্গে দাঁড়ানো পদ্মপ্রভের ঠোঁটে লাগা একটুখানি হাসি, ধানের শিষের ওপরের টলটল করা শিশির বিন্দুর মতোই যা উজ্জ্বল, যা পবিত্র, স্বর্গীয় মাধুরীতে যা অভিসিঞ্চিত।

কতক্ষণ ধরে দেখেছি সেই হাসি মনে নেই। তারপর এসে বসেছি পুকুর ধারে ভাঙ্গা সিঁড়ির ধাপে। মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ। ঝিলমিল করছে বনবাদাড়, ধানের ক্ষেত। চার পাশে অজস্র লোকজন। আজ মেলা, তাই মানুষের ভীড়। চৈত্র মাসে এখানে মেলা হয়। আস-পাশের গ্রাম হতে মানুষ আসে। পদ্মপ্রভ ভৈরব রূপে পূজা পায়। তাই আজ পদ্মপ্রভের গলায় শ্বেত করবীর মালা দুলছে, ললাটে রক্ত চন্দনের ছোপ। আগে এখানে বলি হত, এখন অবশ্য আর হয় না।

মাইল তিন পথ হেঁটে এসেছি পাকবিড়রায় আসতে। কাঁকর ঢালা পথ, ভাঙ্গা-চোরা। সব খানে পথ নেই। তাই হেঁটে এসেছি ধান ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে, সরু আলের ওপর দিয়ে, পুরুলিয়া পুঞ্চা বাস রুটের ধারে বাস হতে নেমে। বড় বাজার হতে এর দূরত্ব মাত্র কুড়ি মাইল। এ কলকাতার বড়বাজার নয়, পুরুলিয়ার বড়ভূম পরগণার বড়বাজার, কানিংহাম যাকে হিউ-এন্-সাঙ উক্ত সাফা প্রদেশের রাজধানী বলে অভিহিত করেছেন। হয়তো তাই। কারণ আজ সাফা বা পুরুলিয়ার তেমন ভৌগলিক গুরুত্ব না থাকলেও এককালে যে ছিল তা বলা যায়। কারণ বিহার হতে উড়িষ্যার

যেতে হলে পুরুলিয়া হয়েই যেতে হত। কে জানে কলিঙ্গ-রাজ খারবেলের বিজয় বাহিনী মগধ হতে ফিরিয়ে আনা কলিঙ্গ জিনকে নিয়ে এই পথে উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তন করে'ছিল কিনা! কে জানে আজ যেখানে আমি বসে আছি, সেখানে রাত্রি যাপনের জন্ম খারবেলের স্কন্ধাবার পড়েছিল কিনা! হয়ত সেই স্কন্ধাবারে বিনিদ্র রজনীতে খারবেলের মনে এখানে জিন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা উদিত হয়েছিল। হয়ত তারি পরিণাম রূপে এখানে জিন মন্দির ও মঠ স্থাপিত হয়েছিল।

পাক্‌বিড়রার প্রাচীন ইতিহাস আমাদের জানা নেই। জানবার উপায়ও নেই। জানবার উপায় নেই কাশিক-পঞ্চ-স্তূপনিকায়িক নির্গ্রন্থ-শ্রমণাচার্য গুহনন্দি কখনো এখানে এসেছিলেন কিনা? তবে একথা অবিসংবাদিত সত্য যে পাকবিড়রা খৃষ্টীয় ৯-১০ শতক অবধি জৈনদের এক বিরাট পিঠস্থান রূপে সর্বত্র খ্যাত ছিল। সে কথা বেগলার-এর বিবরণ পড়লেই বোঝা যায়। তাছাড়া চোখেও দেখছি ইঁটপাথরের একাধিক ভাঙা মন্দিরের ভিঁত, একটি প্রকোষ্ঠে সংগ্রহ করা প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পকীর্তি; তীর্থংকর সম্বলিত চৈত্য, চৌমুখ মূর্ত্তি, বর্দ্ধমান মহাবীর, তীর্থংকরের পিতামাতা, সর্বোপরি ৭॥ ফুট দীর্ঘ পদ্মপ্রভের কায়োৎসর্গ মূর্তি। অনেক কিছু বিনষ্ট হয়ে গেছে। যে সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে বসে আছি সেই সিঁড়ি জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দিয়ে তৈরী হয়েছে। আসে পাশেও দেখছি ছড়িয়ে আছে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কালের অমোঘ পরিণাম হতে এদের কী সংগৃহীত করে রক্ষা করা যায় না? বাঙ্‌লাদেশের জৈন সমাজেরও কী এ বিষয়ে কোনো কর্তব্য নেই?

আর একবার পদ্মপ্রভের মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল এক ছবি। খৃষ্টীয় ৯ম শতক। শিল্পী একমনে বসে খুট খুট করে কাজ করছেন আর চেয়ে চেয়ে দেখছেন প্রতিমার মুখের দিকে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত এক অদৃশ্য আনন্দে কাঁপছে তাঁর দেহমন যেমন বাতাসের মুখে ঝরঝর করে কাঁপে বটগাছের পাতাগুলো। তারপর এক সময় মূর্ত্তি শেষ হল। শিল্পী ছেনি ও হাতুড়ি ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর? তারপর একবার পদ্মপ্রভের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর কোথায় চলে গেলেন কেউ জানে না।

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[বৈশাখ ১৩৮২ সংখ্যা হতে]

গুণসেন যতই এই সব জালজঞ্জাল হতে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিল ততই সে আরো তাতে জড়িয়ে পড়ছিল। ওদিকে নৈমিত্তিকেরা বলতে আরম্ভ করল, মহারাজ, এই মুহূর্তই শুভ মুহূর্ত। এই মুহূর্তে যদি যুদ্ধ যাত্রা করা যায় তবে জয় অবশ্যম্ভাবী।

এর মধ্যে অন্তঃপুর হতে এক পরিচারিকা এসে তার কানে কানে কি যেন বলল। গুণসেন প্রত্যুত্তরে শুধু এইটুকুই বলল, চল, আমি এখুনি আসছি।

হয়ত নগরে যে আতঙ্ক পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তার হাওয়া অন্তঃপুরেও এসে লেগে থাকবে। এবং এই ধরণের যুদ্ধে যাদের সব চাইতে বেশী ভয় পাবার থাকে তারা হল অন্তঃপুরিকারা। কারণ বিজেতা শত্রুর হাতে তাদের লাঞ্ছনাই সব চাইতে বেশী হয়ে থাকে।

জ্যোতিষিরা বলছিল, মহারাজ, আর এক পলও বিলম্ব করা উচিত নয়। মুহূর্ত প্রায় অতীত হয়ে এসেছে। যাত্রা না করলেও অন্তঃপুরে যাবার আগে অন্ততঃ রণদুন্দুভী বাজাবার আদেশ দিয়ে যান—তা হলেও হবে।

গুণসেনের এতে কোনো আপত্তি ছিল না। তাই সে রণদুন্দুভী বাজাবার আদেশ দিয়ে অন্তঃপুরে গেল।

অন্তঃপুরে তার একটু সময় লাগল। কারণ প্রথমতঃ, মহারাণী অসুস্থ ছিলেন, তারপর আসন্ন-প্রসবা। তাই তাঁকে সান্ত্বনা দিতে একটু সময় লাগল।

দ্বিতীয়তঃ, সৈন্য ও সেনাপতির প্রস্তুত হয়ে নেওয়া ও নৈমিত্তিকদের তাড়াহুড়োর জন্য সেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে গেল। ঠিক সেই সময় অগ্নিশর্মার কথা তার আবার মনে পড়ল।

গুণসেনের পাশেই তার দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল। সে তাকে ডেকে বলল,

বাইরে গিয়ে দেখে এসো ত, দরজায় যদি কোনো তপস্বী দাঁড়িয়ে থাকেন তবে তাঁকে সমাদরে এখানে নিয়ে এসো।

দেহরক্ষী তপস্বীকে চিনত না। রাজদ্বারেত ওমন শত শত হাজার হাজার তপস্বী, ভিক্ষু ও প্রার্থী এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মধ্যে অগ্নিশর্মাকে সে কী করে চিনে নেবে?

কিন্তু সে কিছু প্রশ্ন করবার আগেই গুণসেন তার মনের কথা বুঝে নিল। তাই পর মুহূর্তেই সে আবার বলে উঠল, এক এক মাস উপবাস করা, শীর্ণকায়, বিরূপ আকৃতি কোনো আশ্রমবাসী যদি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন তবে তাঁকে সমাদরে এখানে নিয়ে এসো।

দেহরক্ষী এবারে যেন কিছুটা বুঝতে পারল। তাই সে দৌড়ে বাইরে গেল। প্রধান তোরণে সে রকম কাউকে সে দেখতে পেল না। তখন জিজ্ঞাসাবাদ করায় জানতে পারল যে সেই ধরণের তপস্বী ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করে একটু আগেই এখান হতে চলে গেছেন।

দেহরক্ষী সেই কথাই গুণসেনকে এসে নিবেদন করল।

চলে গেছেন?—গুণসেনের মাথার ভেতর যেন কেমন করে উঠল। মনে হল তার পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছে। সে আর কিছুই বলতে পারল না। দেহরক্ষীর শেষ দুটী কথারই পুনরাবৃত্তি করল। কিন্তু সেই দুটী কথায় তার অন্তর বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠল।

অগ্নিশর্মার কথা মনে রাখা ও এতো সাবধানতা সত্বেও দ্বিতীয় মাসের উপবাসের পর তাকে আবার অনাহারে ফিরে যেতে হল! গুণসেন তাই আর এক মূহূর্ত সেখানে অপেক্ষা না করে এবং প্রায় এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো ও একজন পরিচারককে ডেকে যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত তার অশ্বকে সেখানে নিয়ে আসতে বলল। তারপর কাউকে কিছু না বলে সেই অশ্বে আরোহণ করে যে পথ আশ্রমপদের দিকে গেছে সেই দিকে তার অশ্বকে ছুটিয়ে দিল।

অগ্নিশর্মা তখনো নগরের সীমা অতিক্রম করেনি যখন গুণসেন তার কাছে গিয়ে পৌঁছুল। সেখানে পৌঁছেই সে অশ্ব হতে নেমে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও বলল, দীর্ঘ তপস্বী, আমায় ক্ষমা করুন। আজ সকাল হতে

আপনার আসবারই প্রতীক্ষা করছিলাম কিন্তু সহসা যুদ্ধের সংবাদ আমার আমাকে একটু অসতর্ক করে দিয়েছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি সেখানে গিয়ে ফিরে এসেছেন। আপনি নগরের সীমা অতিক্রম করেন নি। আমার বিনম্র অনুরোধ আপনি আবার ফিরে চলুন।

বসন্তপুরের মানুষ এমন দৃশ্য কবে দেখেছে! একদিকে বৈভব ও ঐশ্বর্যের প্রতীক গুণসেন করজোড় ও মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অন্য দিকে অস্থিসার শীর্ণদেহ এক তপস্বী। ভোগ ও দীনতা যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দীনতার প্রতীক তপস্বীর কাছে বৈভব ও ঐশ্বর্যের প্রতীক গুণসেন কি যেন প্রার্থনা করছে।

গুণসেনের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে অগ্নিশর্মা ক্ষীণ কণ্ঠে মাত্র এইটুকুই বলল, আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করতে পারি না।

গুণসেনও যে সে কথা না জানত তা নয়, তবু যদি কোনো উপায়, কোনো পথ বার করা যায় যাতে অগ্নিশর্মা আহার গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু গুণসেনের বারবার আগ্রহেও কোনো ফল হল না। কারণ তপস্যাই যার জীবন, তপস্যাই যাকে খ্যাতি দিয়েছে, সেই তপস্যামূলক প্রতিজ্ঞার গৌরব সে কখনো পরিত্যাগ করতে পারে না।

অগ্নিশর্মার এই দৃঢ়তা ও তপস্যার প্রতি অনন্ত শ্রদ্ধায় গুণসেনের হৃদয় দ্রবিত হয়ে গেল। নিজের অসাবধানতায় জন্য পশ্চাত্তাপ করবার সময় অবশ্য তার ছিল না তবে সে রাজপথে না দাঁড়িয়ে যদি এই সময় রাজ প্রাসাদে থাকত তবে হয়ত চোখের জলে তার পা দুটো ভিজিয়ে দিত।

অগ্নিশর্মা আর ফিরে যাবে না সে সম্বন্ধে যখন আর কোনো সন্দেহই রইল না তখন সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আবার বলল, আমার দুর্ভাগ্য দু' দু'বার আমার প্রাসাদে আপনার পায়ের ধুলা পড়া সত্ত্বেও আপনাকে আমি আহার ভিক্ষা দিতে পারিনি। তাই আবার আপনাকে অনুরোধ করবার আমার সাহস হয় না। তবে এই মাসের উপবাসের শেষে যদি আপনি আমার প্রাসাদে আসেন তবেই আমার দুর্ভাগ্যের অন্ত হয়েছে সে কথা আমি মনে করব।

অগ্নিশর্মা সরল ভাবেই সেই প্রার্থনা স্বীকার করে নিল।

॥ ৮ ॥

তৃতীয় মাস অগ্নিশর্মার পক্ষে অগ্নি পরীক্ষার চাইতেও আরো বেশী কষ্টকর ছিল। ভেতরের হাড় পর্যন্ত শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছিল। আশ্রমবাসীরা ত তার জীবনের আশা পর্যন্ত পরিত্যাগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু না জানি কোন অদৃশ্য প্রভাব সেই ঝঞ্ঝাবাতেও তার জীবন দীপ নিবু নিবু করেও নিভল না।

আশ্রমবাসীদের ইচ্ছা গুণসেনের আগ্রহকে উপেক্ষা করে অগ্নিশর্মা তৃতীয় মাসের উপবাস অন্তে অন্য কোনো খান হতে তার আহার্য সংগ্রহ করুক। কিন্তু উগ্র তপস্বীর নিশ্চয়ও ত আবার তেমনি উগ্র হয়ে থাকে। তাই এর পরেও গুণসেনের ওখান হতে আহার গ্রহণ করবার সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করতে পারল না। তাছাড়া গুণসেনকে সে কথা দিয়েছে—সেকথা তাকে রাখতেই হবে এও তার দৃঢ় নিশ্চয় ছিল।

গুণসেনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা যে অকৃত্রিম সে বিষয়ে অগ্নিশর্মার নিজের মনেও কোন সন্দেহ ছিল না। যুদ্ধে যাবার আগে ঘোড়ায় চড়ে সে যখন তার সঙ্গে দেখা করতে এল তখন তার প্রার্থনায় আত্মগ্লানি যে ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠে-ছিল—তা সে নিজের চোখেই দেখেছে। তাই প্রথমের গুণসেন যতই কৌতুক প্রিয় হোক, যতই তাকে দুঃখ দিয়ে থাকুক, এখন সে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। শাসক গুণসেন এক স্বতন্ত্র মানুষ।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে ক্রমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. III. No. 3 : Sraman : July 1975

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৮২ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

মণ্ডপের ছাদ. বিমলবসই মন্দির

দিল্‌ওয়াড়া

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

গোশালক হালাহলার ভাণ্ডশালায় ফিরে গেলেন কিন্তু তাঁর সম্পর্কে বর্দ্ধমানের কথাই সত্যি হল। গোশালক দাহজ্বরে আক্রান্ত হয়ে সাত দিনের দিন হালাহলার ভাণ্ডশালায় শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

গোশালক প্রযুক্ত তেজোলেশ্যা বর্দ্ধমানের তাৎকালিক কোনো ক্ষতি না করলেও পরে তার প্রভাবে তাঁর দেহ পিত্তজ্বরে আক্রান্ত হল।

বর্দ্ধমান তখন মেঁঢ়িয় গ্রামে অবস্থান করছিলেন এবং সেই ঘটনারও ছ' মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তবু তাঁকে দুর্বল ও ক্ষীণ হতে দেখে গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করতে লাগল: বর্দ্ধমান দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁর সম্পর্কে গোশালকের ভবিষ্যদ্বাণী যেন না সত্যি হয়ে যায়।

সালকোষ্ঠক চৈত্যের কাছে মালুকাকচ্ছে ধ্যান করতে করতে বর্দ্ধমান শিষ্য সিংহ সেই কথা শুনল। সেই কথা তার কানে যেতে তার ধ্যানভঙ্গ হল। সে ভাবতে লাগল, তবে কি সত্যি ভগবান বর্দ্ধমান সম্বন্ধে গোশালকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবে? তাহলে লোকে কি বলবে?

তখন সিংহ সেখানে আর থাকতে পারলনা। সেখান হতে বেরিয়ে বর্দ্ধমানের কাছে যাবার জন্য কচ্ছের মধ্যভাগ দিয়ে মেঁঢ়িয় গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বেশীদূর সে যেতে পারল না। আবেগ ও দুশ্চিন্তায় তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

মেঁঢ়িয় গ্রামে বসে বর্দ্ধমান সিংহের মনোভাব জানতে পারলেন। তিনি তখন শ্রমণদের সম্বোধন করে বললেন, আয়ুষ্মন, শ্রমণ সিংহ আমার ব্যাধির

জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মালুকাকচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তোমরা যাও ও তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

শ্রমণেরা তখন সিংহের কাছে গেল। বলল, সিংহ তোমায় দেবার্য ডাকছেন।

সিংহ তখন শ্রমণদের সঙ্গে সালকোষ্ঠক চৈত্যে বর্দ্ধমান যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে এল ও তাঁকে প্রদক্ষিণা ও বন্দনা করে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

বর্দ্ধমান তখন সস্নেহ স্মিত হাসি হেসে বললেন, সিংহ, তুমি আমার ভাবী অনিষ্ট চিন্তা করে কেঁদে ফেলেছিলে?

সিংহ বলল, হাঁ ভগবন্। আজ যখন ছ'মাস পূর্ণ হতে চলেছে তখন গোশালকের কথা মনে করে আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম।

বর্দ্ধমান বললেন, সিংহ, এ বিষয়ে তোমার কোনো চিন্তা করা উচিত নয়। এখনো আমি সাড়ে পনেরো বছর এই সংসারে সুখে বিচরণ করব।

আপনার কথা যেন সত্যি হয়!—আবেগে সিংহ বলে উঠল। তবে আপনাকে রোগগ্রস্ত দেখলে আমাদের কষ্ট হয়। আপনার এই ব্যাধি দূর করবার কি কোনো উপায় নেই?

বর্দ্ধমান বললেন, কেন থাকবে না। বৎস, তোমার যদি তাই ইচ্ছা তবে মেঁঢিয়গ্রামে গাথাপত্নী রেবতীর কাছে যাও। সে কুমড়ো ও বাতাবি নেবু দিয়ে দুটো ওষুধ তৈরী করেছে তার প্রথমটি আমার জন্য, দ্বিতীয়টি অন্য প্রয়োজনে। প্রথমটির আমার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়টি আমার রোগ নিবৃত্তির জন্য যথেষ্ট। তুমি তা নিয়ে এস।

সিংহ বর্দ্ধমানের আজ্ঞা পেয়ে সানন্দে গাথাপত্নী রেবতীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। শ্রমণকে তার ঘরে আসতে দেখে রেবতী এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করে তাকে ভেতরে নিয়ে এল। বলল, ভগবন্, কি প্রয়োজনে আজ আপনি আমার এখানে এসেছেন? আদেশ করুন।

সিংহ বলল, সুশ্রাবিকে, তুমি যে দুটো ওষুধ তৈরী করেছ তার যেটি ভগবানের জন্য সেটি নয়, অন্যটি যা তুমি অন্য প্রয়োজনে করেছ তা আমি নিতে এসেছি।

রেবতী আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, মুনি, আপনি সেকথা কি করে জানতে

পারলেন যে আমার এখানে অমুক অমুক ওষুধ আছে এবং তা অমুক অমুক প্রয়োজনে তৈরী হয়েছে ?

সিংহ বলল, শ্রাবিকে, আমার ধর্মাচার্য বর্দ্ধমান আমায় সে কথা বলে দিলেন।

সে কথা শুনে রেবতীর খুব আনন্দ হল। সে ঘরের ভেতর গিয়ে বাতাবী নেবুর তৈরী ওষুধ এনে শ্রমণের পাত্রে ঢেলে দিল।

সিংহ সেই ওষুধ নিয়ে এসে বর্দ্ধমানের হাতে তুলে দিল। সেই ওষুধ খেয়ে বর্দ্ধমান ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হলেন।

বর্দ্ধমানের রোগ সে কি রেবতীকে সম্মান দেবার জন্ত ? রেবতী এই দানের জন্য জৈন সাহিত্যে অমর হয়ে রইল।

ব্রাহ্মণকুণ্ডপুরের বহুশাল চৈত্যে যখন বর্দ্ধমান অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর শিষ্য ও জামাতা জমালি তাঁর পাঁচশ' জন শিষ্য নিয়ে পৃথক হয়ে বিচরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেভাবে বিচরণ করতে করতে তিনি একবার শ্রাবস্তী এলেন ও সেখানে তিন্দুকোন্থানে অবস্থান করলেন।

তিন্দুকোন্থানে তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন।

জমালি তখন ডাক দিয়ে তাঁর এক শিষ্যকে তাঁর জন্ত শয্যা প্রস্তুত করতে বললেন।

খানিকবাদে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, শয্যা কি প্রস্তুত হয়ে গেছে ?

শিষ্য প্রত্যুত্তর দিল, হাঁ ভগবন্।

জমালি উঠে এসে দেখেন শয্যা তখনো পূর্ণ রূপে বিছোনো হয় নি।

জমালির দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, ওঁর সিদ্ধান্ত 'করেমাণে কডে'র। কিন্তু দেখছি সে সিদ্ধান্তের কোনো অর্থ নেই।

ওঁর অর্থাৎ বর্দ্ধমানের।

'করেমাণে কডে'র অর্থ হল যে কাজ করা আরম্ভ হয়ে যায় তা কৃত বলেই ধরে নিতে হবে।

জমালি এর বিরোধ করে বললেন—ক্রিয়া যখন সম্পন্ন হয়ে যায় তখনি কৃত বলা উচিত, তার আগে নয়।

জমালির পাঁচশ'জন শিষ্যের কেউ তা স্বীকার করল, কেউ করল না।

তারা বলল নিশ্চয় নয়ে ক্রিয়াকাল ও নিষ্ঠাকাল অভিন্ন। এর তাৎপর্য ক্রিয়া কালে যদি কার্য না হয় তবে নিবৃত্তির পরে কি করে কার্য হবে? তাই বর্দ্ধমানের উক্তি তর্ক সঙ্গত।

যারা বিরোধ করল তারা জমালির সঙ্গ পরিত্যাগ করে বর্দ্ধমানের কাছে ফিরে গেল।

জমালি সুস্থ হয়ে শ্রাবস্তী পরিত্যাগ করলেন কিন্তু তাঁর নূতন মতবাদ পরিত্যাগ করলেন না। সেই মতবাদ নানাস্থানে প্রচার করতে করতে বর্দ্ধমান চম্পায় যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। জমালি বর্দ্ধমানের সামনে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে বললেন, দেবানুপ্রিয়, আপনার অনেক শিষ্য যেমন ছদ্মস্থ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে. আপনি কিন্তু আমায় তা ভাববেন না। আমি কেবলী হয়ে বিহার করছি।

জমালির মুখে আত্মশ্লাঘাকর সেই উক্তি শুনে বর্দ্ধমানের প্রথম ও প্রধান শিষ্য গৌতম জমালিকে সম্বোধন করে বললেন, জমালি, কেবল জ্ঞান ও দর্শনকে তুমি কি ভেবে রেখেছ? সে সেই জ্যোতি যা লোক ও অলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়, সমুদ্র নদী পর্বত কিছুতেই যা ব্যাহত হয় না। মহানুভব, যার মধ্যে সেই দিব্য জ্যোতির প্রাদুর্ভাব হয় সেই আত্মা কখনো গোপন থাকে না। কিন্তু এ নিয়ে অধিক কথা বলে কি লাভ? আমি তোমায় দুটি প্রশ্ন করছি তুমি তার প্রত্যুত্তর দাও। লোক শাশ্বত না অশাশ্বত? জীব শাশ্বত না অশাশ্বত?

জমালি এর প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বর্দ্ধমান তখন তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, জমালি, আমার এমন অনেক শিষ্য রয়েছে যারা ছদ্মস্থ হয়েও এর উত্তর দিতে পারে কিন্তু তারা কেবলী হবার দাবী করে না। দেবানুপ্রিয়, কেবল জ্ঞান এমন কোনো বস্তু নয় যার অস্তিত্ব বোঝাবার জন্য কেবলীকে নিজের মুখে সে কথা বলতে হয়।

জমালি, লোক শাশ্বত কারণ তা অনন্তকাল পূর্বেও ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল থাকবে।

অন্য অপেক্ষায় লোক অশাশ্বত। কাল রূপে উৎসর্পিণী চলে যায়, অবসর্পিণী আসে, অবসর্পিণী চলে যায় উৎসর্পিণী আসে। এভাবে অন্য

যে লোকাত্মক দ্রব্য রয়েছে তাতে অথবা তার অবয়বে পর্যায়ের পরিবর্তন হতে থাকে, তাই লোক অশাশ্বত।

এভাবে জীব শাশ্বত আবার অশাশ্বতও। শাশ্বত কারণ তা ত্রিকালবর্তী, অশাশ্বত কারণ পর্যায়রূপে তা নিত্য পরিবর্তনশীল। অনেক পর্যায়ের উৎপাদ ও ব্যয়ের অপেক্ষায় জীব অশাশ্বত।

এভাবে বর্দ্ধমান জমালিকে অনেক বোঝালেন কিন্তু জমালি নিজের আগ্রহ পরিত্যাগ করলেন না। শেষে তিনি বর্দ্ধমানের সংঘ হতে নিজেকে পৃথক করে নিলেন।

জমালি যখন কতিপয় সাধুসহ নিজেকে সংঘ হতে পৃথক করে নিলেন তখন বর্দ্ধমান কন্যা প্রিয়দর্শনাও কতিপয় সাধ্বীসহ স্বামীর অনুগমন করলেন। তারপর বিভিন্ন স্থানে প্রব্রজন করতে করতে একসময় শ্রাবস্তীতে এসে ঢংক কুমোরের ভাণ্ডশালায় অবস্থান করলেন।

ঢংক বর্দ্ধমানের অনুযায়ী শ্রাবক ছিল। জমালির মতবাদের সঙ্গেও সে পূর্ব হতে পরিচিত ছিল। প্রিয়দর্শনা যে জমালির মতানুবর্তিনী সেকথাও সে জানত। জমালির অনুবর্তীদের ভ্রম কিভাবে ভাঙিয়ে তাদের আবার মূল সংঘের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সে ইচ্ছাও তার প্রবল ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই সে একদিন প্রিয়দর্শনার সংঘাটির (চাদর) ওপর এক কণা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ফেলে দিল।

তাই দেখে প্রিয়দর্শনা বলে উঠলেন, আর্য, এ তুমি কি করলে, আমার সংঘাটিকে জ্বালিয়ে দিলে।

ঢংক উত্তর দিল, সংঘাটিত এখনো জ্বলে নি, জ্বলছে।

ঢংকের এই প্রত্যুত্তরে প্রিয়দর্শনা বুঝতে পারলেন বর্দ্ধমানের 'করেমাণে কড়ে'র সার্থকতা তিনি তাঁর অনুবর্তী সাধ্বী সংঘ সহ বর্দ্ধমানের মূল সংঘে আবার ফিরে এলেন।

জমালির অনুবর্তী শ্রমণেরাও একে একে বর্দ্ধমানের মূল সংঘে যোগ দিল কিন্তু জমালি তাঁর নূতন মতবাদ পরিত্যাগ করলেন না। যেখানে যেতেন সেখানে সেই মতবাদ প্রচার করতেন।

জমালিকৃত সংঘ ভেদই জৈন সংঘের প্রথম নিহ্নব।

ওদিকে বর্দ্ধমান বেঁটিগ্রাম হতে মিথিলায় গেলেন। সেবারের চাতুর্মাস্য সেখানেই ব্যতীত করলেন। তারপর চাতুর্মাস্য শেষ হলে মিথিলা হতে কোশলের দিকে প্রস্থান করলেন।

বর্দ্ধমান যখন কোশলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ইন্দ্রভূতি গৌতম নিজের শিষ্যসহ আরো একটু এগিয়ে শ্রাবস্তীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে কোষ্ঠক চৈত্যে অবস্থান করতে লাগলেন।

সেই সময় পার্শ্বাপত্য কেশীকুমারও নিজের শিষ্যসহ শ্রাবস্তীর তিন্দুকোভানে অবস্থান করছিলেন।

কেশীকুমার ও গৌতমের শিষ্যরা দুই সম্প্রদায়ের আচারের ভিন্নতা দেখে ভাবতে লাগলেন: এই ধর্মই বা কি রকম? ওই ধর্মই বা কি রকম? মহামুনি পার্শ্বনাথের ধর্ম চতুর্যাম, মহাতপস্বী বর্দ্ধমানের ধর্ম পঞ্চযামিক। এক ধর্ম সচেলক, অন্য ধর্ম অচেলক। মোক্ষের সাধনায় প্রবৃত্ত ধর্মের মধ্যে আচারে এই পার্থক্য কেন?

শিষ্যদের মধ্যের এই আলোচনা গৌতম ও কেশীকুমার উভয়েই শুনলেন। এর সমাধানের জন্য উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ইচ্ছুক হলেন।

ব্যবহারজ্ঞাতা গৌতম-কুমার শ্রমণ কেশী প্রাচীন কুলের বলে শিষ্যসহ একদিন নিজেই তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

[ক্রমশঃ

দিল্‌ওয়াড়া

শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

মিছে তাজ দেখে মূর্ছা যাচ্ছো
দেখে এসো দিল্‌ওয়াড়া
তাজমহলেরও বাড়া।
আয়তনে কিছু ছোটো অবশ্য
কথা বাহুল্য এটুকু ভাষ্য
তক্ষণ এর অবিশ্বাস্য
অতুলন দিল্‌ওয়াড়া।

ক' হাজার ফিট্ পাহাড়ের 'পরে
পাঁচ মন্দির পাড়া
দেখে এসো দিল্‌ওয়াড়া।
দেখা মাত্রই বেড়ে যাবে দিল্
পুরাতন ইতিহাসের দলিল
একে যেনো দেবলোকের সামিল
সেথা ঘুরো পেলে ছাড়া।

প্রতিটি পাথরে তক্ষণ দেখে
অন্তরে পাবে নাড়া—
দেখে এসো দিল্‌ওয়াড়া।
প্রতি পাথরের তক্ষণ-প্রমা
মনে বিস্ময় করবেই জমা
যেদিকেই চা'বে সেদিকেই পাবে
আশ্চর্যের সাড়া।

বিমল শাহত রাজা না, মন্ত্রী—
তবুও রাজার বাড়া
গড়লেন দিল্‌ওয়াড়া।
আজো তাঁর এই অমর কীর্তি
দৃঢ় করে জিন-ধর্ম-ভিত্তি
হাজার বছর গৌরব নিয়ে
আছে মন্দির খাড়া।

যতই ঘুরবে, ফিরবে, দেখবে—
দু'চোখ পলক হারা!
মর্মর ভারা-ভারা—
অতোকাল আগে কোথা থেকে এনে
কী উপায়ে তারা তুলেছে এখেনে
কোন্ পথে আর কী যান-বাহনে?
বিস্ময়ে হবে সারা!

বিমল বসহি তাজমহলেরও
ছ' শো সাল আগে গড়া।
চলে না তুলনা করা।
আয়তনে নয়, যা উৎকর্ষে
অতুল আজো এ ভারতবর্ষে
লুনা বসহিও আট শো বছর
আগে হ'য়েছিলো গড়া।

আদিনাথ নেমিনাথ প্রভৃতিরা
যত তীর্থংকর
চিত্রিত মর্মর।

প্রতি মর্মর-কুলুঙ্গী-কোণে
তীর্থঙ্কর চব্বিশ জনে
হাজির তাই তো কেবল জ্ঞানের
ভর-এ হাওয়া মন্থর।

মূর্তিরা সব কুলুঙ্গী থেকে
মেলে মণিময় চোখ
বলে—ফ্যালো নির্মোক।
এই চরাচরে নাই হে বিধাতা,
কর্ম নিজেই নিজ ফলদাতা—
মিথ্যা মোহের যত আবরণ
সব অপসৃত হোক।

মনে হবে যত রাগ-রাগিনীর
লীলায়িত বিস্তার—
পাথর হয়েছে আর
ঘুরে ঘুরে যত দ্যাখো প্রদর্শ
মোহে বিস্ময়ে জাগবে হর্ষ
ভাববে, সে-যুগে এত প্রকর্ষ!
কা'রা তক্ষণকার?

কবে থেকে যেন কী মন্ত্র-মোহে
সমাহিত সুষমার
আরাবলী বহে ভার।
দিব্য শিল্প বন্ধ যা আছে
ডানা পেল যেন উড়ে গিয়ে বাঁচে
স্বর্গীয় কোনো আলোর ছোঁয়াচে
প্রাণ হ'লে সবার।

লৌকিক দেবতা ইন্দ্রনাথ

শ্রীশিবেন্দু মান্না

রাজপ্রতিভূ বা সরকারী বিধি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমারেখা সাংস্কৃতিক জগতে অচল হলেও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে স্টেটস্‌ রিঅর্গানাইজেশন বিধির ফলে বিহার প্রদেশের পূর্বতন মানভূম জেলার ২৪০৭ বর্গ মাইল স্থান পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত হবার ফলে, মূলতঃ লাভ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক জগতের। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ সীমান্ত-বঙ্গের বিশেষত্ব সম্পর্কে এখনও অনবহিত বলা চলে।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ অর্থাৎ পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল প্রাচীনকালে লাঢ় বা রাঢ়ভূমি নামে পরিচিত ছিল। বঙ্গদেশে আর্য সভ্যতার উন্মেষ কালেই এই অঞ্চলে জৈন তীর্থংকর মহাবীর এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যার লিখিত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে জৈন ধর্ম গ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র গ্রন্থে। আচারাঙ্গ লিখিত হয় খৃষ্ট পূর্ব ৪র্থ থেকে ২য় শতকের মধ্যে। এর দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে এতদঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রচলন খৃষ্ট পূর্বাব্দ কাল থেকেই। সুতরাং এটা স্বতঃ-সিদ্ধ ব্যাপার যে সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণে জৈন ধর্মের প্রভাব পড়বেই। শুধু তাই নয়, তখনকার দিনে ধর্মাচরণের কেন্দ্র ছিল মঠ-মন্দির। (আমার মনে হয়, মঠ-মন্দিরগুলি আর্য শাসিত ভারতে ধর্মানুশাসনের সাথে সাথে সামাজিক অনুশাসন ও সামাজিক সম্মিলনেরও কেন্দ্র ছিল।) পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে বা প্রাচীনকালের রাঢ় ভূমিতে খৃষ্ট-পূর্বাব্দ কালের জৈন ধর্ম কেন্দ্রের কোন 'পাথুরে' নিদর্শন পাওয়া গেছে কিনা জানি না, কিন্তু প্রাক্‌-মুসলিম যুগে নির্মিত অনেকগুলি জৈন দেব দেউলের অস্তিত্ব সমগ্র পুরুলিয়া জেলায় বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ কংসাবতীর উপকূল অঞ্চলে পাওয়া গেছে এবং এই সব মঠ-মন্দিরের গঠন সৌকর্য বঙ্গীয় স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পে এক বিশেষ অবদান বলেই বিবেচিত হবার যোগ্য।

বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু হয় পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থান এবং সেন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের ফলে। শেষ পর্যন্ত জৈন ধর্ম পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে একটি বহিরাগত শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সাধারণ ভাবে এরা শরাক জাতি নামে পরিচিত হয়। প্রাক্-মুসলিম যুগে পুরুলিয়া বাঁকুড়া অঞ্চলে কংসাবতীর কূলে-কূলে নির্মিত অনেকগুলি জৈন-মন্দির এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই নির্মাণ করেছিলেন বলে অনুমিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের অনেকানেক দেবতা সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপের ফলে, নিম্ন ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের লৌকিক দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে আত্মগোপন বা আত্ম রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল, তেমনি ভাবে জৈন ধর্মের উপাস্য দেব-দেবী এবং তীর্থংকরকে উচ্চ অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে কতটা পরিমাণে এবং কি ভাবে আত্মগোপন করে আপনাপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলেন বা আদৌ পেরেছেন কিনা; সে বিষয়টি গবেষণা সাপেক্ষ বলে অনুমান করি। আমার আলোচ্য লোক দেবতাটির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জনৈক জৈন তীর্থংকর লোক-দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে গেছেন।

শৈলশ্রেণী পরিবেষ্টিত পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডী থানার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমার কাছাকাছি দেউলী-হারুপডি গ্রাম দুটির (জে. এল নং যথাক্রমে ১৯ ও ১৩) প্রায় সংযোগ স্থলে [দেউলীর প্রান্ত সীমায়] যে জৈন মন্দিরগুলি আজো কালের করাল ভ্রূকুটী এড়িয়ে এবং ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তারই কেন্দ্রীয় মন্দিরটির অভ্যন্তরে লোকদেবতা ইন্দ্রনাথ রূপে আত্মগোপন করে আছে জনৈক জৈন তীর্থংকর।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-নামের ক্ষেত্রে দেউল শব্দযুক্ত গ্রামগুলিতে সাধারণ ভাবে দেব-দেউলের অস্তিত্বের নজীর পাওয়া গেছে; সুতরাং গ্রাম-নামের সার্থকতা এখানে আছেই। তাছাড়া পাঁচ পাঁচটি মন্দিরের একত্র সমাবেশ সবিশেষ লক্ষণীয়, কারণ জৈন ধর্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল দেউলী, পাঁচটি মন্দিরের একত্র সমাবেশ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। মন্দিরগুলি এতদ্ অঞ্চলে সহজলভ্য ল্যাটেরাইট জাতীয় পাথরে নির্মিত হলেও দুটি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে, অপর তিনটি ধ্বংসোন্মুখ। দণ্ডায়মান মন্দির তিনটির মধ্যে একটি

পুর্বমুখী, একটি পশ্চিমমুখী, এবং অপরটি উত্তরমুখী মন্দির। উত্তরমুখী মন্দিরটিই কেন্দ্রীয় মন্দির। এই মন্দিরের শীর্ষ ভাগের একাংশ ধ্বসে পড়ে প্রবেশটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে ; কিন্তু কোন পতিকে গর্ভ গৃহে প্রবেশ করতে পারলে দেখা যাবে প্রায় তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি দণ্ডায়মান দিগম্বর মূর্তি রয়েছে, যা দেখলে জৈন তীর্থংকরের মূর্তি বলেই বিশ্বাস হয়। অপূর্ব প্রশান্তি ও পেলবতা মূর্তিটিকে বেষ্টন করে আছে। কালো রঙের পাথরে তৈরী, তবে কষ্টি পাথর নয় বলেই ধারণা হোল।

১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে বেগলার সাহেব দেউলীতে এসে পুরাবস্তু সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর প্রতিবেদন দৃষ্টান্তে বোঝা যাচ্ছে উত্তর মুখী মন্দিরটিই মূল মন্দির, যার চার-পাশে আরো চারটি মন্দির ছিল ; এর মধ্যে এখনও দুটি বর্তমান। তবে বেগলার পাঁচটির মধ্যে তিনটি মন্দিরকে মোটামুটি অক্ষত দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে কাশী প্রসাদ জয়সোয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাটনা কর্তৃক প্রকাশিত *The Antiquarian Remains of Bihar* গ্রন্থের বিবরণ ক্রমে দেখা যাচ্ছে, বেগলার পুর্বোক্ত জৈন তীর্থংকরের মূর্তিটিকেও দেখেছিলেন এবং মূর্তির বেদিকায় (Pedestal) মৃগ বা হরিণের (Antelope) প্রতিচ্ছবি খোদিত থাকতে দেখেছিলেন। এছাড়া মূর্তিটি স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ কর্তৃক অর্ণনাথ নামে আখ্যাত হয়ে পুজিত হতেও দেখেছিলেন। [Its tower had completely collapsed and in the shrine Beglar could see a Jain image 3′ high, with figure of an antelope on its pedestal and worshipped by the local people with the name of Arnanatha.—*The Antiquarian Remains of Bihar*]

সম্প্রতিকালে প্রখ্যাত মন্দির-তত্ত্ববিদ্ ভারত-প্রেমিক ডেভিড ম্যাককাচ্চন দেউলীর মন্দিরাজি বিশেষতঃ পূর্বোক্ত মূর্তিটি দর্শন করে মন্তব্য করেছেন :

The only image of the place in worship in the sanctum of the main temple : it is a gracefully proportioned Jain Tirthankar with a richly carved stela, much superior in work-man-ship to any of the sculpture at Pakbirra ; according to

Beglar, the symbol on the pedestal (now buried) was an antelope thus indicating that the image was probably of Santinatha.—*District Census Handbok,* Purulia, 1961 : Notes on the Temple of Purulia District by David McCutchion.

চব্বিশ জন জৈন তীর্থংকরের নাম আমরা পাচ্ছি। তাঁদের সনাক্ত করার উপায় হোল, প্রত্যেক তীর্থংকরের বিশেষ এক চিহ্ন বা প্রতীক আছে, মূর্তির পাদদেশে বা বেদী গাত্রে প্রতীকের ব্যবহার থেকে আমরা জৈন তীর্থংকরদের সনাক্ত করতে পারি। চব্বিশ জন জৈন তীর্থংকরের প্রতীক চিহ্ন সম্বন্ধে মূল সূত্রটি পাওয়া যাচ্ছে জৈন অভিধানকারিক হেমচন্দ্রের একটি শ্লোকে :

বৃষো গজোশ্ব প্লবগঃ ক্রৌঞ্চোজং স্বস্তিকঃ শশী।
মকরঃ শ্রীবৎসঃ খড়্গী মহিষঃ শূকরস্তথা॥
শ্যেনোবজ্রং মৃগশ্ছাগৌ নন্দাবর্তো ঘটোঽপি চ।
কূর্মো নীলোৎপলং শঙ্খঃ ফণীসিংহোহর্ত্তাংধ্বজাঃ॥

অর্থাৎ পর্যায় ক্রমে প্রতীক-চিহ্নগুলি হচ্ছে—বৃষ, হস্তী, অশ্ব, প্লবগ (বনমানুষ=বানর), ক্রৌঞ্চ, অব্জ (পদ্ম), স্বস্তিক, শশী, মকর, শ্রীবৎস, খড়্গী (গণ্ডার), মহিষ, শূকর, শ্যেন, বজ্র, মৃগ, ছাগ, নন্দাবর্ত, ঘট, কূর্ম, নীলোৎপল, শঙ্খ, ফণী এবং সিংহ। উপরোক্ত সূত্রানুযায়ী স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ষোড়শতম জৈন তীর্থংকর শান্তিনাথ, যার প্রতীক মৃগ, তাঁরই মূর্তি আজও পূজিত হচ্ছে দেউলীর ভগ্ন মন্দিরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের দ্বারা। একশ বছর আগে বেগলার যে মূর্তিটিকে অর্ণনাথ (Arnanath) নামে অভিহিত হতে দেখেছেন ; আজ নামটুকু কোন কারণে পরিবর্তিত হয়ে ইর্ণনাথ হয়েছে। [জেলা সেন্সাস হ্যাণ্ডবুকে Ernanath নামকরণ আছে ; আমি শুনে এসেছি ইর্ণনাথ।]

শুধু নামকরণের পরিবর্তন নয়, লক্ষণীয় হোল দীর্ঘকাল পূর্বেই শান্তিনাথের দিগম্বর প্রতিমূর্তি লোক দেবতায় পরিণত হয়েছে এবং তিনি বিশেষভাবে পূজিত হচ্ছেন বন্ধ্যা নারীদের দ্বারা। সন্তানকামী বন্ধ্যা নারীরা পূজা দেওয়ার ফলে আপনাপন মনস্কামনা পূরণ হয়েছে এমন কিছু প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত থাকার ফলে, স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস বিশেষ প্রকারে উজ্জীবিত হয়ে আছে।

পূজারী হলেন জনক সিং নামা। ইনি নিম্নশ্রেণীর আদিবাসী হিন্দু যাকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তপশীল অন্ত্যজ গোষ্ঠীভুক্ত করেছেন। ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। জৈন তীর্থংকর মূর্তি লোকদেবতা জ্ঞানে বিশেষ প্রকারে আরাধিত হচ্ছেন সর্বশ্রেণীর বন্ধ্যা নারীদের দ্বারা এবং পূজারী হলেন নিম্নশ্রেণীর আদিবাসী হিন্দু। তীর্থংকর মূর্তি কিভাবে লোক দেবতায় রূপান্তরিত হলেন সে ইতিহাস আমার অজানা। অনুমান করতে পারি, যখন সমগ্র বঙ্গদেশে জৈন ধর্ম বিরোধী প্রবাহ প্রবল হয়ে উঠল তখন স্বাভাবিক বনাঞ্চল পরিবেষ্টিত দেউলী জৈন উপাসকবৃন্দ ত্যাগ করে গেলেন এবং স্থানটি ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অগোচরে চলে গেল আপন গুরুত্ব হারিয়ে, এমন কোন এক সময়ে তীর্থংকর মূর্তিটি উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও পরিচর্যার অভাবে কেবলমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের পূজা পেতে পেতে লোক দেবতায় পরিণত হলেন। অনুরূপভাবে লোকদেবতায় রূপান্তরিত হয়েছিল পার্শ্বনাথ ও আদিনাথ মূর্তি বাঁকুড়ার ধরাপাটে। পার্শ্বনাথ হয়েছেন মনসা এবং আদিনাথ হয়েছেন সন্তানপ্রদ দেবতা।

দেউলীতে বন্ধ্যা নারীরা যে পূজা দেয় তার বিধিবিধানটি নিম্নরূপ : জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির পূর্বদিন কামনাকারী নারীটি শুদ্ধাচারে থাকবেন, হবিষ্যান্ন খাবেন। সংক্রান্তির দিন সকালে মন্দির সংলগ্ন হারুণপুকুরে (পুকুরটির অবস্থান হারুণডি গ্রাম প্রান্তসীমায় বলেই সম্ভবতঃ এমন নামকরণ) স্নান করবেন এবং স্নানরত অবস্থায় প্রথমবার ডুব দিয়ে যা পাবেন তাই তুলে এনে পূজারীকে দেখাবেন। পাথর তুললে ব্যাটা (ছেলে), না হলে বেটী (মেয়ে) হবে এমন বিশ্বাস লোকমানসে বর্তমান। স্নানান্তে নারীটি মন্দিরে আসবেন এবং মানত করবেন। পূজারী ঐ নারীর সন্তানলাভের কামনা করে পূজা দেবেন ইশুনাথের উদ্দেশ্যে। মানত পূজান্তে ছাগ বলি হতে পারে।

ছাগবলির ব্যাপারটি সবিশেষ লক্ষণীয়। জৈন তীর্থংকরের লৌকিক দেবতায় রূপান্তরের পর মধ্যযুগীয় লোকদেবতাদের অনুসরণে পশুবলি প্রথা এখানেও প্রচলিত হয়েছে। সমাজ মানসিকতার পরিবর্তনের কারণে প্রথাটি কৌতূহলোদ্দীপক ও লক্ষণীয়।

ইশুনাথের অদূরে হারুণডি গ্রাম প্রান্তসীমায় পূর্বোক্ত হারুণ পুকুরের

দিকে একটি কুসুম গাছের নীচে চতুর্ভূজ গজারূঢ় ছত্রধারী একটি পাথরের মূর্তি রয়েছে যেটি স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা নাকটি ঠাকুরাণ নামে আখ্যাত হয়েছে। লোক বিশ্বাস, নাকটি ঠাকুরাণ ইণ্ডনাথের স্ত্রী। কোন কারণে গোপনে গৃহত্যাগ করার জন্ম ইণ্ডনাথ তার স্ত্রীর নাক কেটে যাত্রাভঙ্গ করে দেন। সেই অবধি ইনি নাকটি ঠাকুরাণ নামে সাধারণে পরিচিত। এগুলি লোক-কাহিনী বা প্রচলিত বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। মূর্তিটির ডান দিকের দু'টি হাতে যথাক্রমে উত্তোলিত অসি ও গদা এবং বামদিকের দুটি হাতে যথাক্রমে অঙ্কুশ ও খড়্গ। মূর্তিটিকে বেগলার দেখেছিলেন বলে জানা যায়। এটি কারুর মতে ইন্দ্রের মূর্তি হতে পারে। কোন মূর্তি বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে যথাযথ আলোকপাত করতে পারেন। নাকটি ঠাকুরাণের কয়েক গজের মধ্যে একটি ধর্মঠাকুরের থান আছে। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এখানে ইণ্ডনাথের সম্মানে একদিনের একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয় যাতে প্রায় ৩০-৩৫ হাজার লোক জমায়েত হয়। এর দ্বারাই ইণ্ডনাথের খ্যাতির পরিমাণ করা যেতে পারে।

কৌশিকী, নব পর্যায় ৩য় বর্ষ ৯ম-১০ম সংখ্যা [শারদীয়, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮০] হতে সংকলিত।

ইলাপুত্র

[জৈন কথানক]

সেকালে ইলাবর্দ্ধন নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে ধনদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন।

শ্রেষ্ঠীর অনেক ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু মনে সুখ ছিল না। কারণ তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তাই তাঁর সেই এক ভাবনা—তাঁর মৃত্যুর পর কে তাঁর বংশে বাতি দেবে, কে তাঁর ঐশ্বর্য উপভোগ করবে।

ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করবার জন্য শ্রেষ্ঠী যে যা বলেছে তাই করেছেন। দান-দক্ষিণা, পূজো-আর্চা, এমন কি সুদূর তীর্থযাত্রা পর্যন্ত তিনি করে এসেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষে তিনি তাঁদের কুল দেবতা ইলাদেবীর মন্দিরে ধর্ণা দিলেন।

ধর্ণা দেবার পর ছ' দিন ছ'রাত কেটে গেল। শেষে সাত দিনের দিন রাত্রে শ্রেষ্ঠী স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন দেবী যেন তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন আর বলেছেন, তিনি অচিরেই পুত্র-মুখ দর্শন করবেন।

দেবীর বরে বছর ঘুরতেই সত্যি শ্রেষ্ঠীর এক পুত্র হল। ইলাদেবীর বরে পুত্র হয়েছে বলে শ্রেষ্ঠী তার নাম দিলেন ইলাপুত্র।

ইলাপুত্র ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠল। শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র বলেই নয়, তার স্বভাব ও সৌজন্যের জন্য সে সকলের প্রিয় হল। যেমন তার মেধা তেমনি তার বিনয়, যেমন সে কর্মঠ তেমনি সে কুশলও। রূপও তার কিছু কম নয়।

তাই শ্রেষ্ঠীর আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তিনি ভাবছিলেন ভাগ্যের কথা। ভাগ্য শুধু তাঁকে বঞ্চনাই করেনি, দিয়েছেও অনেক কিছু। এবারে সংসারের দায়িত্ব ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারবেন।

কিন্তু না—তাঁকে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে দেবার বোধহয় বিধাতার ইচ্ছা ছিল না।

ইলাপুত্র সেদিন ইন্দ্রমহ দেখে বয়স্তের সঙ্গে ঘরে ফিরছিল। হঠাৎ পথের ধারে লোকের ভিড় দেখে সেদিকে সে এগিয়ে গেল। দেখল একটি নটের দল নানা ধরণের শারীরিক খেলা দেখাচ্ছে। লোক তাই চিত্রার্পিত হয়ে দেখছে।

বয়স্তের সঙ্গে ইলাপুত্রও সেই খেলা দেখতে লাগল। দেখল একটা লোক তর-তর করে বাঁশের মাথায় উঠে গেল। বাঁশের আগায় একটি সুপুরি রাখা। সেই সুপুরির ওপর সে তার দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল ও দু'হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে নানা ধরণের খেলা দেখাতে লাগল।

তার খেলা শেষ হতে সামনে এগিয়ে এলো একটি মেয়ে। শ্রাবণের জল ভরা মেঘের মতো তার চুল। শরতের ফুটন্ত পদ্মের পাপড়ির মতো তার চোখ। যে দেখল সেই বিস্মিত হ'ল।

ইলাপুত্রও কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু শুধু বিস্মিত হওয়াই নয়, দেখা মাত্রই সে ভালবেসে ফেলল সেই মেয়েটিকে।

মেয়েটি ততক্ষণে নাচতে সুরু করেছে। পায়ে পায়ে নূপুর বেজে উঠেছে। ঘুরে ঘুরে সে নাচছে। মণ্ডলাকার সেই নৃত্য।

তারপর এক সময় সেই নাচ শেষ হল, খেলাও। জনতার ভিড় ভেঙে গেল। নটের দলও পুরস্কার কুড়িয়ে চলে গেল। ইলাপুত্রও ঘরে ফিরে এলো।

ঘরে ফিরে এলো কিন্তু কেমন যেন উন্মনা হয়ে রইল। তার চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না সেই মেয়েটীকে।

তার অন্তমনস্কতা চোখে পড়ল শ্রেষ্ঠীর। এ নিয়ে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন।

ইলাপুত্র কিছুই গোপন করল না। সমস্ত কথা খুলে বলল। বলল, সেই মেয়েটিকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

শুনে শ্রেষ্ঠী দুঃখিত হলেন। তিনি তার জন্ম ধনী শ্রেষ্ঠীর এক সুন্দরী মেয়ে দেখে রেখেছিলেন। ইলাপুত্রকে তিনি অনেক বোঝালেন। কিন্তু ইলাপুত্রের

সেই এক কথা, তাকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। শ্রেষ্ঠী তখন রাগ করে বললেন, যা ভাল বোঝ তাই কর।

ইলাপুত্র তখন তার বয়স্তকে দিয়ে সেই নটের দলের অধিকারীকে ডেকে পাঠাল। মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করল।

অধিকারী বলল, মেয়েটি তারই।

ইলাপুত্র বলল, আমি ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই।

অধিকারী সে কথা শুনে খুসী হল বলে মনে হল না। সে কি ভাবল, তারপর বলল, আমি ওকে তার হাতে দেব যে আমাদের একজন।

ইলাপুত্র বলল, তার মানে ?

তার মানে, যে আমাদের দলে থেকে খেলা দেখাবে তাকে। কারণ ও না থাকলে দল ভেঙে যাবে।

তবে উপায় ?

উপায় ? ওকে যদি পেতে চাও তবে আমাদের দলে যোগ দাও।

ইলাপুত্রের উপায়ান্তর ছিল না, তাই সে পিতামাতার স্নেহ-মমতা ও ধন-ঐশ্বর্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে সেই নটের দলে যোগ দিল।

ইলাপুত্র এখন সেই দলেরই একজন। এখন সে নিজেই সেই খেলা দেখায়, একদিন যে খেলা দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এখন তর তর করে বাঁশের আগায় উঠে যায়। বাঁশের মাথায় রাখা সুপুরির ওপর দেহের ভার-সাম্য রক্ষা করে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে ও হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে নানা ধরণের খেলা দেখায়। আরো ভালো খেলা, আরো সুন্দর খেলা, আরো রকমারি খেলা।

তার খেলার ঔৎকর্ষে সেই দলের খ্যাতি এখন চারদিকে আরো ছড়িয়ে পড়েছে। দূর দূর হতে খেলা দেখাবার জন্ম তাদের আমন্ত্রণ আসে। রাজ-বাড়ীতেও ডাক পড়ে। অধিকারী তাই ভালোও বাসেন ইলাপুত্রকে খুব।

কিন্তু আজো ইলাপুত্র বিয়ে করতে পারেনি সেই মেয়েটিকে। সে প্রশ্ন তুললে অধিকারী বলে, তার কি এত তাড়া ? আরো কিছু দিন যাক না।

আরো কিছু দিন করে গড়িয়ে যায় আরো ক'টা বছর। মেয়েটি আরো রূপসী হয়ে ওঠে।

সেদিন রাজবাড়ীতে খেলা দেখাতে এসেছে সেই নটের দল। রাজবাড়ীর মস্ত বড় উঠোনে খেলা হবে। রাত ভর খেলা। গিস গিস করছে লোকজন।

মাঝরাত তখন অতীত হয়ে গেছে। শেষ হয়েছে আর আর নটের খেলা। এবারে খেলা দেখাবে ইলাপুত্র।

ইলাপুত্র রাজাকে নমস্কার করে মেয়েটিকে কী বলে তরতর করে উঠে গেল বাঁশের আগায়। তারপর সুপুরির ওপর দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে সে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল দু'হাতে ঢাল তলোয়ার নিয়ে। দ্রুত, আরো দ্রুত। নির্বাক বিস্ময়ে লোকে তাই দেখতে লাগল—অপলক নেত্রে।

সকলেই দেখল, কিন্তু দেখলেন না কেবল রাজা। তাঁর চোখ গিয়ে পড়েছিল সেই মেয়েটির ওপর যখন ইলাপুত্র তার সঙ্গে কথা বলছিল। বিস্মিত হলেন রাজাও মেয়েটির অসামান্য রূপ দেখে। এই মেয়েটিকে তাঁর চাই-ই। কিন্তু এও বুঝতে পেরেছেন তিনি, তার বাধা ইলাপুত্র। ইলাপুত্রকে তাই শেষ করে দিতে হবে।

ইলাপুত্র ততক্ষণে খেলা শেষ করে নীচে নেবে এসেছে। রাজার কাছে গিয়ে বলছে, আমার পুরস্কার?

সকলেই ভাবছে রাজা তাকে অনেক ধন রত্ন দেবেন। কিন্তু না। রাজা তাকে পুরস্কার দিলেন না। বললেন, ইলাপুত্র, রাজ্য সম্বন্ধীয় একটি চিন্তায় মন হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই তোমার খেলায় মনঃ সংযোগ করতে পারিনি। তুমি কি আমায় আর একবার খেলা দেখাতে পার না?

কেন পারব না? বলে ইলাপুত্র আবার বাঁশের আগায় উঠল। আবার সেই খেলা দেখাতে লাগল। আরো ভালো করে, আরো সুন্দর করে।

খেলা শেষ করে ইলাপুত্র দ্বিতীয়বার নেবে এল।

কিন্তু সেবারও সে পুরস্কার পেল না। রাজা সেই কথাই বললেন আবার। বললেন, লোকের হর্ষধ্বনিতে বুঝতে পারছি তোমার খেলা খুব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু সে খেলা আমি উপভোগ করতে পারিনি। তুমি আর একবার খেলা দেখাও।

রাগে ইলাপুত্রের শরীর রী রী করে উঠল। কি চান রাজা তার কাছে? কিন্তু মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারল না।

ইলাপুত্র তৃতীয়বার তাই উঠল বাঁশের আগায়। দ্রুত, আরো দ্রুত সে ঘুরতে লাগল। রাত তখন ভোর হয়ে এসেছে। লোকেরাও চিত্রার্পিত—স্থির।

খেলা শেষ করে তৃতীয়বার ইলাপুত্র রাজার কাছে গিয়ে পুরস্কার চাইল।

কিন্তু রাজা সেবারেও তাকে পুরস্কার দিলেন না। বললেন, ইলাপুত্র, তুমি আর একবার খেলা দেখাও।

ইলাপুত্রের ইচ্ছা করল হাতের তলোয়ার দিয়ে সেই মুহূর্তেই সে রাজাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। একি অন্যায়! একি অবিচার! জনতার মাঝেও গুঞ্জন শোনা গেল। এমনকি রানীও ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু রাজার ইচ্ছা। করবার কিছু উপায় ছিল না।

আবার সেই বাঁশের আগায় উঠবে কি উঠবে না স্থির করতে পারছিল না ইলাপুত্র। তিন তিনবার সে বাঁশের আগায় চক্রাকারে ঘুরেছে। ফলে শিথিল হয়েছে তার দেহবন্ধ। মাথার ভেতর কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। এরপর খেলা দেখানো, মৃত্যুকে হাতছানি দিয়ে ডাকা।

উত্তেজিত হয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু অধিকারীর মেয়েই তাকে শান্ত করল। বলল, ইলাপুত্র, আমাদের পুরস্কার পেতে হবে। আমাদের সুনাম রক্ষা করতে হবে। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে জানি, তবু আর একবার তোমায় উপরে উঠতে হবে। এই শেষ।

তবে তাই হোক—বলে ইলাপুত্র চতুর্থবার সেই বাঁশের আগায় গিয়ে উঠল। আরো বেগে সে ঘুরতে লাগল, আরো দ্রুত। হঠাৎ তার মনে হল তার গলা যেন কাঠ হয়ে এসেছে।

না, এ পিপাসা সে জল দিয়ে শান্ত করবে না, রাজার রক্তে শান্ত করবে।

ইলাপুত্র যখন সেকথা ভাবছিল ঠিক সেই সময় সূর্যোদয় হল। ভোরের সুন্দর আলো সবখানে ছড়িয়ে পড়ল।

আর সেই সময় ইলাপুত্রের চোখ গিয়ে পড়ল রাজবাড়ীর প্রাচীরের সীমা পেরিয়ে অনেক দূরের এক শ্রমণের ওপর। শ্রমণটি এক গৃহস্থ বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে জলভিক্ষা নিচ্ছিলেন। একটি সুন্দরী মেয়ে তাঁকে জল ঢেলে দিচ্ছিল।

ইলাপুত্র দেখল। দেখল শ্রমণটি কেমন অলিপ্ত। যে মেয়েটি তাকে জল ঢেলে দিল তার দিকেও তিনি চেয়ে দেখলেন না। তিনি জল নিলেন ও চলে গেলেন। কি শান্ত! কি নিরুদ্বিগ্ন!

ইলাপুত্র তখন নিজের কথা ভাবতে লাগল। ভাবতে লাগল রাজার চাইতেও তার ঐশ্বর্য কিছু কম ছিল না। সেই ঐশ্বর্য, পিতামাতার আশ্রয় পরিত্যাগ করে একি সে করে বেড়াচ্ছে। যে হাজারে হাজারে অর্থীকে ভিক্ষা দিয়েছে সে আজ দরজায় দরজায় পুরস্কার ভিক্ষা করছে। শুধু তাই নয়, তার জন্য তার নিজের জীবনকেও বিপন্ন করছে। কিন্তু কেন? কিসের জন্য? মেয়েটির ভালবাসা? সেও কি সে পেয়েছে? পেলে মেয়েটি তাকে আর একবার খেলা দেখাতে বলত না। মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা লড়তে তাকে উত্তেজিত করত না।

মৃত্যুর কথা মনে হতে সংসারের অনিত্যতার কথা তার মনে এল। একদিন তারও মৃত্যু হবে। তবে কেন এই উঞ্ছবৃত্তি? জীবনের অপব্যয়? যে-সময় সে মেয়েটিকে পাবার জন্য ব্যয় করেছে সেই সময় যদি সে দিত নিজেকে পাবার জন্য? তবে সে এতদিনে সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারত।

ইলাপুত্র যতই এসব কথা ভাবতে লাগল, ততই তার কর্মবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল। যতই ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল, ততই সে উত্তরণের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর এক সময় সেইখানে সেই অবস্থায় তার সমস্ত কর্ম্ম বন্ধন ক্ষয় হয়ে গেল।

ইলাপুত্রের খেলাও সেই সঙ্গে শেষ হল। সে বাঁশের আগা হতে ধীরে ধীরে নেমে এল। তারপর কারু দিকে না চেয়ে সেখান হতে সে গভীর অরণ্যের দিকে চলে গেল। মেয়েটির প্রসন্নতা কি রাজার পুরস্কার কোন-টিরই তার আর প্রয়োজন ছিল না।

মহাবীর বলেছিলেন

[পূর্বাহুবৃত্তি]

পথ সম্বন্ধীয়

অনিশ্চিত অশাশ্বত
দুঃখময় এই সংসারের
দুঃখ ও যাতনা হতে
কি ভাবে আমি মুক্তিলাভ করব ?

জ্ঞান পরিশুদ্ধ কর,
অজ্ঞান ও মোহ কর পরিহার,
তাহলেই তুমি লাভ করবে
সেই মোক্ষপদ
যা কেবল আনন্দ ও আনন্দ।

সম্যক জ্ঞান-দর্শন-চারিত্র্যই
সেই মোক্ষলাভের পথ।

মোক্ষলাভের পথ
বৃদ্ধ ও আচার্যের সেবা,
দুর্জন সংসর্গ পরিত্যাগ,
শাস্ত্রবাক্যের গহন অধ্যয়ন
ও স্বাধ্যায়।

যাঁর কাছ হতে
তুমি শিক্ষা লাভ কর
তাঁর প্রতি বিনয়বান হও,

কৃতাঞ্জলি ও নত মস্তকে
তাঁকে শ্রদ্ধা জানাও,
দেহ মন বাক্যে
তাঁর সৎকার কর।

সেই সুশিষ্য,
যে ক্ষিপ্র,
যাকে বলবার প্রয়োজন হয় না,
না বলতেই
যে আচার্যের মনোভাব
বুঝতে পারে
ও তদনুযায়ী আচরণ করে।

আচার্যের বাক্য ও মনোভাবকে
বুঝবার চেষ্টা কর,
তা ঠিক সেকথা বল,
তারপর
জীবনে তা অনুসরণ কর।

রাগ ও দ্বেষ
মান ও মায়ার
বশবর্ত্তী হয়ে যে আচার্যের প্রতি
শ্রদ্ধা দেখায় না
জীবনে
সে কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না
তার জ্ঞান
বাঁশের ফলের মতো
নিজেরি বিনাশের কারণ হয়।

যে অবিনয়ী
সে দুর্গতি লাভ করে,
যে বিনয়ী
সে প্রগতি—
একথা যে বুঝতে পারে
সেই সত্যিকার শিক্ষালাভ করে।

বিনয় সম্বন্ধীয়

উচ্চকুল জাত ব্যক্তির দ্বারা
কৃত হলেও
সেই তপস্যা বৃথা
যে তপস্যা
খ্যাতির জন্য করা হয়।
সেই তপস্যাই তপস্যা
যার কথা কেউ জানে না।
নিজেকে কখনো প্রচার কোরো না।

জ্ঞান ও তপস্যা
গোত্র ও কুলের
অহংকার যে পরিহার করতে পারে
সেই যথার্থ জ্ঞানী
ও উত্তম অধিকারী।

ধর্মে সুদৃঢ় হয়ে
অহংকার পরিত্যাগ করো
তবেই তুমি অনুভব করবে
সেই মহর্ষি অবস্থা
যিনি গোত্র ও কুলের
অনেক ওপরে।

মূল হতে স্কন্ধ,
স্কন্ধ হতে শাখা প্রশাখা
পাতা ফুল ফল রস,
ঠিক সেই রকম ধর্ম,
বিনয় যার মূল
মোক্ষ যার রস।

বিনয়ের দ্বারাই
সহজে সে জ্ঞান লাভ করে,
জীবনে খ্যাতি
ও পরিশেষে নির্বাণ।

বিনয় ও শাস্ত্র বাক্যে
তপস্যা ও চারিত্র্যে
যার শ্রদ্ধা রয়েছে
সেই নিজেকে জয় করতে পারে

[ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় মাসের শেষের দিনটী যে কি ভয়ঙ্কর গুণসেনও সেকথা জানত এবং সেই দিনটীর সেও প্রতীক্ষা করছিল। তার জন্ত তিন তিন মাস উপবাসকারী তপস্বী যে তার নিজের সম্বন্ধে অটুট থাকবে সেকথা বুঝতে তার আর বাকী ছিল না।

কিন্তু সংসারে সব কিছু সহজ ভাবে সংঘটিত হয় না। কত সময় দেখা গেছে জাহাজ কূলে এসে ভিড়বে, আর মুহূর্ত মাত্র বাকী, এমন সময় না জানি কোথা হতে মেঘ উঠে এল ও প্রবল ঝঞ্ঝা সেই জাহাজটীকে কূল হতে দূরে ঠেলে দিল। মানুষের আশা ও কল্পনা এমনি ভেঙে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

অগ্নিশর্মার বেলাতেও তাই হল। তৃতীয় মাসের শেষে চতুর্থ মাসের প্রথম দিনটীতে গুণসেনের ঘরে পুত্র জন্ম হল। সমস্ত রাজ পরিবার ও জন-সাধারণ এমন উৎসবে মত্ত হয়ে গেল যে অগ্নিশর্মার যে আজ পারণের দিন সেকথা সকলে বিস্মৃত হয়ে গেল। অগ্নিশর্মা রাজ প্রাসাদের দরজায় কখন এল কখন ফিরে গেল, সে কথা কেউ জানতেও পারল না।

অগ্নিশর্মার সমস্ত শরীর রাগে রী রী করে উঠল। এখন তার মনে হল, গুণসেন বাইরে যতই ভক্তির ভান দেখাক মনে মনে সে তার শত্রু, সে তাকে এভাবে হত্যা করতেই চায়। পুত্রের জন্মোৎসব হচ্ছে সে ঠিক, সমস্ত নগর উৎসবে মত্ত তাও ঠিক কিন্তু সেই উৎসবের আনন্দোল্লাসে যে গুনসেন তার আজ পারণের দিন সে কথা ভুলে যাবে এ তার সম্ভাব্য বলে মনে হল না। তিন তিন মাস যে তাকে ক্ষুধায় রেখেছে এবং প্রতিবারেই যে একটা না একটা অজুহাত উপস্থিত করেছে সেই গুণসেনকে সর্বপ্রকারে বিনষ্ট করবার জন্ত তার প্রবৃত্তি সহসা উদগ্র হয়ে উঠল।

কঠোর তপস্যা নিজেতে কোনো সিদ্ধি নয়, ক্ষমা, মৃদুতা ও করুণার তা পরিপোষক মাত্র—কিন্তু সেকথা অগ্নিশর্মাকে কে বোঝাবে? আচার্য কৌণ্ডিন্যও যে সেকথা বুঝতেন তাও না। বাস্তবে তপশ্চর্যার মাহাত্ম্যের চাইতেও মনঃসংযম ও আত্ম-শুদ্ধিই যথার্থ শুভাশুভের নিয়ামক। কিন্তু এখানকার আশ্রমবাসীরা ছিলেন উগ্র তপস্যা ও যম নিয়মেরই একমাত্র পুজারী।

অগ্নিশর্মার তপস্যাজনিত শক্তিশালী মনোবৃত্তিকে আজ উপশমিত করা প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল তার দেহ ও মনের সহযোগিতায় তার অন্তরে অন্তরে যে আক্রোশ গুমরে গুমরে উঠছিল তাকে সংযত করবার কিন্তু সেদিকে কে তাকে চালিত করবে? অগ্নিশর্মার যদি সদ্‌গুরু প্রাপ্তি হয়ে থাকত তবে সে এই অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দহনোত্তীর্ণ সোনার মতোই উজ্জল হয়ে উঠতে পারত, কৃতকৃত্য হতে পারত। কিন্তু তা হবার ছিল না।

আশ্রমবাসীরা কেউ এখন অগ্নিশর্মার কাছে যেতে বা তার কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করতেও সাহসী হলেন না। দূর হতে তাকে দেখেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে অগ্নিশর্মা আজ তার প্রতিদিনের শান্তি, ক্ষমা ও মৃদুতা সম্পূর্ণ হারিয়ে এসেছে। তার চোখ দিয়ে তখন অগ্নি বৃষ্টি হচ্ছিল।

যে কোন প্রকারেই হোক আমি গুণসেনকে বিনষ্ট করব, সে সুখে শান্তিতে থাকবে তা আমি সহ্য করতে পারব না—এই ধরণের এক ক্ষোভ তখন তার মনের মধ্যে বসে কাল নাগিনীর মতো কেবলি ফোঁস ফোঁস করছিল।

তিন মাসের উপবাস বিশীর্ণতা ও চিত্ত বৃত্তিতে উদ্ভূত এই সংক্ষোভ এদুয়ের বিরোধিতা করতে অগ্নিশর্মা সম্পূর্ণ অসমর্থ হল, এবং বৈরীর নির্যাতন চাই, একথা মনে করতে করতে সে নিজের দর্ভাসনে পাশ ফিরে শুল।

ঠিক সেই সময় রাজ-পুরোহিত সোমদেব ধীর পদক্ষেপে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন ও অনতিদূর হতে তাকে বন্দনা করে মাটীতে বসে পড়লেন।

অগ্নিশর্মার হয়ত তন্দ্রার মতো এসে ছিল বা সে এমনি চোখ বুজে শুয়ে ছিল কিন্তু সোমদেবের পায়ের শব্দে সে তার রক্তবর্ণ চোখ মেলে চাইল।

সোমদেব হঠাৎ-ই তাকে কিছু বলতে পারলেন না। তারপর ধীরে ধীরে যেন তার কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করছেন সেই রকম বিনয় বিনম্র ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, ভগবন্, আপনার শরীর খুবই শীর্ণ দেখাচ্ছে।

অগ্নিশর্মা ঊর্দ্ধ দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সংক্ষেপে এর প্রত্যুত্তর দিল, তপস্বীর শরীর এমনি শীর্ণ-ই হয়ে থাকে।

সোমদেব গুণসেনের প্রতিনিধি রূপেই সেখানে এসেছিলেন। গুণসেন যে আসতে পারত না তা নয়, তবে ভয়েই সে আসে নি। অগ্নিশর্মা ক্রুদ্ধ হয়ে যদি তাকে অভিসম্পাৎ দেয় বা কোনো কিছু করে বসে।

সোমদেব অগ্নিশর্মার কথার প্রত্যুত্তরেই তখন বললেন, তপস্বীরাও আহার প্রাপ্ত হতে পারেন। আহার যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন শরীরকে এত কষ্ট দেওয়া কেন? মহারাজ গুণসেনত তপস্বীদের প্রতি ভক্তিমানই।···

গুণসেনের নাম কানে যেতেই শূলবিদ্ধ হবার যন্ত্রণা তার সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, গুণসেনের নাম আমার কাছে করো না। সে ঋষি-ঘাতক।

এরপর সোমদেবের অধিক কিছু বলবার সাহস হল না। তিনি গুণসেনের হয়েই তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে এসেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর মনে হল সে হবে তপ্ত মাটিতে জলের ছিঁটা দেবার মতোই নিরর্থক।

সোমদেব তাই নিরাশ হয়েই সেখান হতে ফিরে গেলেন। গিয়ে গুণসেনকে বললেন, তপোবনে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। অগ্নিশর্মা এখন যে কারু কথা শুনবে তা মনে হয় না।

কিন্তু গুণসেন সে কথা শুনেও নিরাশ হল না। সে অবশ্যই ভুল করেছিল। যে সময় ভিক্ষা দেবার ঠিক সেই সময়ই সে অসাবধান হয়েছিল। কিন্তু তার মনে ত তপস্বীকে যাতনা দেবার কোনো মনোভাব ছিল না।

তাই গুণসেন খানিক পরেই নিজে গিয়ে তপোবনে উপস্থিত হল। প্রথমে সে আচার্যের সঙ্গে দেখা করল। যা-যা ঘটেছিল তা সে সরল ও অকপট ভাবে তাঁকে নিবেদন করল। আচার্যও দুঃখিত হলেন। কিন্তু সে সমস্তই ঘটেছে দৈবাৎ। সেকথা তিনিও বুঝতে পারলেন।

গুণসেনকে সেইখানেই বসিয়ে আচার্য অগ্নিশর্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁরও মনে হল আজকের অগ্নিশর্মা গতকালকার অগ্নিশর্মা নয়। তার মুখের ওপর এক রৌদ্র ভাব তাণ্ডব নৃত্য করে বেড়াচ্ছিল। তপস্যালব্ধ সমস্ত সিদ্ধি ও তেজকে সে বৈর বৃত্তিতে আজ পরিবর্তিত করে ফেলেছিল।

এত কঠিন তপশ্চর্যায় নিরত থাকা সত্বেও শেষ পরীক্ষার সময় মানুষ যদি এরকম পরাভূত হয়ে স্খলিত হয়ে যায় তবে সে কঠিন তপশ্চর্যার মূল্য কি— মাত্র এই প্রশ্নই আচার্যের মনে তখন বার বার উদিত হতে লাগল।

তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন—কেবল দেহ দমন নিরর্থক, অর্থ শূন্য। যে দেহকে দুঃখ দিতে কিছু বাকী রাখেনি, জিহ্বার স্বাদ ও ক্ষুধার ওপর যে বিজয় প্রাপ্ত হয়েছে তার মনোবৃত্তিতে করুণা ও প্রেমের সমুদ্রও উত্তাল হওয়া অপেক্ষিত ছিল। কিন্তু অগ্নিশর্মার সেই করুণা ও প্রেমের সাধন পথ একেবারেই অজ্ঞাত ছিল।

আচার্য তখন সান্ত্বনা দেবার দৃষ্টিতে তাকে বলতে লাগলেন, বৎস, তুমি অনেক সহ্য করেছ। সামান্য মানুষ যে কষ্টের সামনে হার মেনে যেত সে কষ্টকে তুমি ডাক দিয়ে নিয়ে এসে বরণ করে নিয়েছ। আজ তোমার শেষ পরীক্ষার দিন। সংসার সমুদ্র অতিক্রম করবার জন্য যে নৌকোর তুমি সাহায্য নিয়েছ সেই নৌকোয় ক্রোধাদির মতো বৃহৎ ছিদ্র ত অবশেষ নেই? আর সে তোমায় নিজেকেই খুঁজে দেখতে হবে। তুমি কৃচ্ছ্রতায় যে পুণ্য সঞ্চয় করেছ তা যেন ব্যর্থই নষ্ট না হয়ে যায়। তোমার সাধনা তোমায় বিপথে ত নিয়ে যাচ্ছে না?

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. III. No. 4 : Sraman : August 1975

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৮২ ॥ পঞ্চম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

সিহনাদিক প্রতিষ্ঠিত আয়াগপট, মথুরা

আর্যপট্ট

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিন পূর্বে ইংরেজ-রাজ্যের প্রারম্ভে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষের সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃত সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন সর্বপ্রথমে পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ সাহিত্য তাঁহাদের নজরে পড়িল। তাঁহারা প্রথমে যাহা শুনিলেন তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। সিংহলে ও শ্যামদেশে বৌদ্ধেরা তাঁহাদের শুনাইলেন যে বৌদ্ধ ধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে প্রাচীন। গৌতম বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন তখন নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র নামক একজন শিক্ষক জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৌতমের পূর্বে আবার সাত জন বুদ্ধ ছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম জৈন ধর্মাপেক্ষা অনেক পুরাতন। বৌদ্ধমূর্তি এবং জৈন মূর্তিতে এতটা মিল আছে যে, প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জৈন মূর্তিকে বৌদ্ধ মূর্তির একটা শাখা বলিয়াই মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেন। গত দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে জৈনধর্মের প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ পাইয়াছে। এখন আমরা জানিতে পারিতেছি বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈনধর্ম কত পুরাতন অতি প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া উঠিবার সময় জৈন ধর্মের আকার কিরূপ ছিল, এবং গত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া তাহা কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

জৈনধর্ম তখন অতীব রক্ষণশীল। ইহাতে পরিবর্তনের লক্ষণ অতি অল্প, সুতরাং বিদেশীয় জাতি অথবা নূতন জাতি ইহাতে অতি অল্পই আশ্রয় পাইয়া থাকে। তথাপি জৈনধর্ম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী। কেবল রক্ষণশীলতার জন্য ভারতবর্ষের ধর্মের সংগ্রামে জৈনধর্ম আড়াই হাজার বৎসর রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে পার্শী, গ্রীক, বা যবন, শক, কুশান, হূণ, গুর্জর, রাজপুত, আরব, তাজিক প্রভৃতি শত শত বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে, আপনাদের পুরাতন ধর্ম

পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু অথবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষের লোক হইয়া গিয়াছে। আজ তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়া আদিম ভারতবাসী আর্য অথবা অনার্য স্থির করা বড়ই কঠিন। কিন্তু এ বিষয়ে স্থির মীমাংসা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পক্ষে আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। দুই একজন পণ্ডিত ক্রমশঃ বুঝিতেছেন যে, ভারতবর্ষে যত ধর্ম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, জৈনধর্ম তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন না হইলেও ভারতের একটি অতি প্রাচীন ধর্ম। আমাদের বৈদিক আর্য ধর্ম ইহার তুলনায় বয়সে অতি শিশু, ধর্মভাবে অতি নবীন এবং বৈদিক ধর্মের দর্শন নাই বলিলেই চলে। শঙ্কর প্রভৃতি আর্য দর্শনবাদীরা জৈন দর্শনবাদীদের তুলনায় নবীন।

যীশুখৃষ্ট জন্মিবার প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে জৈন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জৈন দার্শনিকেরা তখনই বুঝিয়াছিলেন যে, কোনও দুই জন মানুষই জগতে সমান হইয়া জন্মে নাই, মানসিক শক্তির বৈষম্যে মানুষ মানুষকে জয় করে এবং মানসিক শক্তির বৈষম্যেই মানুষ দেবত্বের অধিকারী হয়। বিবেক শক্তির অতি বৃদ্ধিলাভেই মানুষে মানুষে প্রভেদ জন্মায়। জৈন ধর্মের মূল গুরু চব্বিশ জন, তাঁহারা সকলেই মানুষ এবং কেহই ব্রাহ্মণ বংশজাত নহেন। বেদকর্তা ব্রাহ্মণ যে বংশজাত গুরুপদ এতদিন দাবী করিয়া আসিয়াছেন এইরূপে জৈন গুরুগণ সর্বপ্রথমে তাহার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দেববংশজাত উপাস্য দেবতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে জৈনগুরুরাই প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। পরবর্তী জৈনধর্মে গন্ধর্ব, অপ্সর, যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস প্রভৃতি অর্দ্ধদেব ও কিম্পুরুষ জাতীয় স্বত্বগণ প্রভৃত পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু জৈনগণের প্রধান উপাস্য দেবতা মানুষ। চব্বিশ জন তীর্থংকর, তাঁহারা মানুষ, ক্ষত্রিয় বংশজাত, চিন্তাশক্তি বা তপস্যার বলে অপরিসীম মানসিক শক্তিধারী অথবা মহাপুরুষ, সুতরাং জৈনধর্ম ভারতীয় ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্র মানবিক ধর্ম। (অবশ্য প্রথম প্রথম গৌতম বুদ্ধের সরল বৌদ্ধ ধর্মও এই রকম সরল মানবিক ধর্ম ছিল।)

জৈন ধর্ম গত আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। জৈনদের মধ্যে বিবাদে জৈন ধর্মশাস্ত্র প্রচুর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, 'বিবাদ বাধিয়া অনেক ধর্মমত পতিত শখা হইয়া লোকের স্মৃতিপথ ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অনেক শাখার লোক ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিয়া নূতন ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমানে জৈনধর্মের তিনটি প্রধান বিভাগ—'শ্বেতাম্বর', 'দিগম্বর', ও 'তেরপন্থী'—ছাড়া ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও অনেক শাখার লক্ষণ এখনও ভারতের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ জৈনধর্মের শাখা তাহাদের দেবার্চনা-পদ্ধতি, দেব-প্রতিমা লক্ষণ ও দর্শনের মূল কথা হইতে ভারতের সর্বপ্রাচীন ধর্মমত কিঞ্চিৎ পরিমাণে বোধগম্য হইতে পারে।

'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্র বহুবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং বহুবার পুনর্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং জৈনধর্ম আদিমকালে কি ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় ধর্মশাস্ত্রে নাই। এখন হইতে ২২০০-২৫০০ বৎসর পূর্বে আদিম জৈনেরা কি পূজা করিতেন এবং কিভাবে পূজা করিতেন তাহাই বিবেচনা করা উচিত। খৃষ্টের জন্মের দুই-তিন শত বৎসর পূর্বে উত্তর ভারতের জৈনেরা মূর্তি পূজা করিতেন এবং মথুরা, কৌশাম্বী প্রভৃতি প্রাচীন নগরে এই জাতীয় প্রাচীন জৈনমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনকার জৈন মূর্তিতে যে সমস্ত লক্ষণ থাকে প্রাচীন কালের জৈনমূর্তিতে সেগুলি সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগের জৈন মূর্তিতে বৃক্ষ, শাসনদেবী, যক্ষ, লাঞ্ছন ইত্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের জৈন মূর্তিতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কালের জৈনমূর্তি একখানি পাথরের পট্ট, ইহার উপরে কতগুলি চিহ্ন আঁকা থাকে। এলাহাবাদের বাহাদুর গঞ্জের স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ডাক্তার বামনদাস বসু মহাশয়ের সংগ্রহশালায় অনেক ভারতীয় পুরাকীর্তি রক্ষিত আছে; তাহার মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন পট্ট প্রাচীন কৌশাম্বী হইতে আনীত হইয়াছিল। ষোল বৎসর পূর্বে এই প্রাচীন জৈন পট্টটি দেখিতে পাইয়া আমি ইহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার এক পার্শ্বে লিখিত আছে:

(১) সিদ্ধম রাজ্ঞো শিবমিত্রস্য সংবছরে ১০, ২০০০০০০৫০০০০০ থ মাহকিয়...

(২) থবিরস বলদাসস নিবর্তন শ...শিবনন্দিস অংতেবাসিস...

(৩) শিবপালিতান আয়পটো আপয়তি অরহত পূজায়ে।

সিদ্ধ রাজা শিবমিত্রের রাজ্যের দ্বাদশ সংবৎসর, স্থবির বলদাসের অনুরোধে …শিবনন্দীর শিষ্যা…শিবপালিতের…এই আর্যপট্ট অর্হৎদিগের পূজার নিমিত্তে প্রতিস্থাপিত হইল।

প্রাচীন মথুরা নগরের বাহিরে এই একটিমাত্র আর্যপট্ট বা আর্যাগ্রপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা শিবমিত্র কে ছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না, তবে মথুরায় খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ একশত বা দুইশত বৎসর পূর্বে এরকম অনেকগুলি আর্যপট্ট বা আর্যাগ্রপট্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহা গত পঞ্চাশ বছর ধরিয়া মথুরায় নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মথুরা ও লক্ষ্ণৌয়ের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

এই পট্টগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এখন হইতে আড়াই হাজার বা দুই হাজার দুই শত বৎসর পূর্বে জৈনদের উপাসনার দ্রব্য অথবা মূর্তি বেশ অনেকদিন ধরিয়া রীতি অনুসারে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পট্টগুলির উপরে শিলালেখে 'আয়পট' অথবা 'আয়াগপট' লিখিত থাকে, সুতরাং ইহাই প্রাচীন-কালের জৈনদের উপাস্য দেবতার নাম। এই আর্যপট্ট বা আর্যাগ্রপট্টগুলি একেবারে নূতন জৈনমূর্তি নহে; বর্তমান কালের জৈনমূর্তি বা অন্য উপাস্য দ্রব্যের সহিত ইহার অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। পট্টগুলি বড়, লম্বা ও চওড়া পাথরের পট্ট, অধিকাংশ পট্টের উপরে অনেকগুলি চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই সমস্ত চিহ্ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে প্রাচীন ও বর্তমান কালে মঙ্গল চিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত। অনেক আর্যপট্টের উপরে চারিটি মৎস্যপুচ্ছ অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক পট্টটির মধ্যে যেখানে চারিটি মৎস্যপুচ্ছ যুক্ত হইয়াছে, সেইখানে একটি চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন আর্যপট্টে এই চক্রটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন অথবা মূর্তি অঙ্কিত আছে। মেজর বামনদাস বসু মহাশয় কৌশাম্বী হইতে যে আর্যপট্টটি এলাহাবাদে আনিয়াছেন তাহার মধ্যস্থলের চক্রে ভিন্ন ভিন্ন তীর্থংকরদের মূর্তি আছে, দুই একটিতে একটি রথচক্র অথবা অন্য দুই একটি চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়। পট্টের মধ্যস্থলের এই চক্রের মধ্যে তীর্থংকর বা জিনমূর্তি অথবা চিহ্ন ব্যতীত আর্যপট্টের আরও অনেকগুলি মঙ্গল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, মৎস্যযুগল, মঙ্গল ঘট, পদ্ম, শঙ্খ, রথচক্র, ইত্যাদি। এই সমস্ত চিহ্নাদি বর্তমান সময়ের চব্বিশ জন তীর্থংকরের

লাঞ্ছন। জৈনেরা পুজার সময়ে কুঙ্কুম-রঞ্জিত তণ্ডুল (জাফরাণের রংকরা চাউল) পাত্রে লইয়া তাহাতে এই সমস্ত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

আর্যপট্ট বা আর্যাগ্রপট্টগুলি যে সমস্ত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি ভারতবর্ষ বা আর্যাবর্তের অতি প্রাচীন কেন্দ্র এবং আবিষ্কৃত শিলালেখ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টের জন্মের সমকাল পর্যন্ত জৈনদের প্রধান তীর্থ ও কেন্দ্র ছিল। ভাগলপুর বা চম্পা, পাবাপুরী বা অপাপপুরী, সমেতশিখর বা পার্শ্বনাথ পর্বত প্রাচীন রাজগৃহ বা গিরিব্রজ অতি প্রাচীন জৈনতীর্থ, কিন্তু মধ্যদেশ বা যুক্তপ্রদেশের শৌরসেন রাজধানী মথুরা, প্রাচীন বৎসদেশের রাজধানী কৌশাম্বী বা কোসাম, প্রাচীন পঞ্চালের পুরাতন রাজধানী অহিচ্ছত্র বা বারেলীর নিকট রামনগর আর্যাবর্তের ইতিহাসে সুবিখ্যাত। উপস্থিত এই তিনটি স্থানে আবিষ্কৃত জৈন পুরাকীর্তি হইতে প্রাচীন জৈনধর্মের অবস্থা আলোচনা করিব।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন মথুরায় প্রথম খনন আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসরে অনেকগুলি প্রাচীন জৈন শিলালেখ মথুরার কঙ্কালীটিলা নামক স্থানে প্রাচীন জৈন ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে আর্যপট্ট সংখ্যায় অতি অল্প। খনন কিছুদিন চলিবার পর কঙ্কালীটিলার নিম্নের স্তরে আর্যপট্ট আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। মথুরার সর্বপুরাতন আর্যপট্টটি আকারে বৃহৎ ও খণ্ডিত, ইহার শিলালেখও অসম্পূর্ণ। ইহাতে লিখিত আছে :

নমো অরহন্তো বর্ধমানস্য গোতিপুত্রস...পৌঠয় শক কালবালস... কোশিকিয়ে শিমিত্রায়ে আয়াগপটো পতি (ঠাবিত)।

অর্হৎ বর্দ্ধমানকে নমস্কার। গৌপ্তীপুত্র...প্রোষ্ঠয় ও শকদিগের কালব্যাল (স্বরূপ)...শিম্মিত্রা কর্তৃক আর্যাগ্রপট্ট প্রতিষ্ঠাপিত।

এই সঙ্গে আরও দুই একটি খণ্ডিত আর্যপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; তাহার মধ্যে একটি বারণগণের আর্যহট্টিয় কুলের বজ্রনাগরিক শাখার এবং আর্যশ্রীক সম্ভোগের কোনও জৈনগুরুর আদেশে প্রদত্ত একটি আর্যপট্ট। তৃতীয় আর্যপট্টটি রসনন্দীর পুত্র নন্দীঘোষ নামক ত্রৈবর্ণিক কতৃক প্রদত্ত।[১]

১ *Epigraphia Indica*, Vol. I, Pp. 396-97.

মথুরায় খনন কার্য চলিতে লাগিল। পরবর্তী দুই বৎসরে আরও অনেক প্রাচীন জৈনমূর্তি ও শিলালেখ আবিষ্কৃত হইল। এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে বৌদ্ধ ধর্মই পুরাতন বলিয়া আদরের বস্তু ছিল, কিন্তু জর্জ বিউলর প্রমুখ জর্মন পণ্ডিতেরা জৈন ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষা অতি পুরাতন বলিয়া আসিতেছিলেন। এতদিনে তাহার সমসাময়িক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইল। এতদিন কেবল জৈনদের কাছেই জৈন ধর্ম প্রাচীন ছিল, এইবার তাহা জগতের একটি অতি পূজ্য এবং অতি পুরাতন ধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। আরও দেখিতে পাওয়া গেল যে, উপাস্য উপাসনা সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্ম যে সমস্ত দেবার্চনা বিধি বা দেবতা এতদিন নিজস্ব বলিয়া দখল করিয়া আসিতেছিল, তাহা প্রাচীনকালে জৈনদেরও ছিল। যথা, স্তূপ, সাধুদের ভস্ম রক্ষা, ইত্যাদি। পরবর্তী যুগে জৈন ধর্মের পরিবর্তন হইয়া গিয়া জৈনদের মধ্যে স্তূপ পূজা, সাধুদের ভস্মপূজা উঠিয়া গিয়া কেবল বৌদ্ধদের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি নূতন রীতি অনুসারে গঠিত হওয়ায় ফলে একটা স্বতন্ত্র ধারা গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে বর্তমান জৈন ধর্মের ও উপাসনা পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক জৈনরা তাহার আদিম পরিকল্পনা ও উৎপত্তির কারণের বিবরণ একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। পুরাতন জৈন স্তূপ বা আর্যপট্ট যখন গত শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন কোনও জৈন মুনি স্বর্গগত জর্জ বিউলার বা পীটকে আর্যপট্ট জিনিষটি বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। দুই তিন বৎসর ধরিয়া কিছু পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া ভারতবর্ষে আর্যপট্ট বা আর্যাগ্রপট্ট আবিষ্কার হওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, আর্যপট্টগুলি একটি বিশেষ যুগের জিনিষ, সেই যুগের পূর্বে ও পরে আর্যপট্ট-পূজা প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যুগটা মৌর্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে এবং কুশান অর্থাৎ শক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্বে আসিয়াছিল। যে দুই চারি জন রাজার নাম এই সময়ের আর্যপট্টে পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা প্রায় অজ্ঞাত। মথুরায় রঞ্জু বুলো ও তাঁহার পুত্র শোডাস এবং কৌশাম্বীর শিবমিত্র এই সময়ের রাজা। শিলালেখ ও প্রাচীন মুদ্রা ব্যতীত এই সমস্ত রাজার নাম আর কোথাও পাওয়া যায় না। রঞ্জু বুলো এবং শোডাস শক-জাতীয় রাজা, তাঁহারা প্রথমে শক রাজাদের কর্মচারী ছিলেন, পরে স্বাধীন

হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াও রাজকর্ম সূচক 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি মহারাজ উপাধির সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। পুরাণে বা অন্য কোনও ইতিহাসে রঞ্জু বুলো অথবা তাঁহার পুত্র শোভাসের নাম পাওয়া যায় না। মথুরায় আবিষ্কৃত অনেক শিলালেখে শিবমিত্র নামক একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। মথুরার শিবমিত্র ও কৌশাম্বীর শিবমিত্র দুই জনেই একই যুগের লোক বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাঁহারা এক ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। জৈন ধর্মের প্রাচীনতম মূর্তির যুগ সম্ভবতঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের লোপের যুগে আরব্ধ হইয়াছিল এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের লোপের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল। ইহা কুশান সম্রাটদের আমলের জৈন মূর্তির যুগ। কুশান সম্রাটদের আমলে চব্বিশ জন জৈন তীর্থংকরের মূর্তি একটা বাঁধাবাঁধি রীতি অনুসারে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক ইহার পূর্বের যুগে এতটা বাঁধাবাঁধি ছিল না।

জৈন ধর্মের প্রাচীনতম যুগে জৈনদিগের উপাস্য দেবতা কি ছিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত আয়পট বা আয়াগপটগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত। মথুরায়, কৌশাম্বীতে অথবা অহিচ্ছত্রে কোনও জৈন স্ত্রী বা পুরুষ একটি 'আয়পট' প্রতিষ্ঠা করিলেন। 'আয়পট'টি একখানি বড় শিলাপট্ট, তাহার উপরে অনেক নক্সা আছে। প্রথমে একটি চারকোণ নক্সা, এই নক্সার দুই দিকের অথবা চারদিকের পাড়ে আট, বার বা ষোলটি মঙ্গলচিহ্ন আছে। পট্টের মধ্য স্থলে এক বা ততোধিক বৃত্ত, তাহার ভিতরে চারিটি অথবা চারি জোড়া মৎস্যপুচ্ছ চারিদিকে সাজানো। [এগুলি মৎস্যপুচ্ছ নহে, ত্রিরত্ন। —সম্পাদক] এই মৎস্যপুচ্ছ একটি মঙ্গল চিহ্ন। সাধারণতঃ এই চারিটি মৎস্যপুচ্ছের কেন্দ্র স্থলে একটি গোলাকার স্থানের মধ্যে একটি উপবিষ্ট জিন মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যীশু খৃষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্বে সিংহক বণিকের পুত্র এবং কৌশিকী-গোত্রীয়া মাতার সন্তান সিংহ-নাদিক মথুরায় যে আয়াগপট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাতে এই রকম ব্যবস্থা দেখা যায়। এ পট্টটির উপরে চারিপাশে চারিটি চারিকোণা সরু পাড় আছে। উপরের দুইটিতে চারিটি করিয়া মঙ্গলচিহ্ন ও পাশের দুইটিতে কেবল দুইটি স্তম্ভ অঙ্কিত হইয়াছিল। পট্টের উপরে যে চারিকোণে জায়গাটুকু

রহিল তাহার নীচের দিকে একটু পাড় কাটিয়া লইয়া দাতার পরিচয় লিখিবার জায়গা করা হইল এবং অবশিষ্ট চতুষ্কোণটুকু মধ্য স্থলে একটি বৃত্ত ও তাহার চারিপার্শ্বে চারিটি যুগ্ম মৎসপুচ্ছ অঙ্কিত হইল। মধ্য স্থলের বৃত্তের মধ্যে পদ্মাসনের উপরে ধ্যান-মুদ্রায় উপবিষ্ট ছত্র নিম্নে একটি নগ্ন জিন তীর্থংকর মূর্তি।[২]

বিশেষ বিশেষ নমুনায় নক্সা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় আর্যপট্টের পাড়ে অর্দ্ধ-অশ্বী-কিন্নরী, ভিতরের চারিকোণের প্রতি কোণে অর্দ্ধ-মৎস্য-কিন্নর, বৃত্তের গোলে একশ্রেণী যুবতী ও কেন্দ্রে জিন অথবা তীর্থংকরের পরিবর্তে অর্হন নেমিনাথের লাঞ্ছন একটি রথচক্র অঙ্কিত আছে। [লেখক যাহাকে রথচক্র বলিতেছেন তাহা ধর্ম চক্র। রথচক্র নেমিনাথের লাঞ্ছনও নহে। নেমিনাথের লাঞ্ছন শংখ। —সম্পাদক] এই আর্যপট্টের উপরের শিলালেখ সম্পূর্ণ পড়িতে পারা যায় না।[৩] মথুরায় আবিষ্কৃত তৃতীয় আর্যপট্টটি অন্য রকমের। ইহার মধ্যস্থলে একটি বৃহত্তর বৃত্তের মধ্যে একটি ছোট কেন্দ্র বা বৃত্ত আছে এবং এই ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে পদ্মাসনের উপরে একটি জিন মূর্তি ও বাহিরে চারি জোড়া মৎস্যপুচ্ছ অঙ্কিত। এই চারি জোড়া মৎস্যপুচ্ছের বাহিরে প্রথমে বৃত্ত এবং তাহার বাহিরে চারিদিকে চারিটি লম্বা মৎস্যপুচ্ছ। চিংড়ি মাছের লেজের মত এই চারিটি লম্বা মৎস্যপুচ্ছ বাঁকিয়া আছে এবং এই চারিটির গর্ভে চারিটি মঙ্গল চিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। (১) স্বস্তিক, (২) মৎস্য-যুগ্ম, (৩) ঘটিকা, (৪) ভদ্রাসন। এই চারিটি মৎস্যপুচ্ছের বাহিরে অপ্সরাদিগের স্কন্ধে বাহিত একটি মালা; কিন্তু এই মালার সমান্তরাল (১) জিনমূর্তি, (২) আর্যবৃক্ষ, (৩) স্তূপ, (৪) মন্দির। এই মালার বৃত্তের বাহিরে চারিকোণে চারিটি নাগিনী এবং তাহাদের নীচে একটি লম্বা পাড়ের উপরে আটটি মঙ্গল চিহ্ন।[৪] মোটের উপর দেখিতে পাওয়া যায় অধিকাংশ আর্যপট্ট বা আর্যাগ্রপট্টের কেন্দ্র স্থলে একটি বৃত্তের মধ্যে

২ V. A. Smith, *The Jaina Stupa and Other Antiquities of Mathura*, P. 15, Pl. VIII.

৩ *Ibid.*, Pl. VIII.

৪ *Ibid.*, P. 16, Pl. IX ; *Epigraphia Indica*, Vol II, Pp. 311-13.

জিনের মূর্তি, দুই একটি আর্যাপট্টের উপরে এই বৃত্তের মধ্যে জিন মূর্তির পরিবর্তে জিনের লাঞ্ছন বা চিহ্ন, যেমন মথুরায় আর্যপট্টের উপরে অর্হন নেমিনাথের মূর্তির পরিবর্তে তাঁহার চিহ্ন বা লাঞ্ছন—রথচক্র, কৌশাম্বীর আর্যপট্টের উপরে কৌশাম্বীতে জাত ষষ্ঠ তীর্থংকর পদ্ম-প্রভের লাঞ্ছন—একটি ফুল্লাজ।

মথুরার নানাস্থানে আবিষ্কৃত আরও কতকগুলি আর্যপট্ট অন্য প্রকারের। কোনটিতে জৈন মন্দির অথবা জৈন স্তূপ অঙ্কিত আছে। এই জাতীয় নিদর্শন হইতে সর্বপ্রথম প্রমাণ হইয়াছিল যে, প্রাচীন জৈন ধর্মের আদিম অবস্থাতে বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় স্তূপের উপাসনাও বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। পরে ১৮৯৮ সালের খনন কালে মথুরাতে একটি জৈন স্তূপ আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণ হইয়াছিল যে স্তূপ বা চৈত্য হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা জৈন, ভারতীয় কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। পুরাতন স্তূপগুলি পুরাতন জৈন মূর্তির মত আর্যপট্টের উপর অঙ্কিত হইয়া মন্দিরে অথবা বৃক্ষতলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। জিনমূর্তি যুক্ত, জিনের লাঞ্ছন যুক্ত, অথবা স্তূপ যুক্ত কোন আর্যপট্টেই কোন রূপ প্রভেদ লক্ষ্য করিবার উপায় নাই, সকলেরই শিলালেখে এক কথায় দেখিতে পাওয়া যায়, "নমো অরহতো নম ফগুযশস নতকস ভয়াযে শিবযশাযে আয়াগপটো কারিতো অরহত পূজাযে।" ইহাতে জিনের মূর্তি, জিনের চিহ্ন ইত্যাদি কিছুই নাই। রেলিং-এ বেষ্টিত একটি স্তূপ, তাহার সম্মুখে তোরণ এবং তোরণের সম্মুখে সিঁড়ি, তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটী অর্দ্ধবিবস্ত্রা নারী, ইহাই অর্দ্ধ-ভগ্ন মথুরা আর্যপট্টের বিবরণ।

বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস হইতে ভারতীয় জৈন ধর্মের আদিম যুগ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা আর্যপট্ট বা আর্যাগ্রপট্ট লইয়াই আরব্ধ। বর্তমান জৈনেরা স্তূপের উপাসনা বড় করেন না, করিলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে করিয়া থাকেন। সুতরাং জৈন স্তূপের আলোচনা বাদ দিয়া মধ্য যুগের জৈন ধর্মের আলোচনা করিতে যাওয়া অসম্ভব।

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

গৌতমকে আসতে দেখে কেশী উঠে দাঁড়ালেন ও তাঁকে যথোচিত সমাদরে আসনে নিয়ে এসে বসালেন। অন্যান্য শ্রমণেরাও যথোচিত আসন গ্রহণ করল।

তীর্থংকর পার্শ্বনাথ ও বর্দ্ধমানের শ্রমণ সম্প্রদায়ের এই একত্র সমাবেশ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তাই এই সম্মিলনের খবর পেয়ে অন্য তীর্থিক সাধু ও গৃহস্থরাও তা দেখবার ও তাঁদের আলোচনা শুনবার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হল।

সকলে আসন গ্রহণ করলে বিনয় বিনম্র কণ্ঠে কেশী বললেন, মহাভাগ গৌতম, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করি।

গৌতম বললেন, পূজ্য কুমার শ্রমণ, আপনার যা জিজ্ঞাস্য তা আপনি সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

কেশী বললেন, আর্য, মহামুনি পার্শ্বনাথ চতুর্যাম ধর্মের নিরূপণ করেছিলেন আর ভগবান বর্দ্ধমান পঞ্চযাম ধর্মের। এই মতভেদের কারণ কী, যখন উভয়েই একই মোক্ষমার্গের অনুযায়ী। গৌতম, এই মতভেদ দেখে আপনার মনে কি কোনো সংশয় বা শঙ্কার উদয় হয় না?

চতুর্যাম ধর্মে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ পালনীয়। পঞ্চযাম ধর্মে এই চারিটির সঙ্গে ব্রহ্মচর্যও।

গৌতম বললেন, পূজ্য কুমার শ্রমণ, ধর্মতত্ত্বের উপদেশ মানুষের বুদ্ধি ও সামর্থ্যানুযায়ী হয়ে থাকে। তাই যে সময়ে যে ধরণের মানুষ জন্মায় সেই সময় তাদের বুদ্ধি ও সামর্থ্যানুযায়ী ধর্ম তত্ত্বের উপদেশ হয়। প্রথম তীর্থংকরের সময় মানুষ সরল ছিল কিন্তু জড়বুদ্ধি তাই তাদের পক্ষে আচারমার্গ শুদ্ধ রাখা কঠিন ছিল। আবার আজ শেষ তীর্থংকরের সময় মানুষ কুটিল ও জড়বুদ্ধি।

তাই তাদের পক্ষেও আচার মার্গ শুদ্ধ রাখা কঠিন। এই জন্যই প্রথম ও শেষ তীর্থংকর পঞ্চযাম ধর্মের উপদেশ দেন যাতে সমস্ত কিছু তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ের মানুষের এর প্রয়োজন হয় না। তারা সরল ও চতুর হয় বলে সহজেই ধর্মতত্ত্বের উপদেশ বুঝতে পারে ও তা পালন করতে সমর্থ হয় এজন্য মধ্যবর্তী তীর্থংকরেরা চতুর্যাম ধর্মের উপদেশ দেন। ব্রহ্মচর্য যে অপরিগ্রহ পালন করে তার অবশ্যই পালনীয় তা পৃথক করে বলতে হয় না।

কেশী বললেন, গৌতম, আপনাকে ধন্যবাদ। আমার সংশয় দূর হয়েছে, আমার দ্বিতীয় সংশয় এখন উপস্থিত করি। ভগবান বর্দ্ধমান অচেলক থাকেন ও তাঁর বহু শিষ্যও অচেলক থাকে। কিন্তু মহাযশস্বী পার্শ্বনাথ সচেলক ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন। এই প্রভেদের কারণ কি ?

গৌতম বললেন, কেশী, ধর্মের সাধনা জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত, বাহ্যবেশ বা চিহ্নের ওপর নয়। বাহ্য বেশ ও চিহ্ন ত পরিচয় ও সংযম নির্বাহের জন্য। তাই কেউ যদি নির্বস্ত্র থাকে কি সবস্ত্র তাতে কিছু যায় আসে না। নির্বস্ত্র হলেই মোক্ষ হবে সবস্ত্র হলে হবে না এমনো নয়। তবু ভগবান বর্দ্ধমান যে অচেলক থাকেন বা তাঁর শ্রমণ সম্প্রদায়ের একটা অংশ অচেলক থাকে তার কারণ এ কালের মানুষ জড় বুদ্ধি বলে অপরিগ্রহ বলতে যে সর্বত্যাগ তা বোঝাবার জন্য। তিনি কি আবার বলেন নি, বস্ত্রাদি স্থূল পদার্থ রাখা পরিগ্রহ নয়, পরিগ্রহ তাতে আসক্তি। সংযমী পুরুষের বস্ত্রাদি উপকরণ নেওয়া বা রাখায় মমত্ব নেই। সে তো দূরের নিজের শরীরে পর্যন্ত তাঁদের মমত্ব থাকে না।

কেশী বললেন, সাধু! সাধু! আমার এ সংশয়ও দূর হয়েছে। কিন্তু আমি আপনাকে আরো কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি।

গৌতম বললেন, কেশী, আপনি তা সচ্ছন্দে করতে পারেন।

কেশী বললেন গৌতম, আপনি হাজার হাজার শত্রুর মধ্যে বাস করেন। এবং তারা সর্বদাই আপনাকে অভিভূত করবার চেষ্টা করছে। আপনি তাদের কিভাবে নির্জিত করে সচ্ছন্দে বিচরণ করেন ?

গৌতম বললেন, কেশী, আমি প্রথমে একজন শত্রুকে নির্জিত করি।

একজন শত্রুকে নির্জিত করলে পাঁচজন শত্রু নির্জিত হয়। পাঁচজন শত্রু নির্জিত হলে দশজন শত্রু নির্জিত হয়। দশজন শত্রু নির্জিত হলে সমস্ত শত্রুই নির্জিত হয়।

কেশী বললেন, সেই শত্রু কারা ?

গৌতম বললেন, কেশী, মনই প্রথম ও প্রধান শত্রু। তাকে জয় করলে ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই পাঁচ শত্রু জিত হয়। এই পাঁচ শত্রু জিত হলে এই পাঁচ ও পাঁচ ইন্দ্রিয় সহ দশ শত্রু জিত হয়। দশ শত্রু জিত হলে সমস্ত শত্রুই জিত হয়। এভাবে সমস্ত শত্রুকে পরাজিত করে আমি সচ্ছন্দ বিচরণ করি।

এভাবে কেশী গৌতমকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন আর গৌতম তার প্রত্যুত্তর দিতে লাগলেন। সমস্ত দিন ধরে প্রশ্নোত্তর চলল।

এক সময় কেশী বললেন, গৌতম, সংসারে সমস্ত জীবই যখন গাঢ় অন্ধকারে মগ্ন তখন কে তাদের পথ দেখাবে, আলো দেবে ?

গৌতম বললেন, কেশী, সমস্ত সংসারকে আলো প্রদানকারী সূর্য উদিত হয়েছে। সেই সূর্যই সমস্ত প্রাণীকে পথ দেখাবে, আলো দেবে।

গৌতম, কে সেই সূর্য ?

কেশী, বিগত-তৃষ্ণ সর্বজ্ঞ তীর্থংকরই সেই সূর্য। সেই সূর্য উদিত হয়েছে।

ভগবান বর্দ্ধমানই সেই সূর্য।

গৌতম ও কেশীকুমারের এই বার্তালাপের প্রভাব পড়ল সকলের মনে। পার্শ্বাপত্য ও বর্দ্ধমানের অনুযায়ী শ্রমণদের মনের সংশয় ও শঙ্কা গলে গলে গেল। তারা পরস্পরের আরো নিকটে এল। তারপর এক সময় এই দুই সম্প্রদায় এক হয়ে গেল।

বর্দ্ধমানও ওদিকে ততদিনে নানাস্থানে প্রব্রজন করে শ্রাবস্তী এসে উপস্থিত হলেন তারপর সেখানে কিছুকাল বাস করে পাঞ্চালের দিকে চলে গেলেন। পাঞ্চাল হতে এলেন কুরুতে। কুরুদেশের রাজধানী হস্তিনাপুরের সহস্রাম্রবন উদ্যানে তিনি অবস্থান করলেন।

গৌতম একদিন ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে শিব রাজর্ষির কথা শুনে এলেন যিনি

কিছুদিন আগে রাজ্য পরিত্যাগ করে তাপস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখন তাঁর বিভঙ্গ জ্ঞান হওয়ায় সাত দ্বীপ ও সাত সমুদ্র পর্যন্ত তিনি দেখতে পান। সেই বিভঙ্গ জ্ঞানে তিনি এখন বলতে আরম্ভ করলেন সংসারে মাত্র সাতটী দ্বীপ ও সাতটী সমুদ্রই রয়েছে।

গৌতম সেকথা শুনে এসে বর্দ্ধমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, শিব রাজর্ষির কথা কি সত্য ?

বর্দ্ধমান বললেন, শিব রাজর্ষির কথা সত্য নয়। সংসারে অসংখ্য দ্বীপ ও সমুদ্র রয়েছে।

লোক মুখে বর্দ্ধমানের উক্তি শিব রাজর্ষির কানে গিয়ে পৌছল। বর্দ্ধমান সর্বজ্ঞ তীর্থংকর সেকথা তিনি জানতেন। তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল। তাই নিজের জ্ঞান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে হস্তীনাপুরের মধ্যে দিয়ে সহস্রাম্রবনে বর্দ্ধমান যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বর্দ্ধমান তাঁর সংশয় নিরসন করে নিগ্রর্ন্থ ধর্মের উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে শিব রাজর্ষি বর্দ্ধমানের কাছে শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

বর্দ্ধমান হস্তীনাপুর হতে গেলেন মোকায়। মোকা হতে আবার ফিরে গেলেন বাণিজ্য গ্রামে। সেই বছরের চাতুর্মাস্য বাণিজ্যগ্রামেই ব্যতীত করলেন।

চাতুর্মাস্য শেষে বাণিজ্যগ্রাম হতে বর্দ্ধমান গেলেন রাজগৃহে।

রাজগৃহে গুণশীল চৈত্যে অবস্থান করলেন।

রাজগৃহে নিগ্রর্ন্থ শ্রাবক সংখ্যা অধিক হলেও অন্যতীর্থিক শ্রাবকেরাও থাকে। তারা সময়ে সময়ে এমন সব প্রশ্ন উপস্থিত করত যাতে অন্য সম্প্রদায়কে নীচু হতে হয়। একবার আজীবিক সম্প্রদায়ের শ্রমণোপাসকেরা গৌতমকে প্রশ্ন করল, ভগবন্, আপনাদের শ্রাবক যখন সামায়িক করে তখন যদি তার বাসন-কোসন ঘটী-বাটী কেউ চুরী করে নিয়ে যায় তবে কি সামায়িক শেষে সে তাদের খোঁজ করবে ? যদি করে তবে কি সে তার নিজের দ্রব্যের খোঁজ করে না অন্যের দ্রব্যের।

তাৎপর্য এই যে সামায়িক নেবার সময় প্রত্যাখ্যানে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করে সমভাবী হয়ে সে অবস্থান করে। সেই সময় তার জিনিষ তার

থাকে না। তাই সেই সময় যদি কেউ চুরী করে তবে তার জিনিষ চুরী করেছে সেকথা বলা যায় না।

প্রশ্নটি কূট। কিন্তু বর্দ্ধমান তার এভাবে সমাধান দিলেন: ব্রতী দশায় সে প্রত্যাখ্যান করলেও সেই বিষয়ে তার সম্পূর্ণ মমত্ব যায় না। সেই জন্য সেই বিষয়ও অন্যের হয়ে যায় না। তাই সামায়িক শেষে যদি সে সেই বিষয়ের খোঁজ করে তবে সে নিজের বিষয়েরই খোঁজ করে। অন্যের নয়।

আজীবিক সম্প্রদায়ের শ্রাবকেরা সে উত্তর শুনে নিরুত্তর হয়ে গেল।

বর্দ্ধমান সেই বর্ষাবাস রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন। তারপর পৃষ্ঠচম্পা হয়ে চম্পায় এলেন। চম্পা হতে দর্শার্ণপুর হয়ে তিনি আবার বাণিজ্যগ্রামে ফিরে গেলেন।

[ক্রমশ:
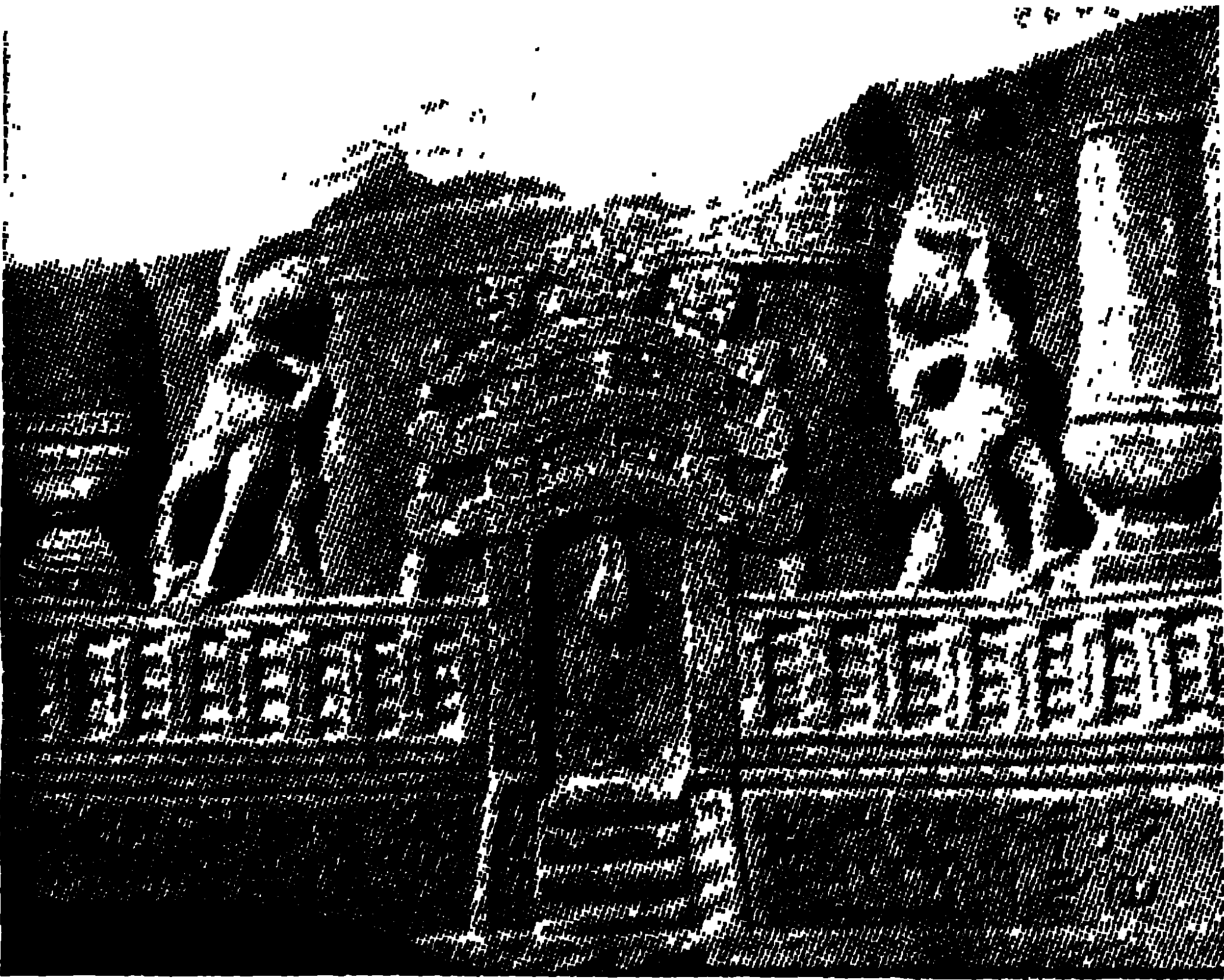
শিবযশা প্রতিষ্ঠিত আয়াগপট, মথুরা

মহাবীর বলেছিলেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

আত্মা সম্বন্ধীয়

সংযম পালন
বালুকা ভক্ষণের মতো নীরস
ও অসিধারার ওপর
বিচরণের মতো কঠিন।

যে দুর্বল-চিত্ত
তার পক্ষে
থলেয় বাতাস ভরার মতো
তা দুষ্কর।

তবু যে নিজেকে
জয় করতে পারে
সে পাঁচটি ইন্দ্রিয়
ও ক্রোধ মান মায়া ও লোভের ওপর
বিজয় লাভ করে।

তাই নিজের শক্তি ও সামর্থ্য,
শ্রদ্ধা ও ধারণা,
স্থান ও কাল অবগত হয়ে
আত্ম জয়ে তৎপর হও।

যুদ্ধে যে হাজার হাজার
শত্রুর ওপর জয় লাভ করে

তার চাইতে যে নিজের ওপর
জয় লাভ করে সে শ্রেষ্ঠ।

বাইরের শত্রুর সঙ্গে
যুদ্ধ করে কি লাভ ?
নিজের সঙ্গে যুদ্ধ কর।
নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে
যে জয়ী হয়, সে সুখী হয়।

নিজেকে জয় কর—
কারণ নিজেকে জয় করা
সব চাইতে কঠিন।
যে নিজের ওপর জয় লাভ করে,
সে ইহ ও পর জীবনে সুখী হয়।

অন্যের দ্বারা বন্ধন
ও মৃত্যুর চাইতে
সংযমের দ্বারা
নিজের ওপর জয় লাভ করা শ্রেষ্ঠ।

ডিম হতে যেমন বলাকার উদ্ভব হয়,
বলাকা হতে ডিমের,
তেমনি মোহ হতে তৃষ্ণার উদ্ভব হয়,
তৃষ্ণা হতে মোহের।

কর্মের মূলে রয়েছে
রাগ ও দ্বেষ,
মোহ হতে তাই কর্মের উদ্ভব।

কর্ম জন্ম ও মৃত্যুর কারণ,
জন্ম ও মৃত্যুই ত দুঃখ ?

যার মোহ নেই তার দুঃখ নেই,
তার মোহ নেই যার তৃষ্ণা নেই,
যার লোভ নেই তার তৃষ্ণা নেই,
তার লোভ নেই যে অকিঞ্চন।

অকিঞ্চন হও,
দেহের যা প্রীতিকর
তা কর পরিহার,
জয় কর তৃষ্ণাকে,
তা হলেই দেখবে তোমার দুঃখ নেই।
রাগ ও দ্বেষ কর জয়,
ইহ জীবনেই অনুভব করবে আনন্দ।

যার কোনো কিছুতে মমতা নেই
সে জয় করেছে মমত্বকে,
যার মমত্ব নেই
সেই যথার্থ মুনি।

সে নির্মম ও নিরহংকার,
নিঃসঙ্গ ও কষায়হীন,
ত্রস ও স্থাবর
সমস্ত জীবে সে সমদর্শী।

সে লাভ ও অলাভে,
দুঃখ ও সুখে,

জীবন ও মৃত্যুতে,
নিন্দায় ও প্রশংসায়
সর্বদাই সম।

সে আহার ও অনাহারে,
স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যে,
ইহলোক বা পরলোকে
সর্বদাই সম।

সম তাই
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের
বিষয় হতে
তোমার মনকে
সরিয়ে নাও।

শব্দ কানের বিষয়,
শব্দ যখন কানে এসে পড়ে
তখন না শুনে তুমি পার না।
তাই যা শুনছ
তাতে পরিহার কর
তোমার অনুরাগ ও বিরাগ।

রূপ চোখের বিষয়,
রূপ যখন চোখে এসে পড়ে
তখন না দেখে তুমি পার না।
তাই যা দেখছ
তাতে পরিহার কর
তোমার অনুরাগ ও বিরাগ।

গন্ধ নাকের বিষয়
গন্ধ যখন নাকে এসে পড়ে
তখন ঘ্রাণ না নিয়ে তুমি পার না।
তাই যা ঘ্রাণের বিষয়
তাতে পরিহার কর
তোমার অনুরাগ ও বিরাগ।

রস জিহ্বার বিষয়,
রস যখন জিহ্বায় এসে পড়ে
তখন আস্বাদ না করে তুমি পার না।
তাই যা আস্বাদ কর
তাতে পরিহার কর
তোমার অনুরাগ ও বিরাগ।

স্পর্শ ত্বকের বিষয়,
স্পর্শের বিষয় যখন ত্বকের সম্পর্ক আসে
তখন স্পর্শ না করে তুমি পার না।
তাই যা স্পর্শ করছ
তাতে পরিহার কর
তোমার অনুরাগ ও বিরাগ।

রাগ ও দ্বেষ
যা অনুরাগ বিরাগই
যখন কর্মের মূলে,
তখন যে এদের পরিহার করে
সে সংসার চক্রে আবর্তিত হয় না।

[ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

কিন্তু আচার্যের এই উপদেশের আজ আর অবসর ছিল না। অন্য দিন যদি তিনি এই উপদেশ তাকে দিতেন তবে হয়ত সে তার আদর করত, হয়ত জীবনে তা রূপায়িত করবার প্রযত্নও করত। কিন্তু আচার্যের এই উপদেশ আজ অনেক বিলম্বে প্রদত্ত হল। অগ্নিশর্মা তখন বৈরের বিপরীত পথে চলতে সুরু করে দিয়েছে। গুণসেনকে যেমন করেই হোক অধঃপতনের চরমসীমায় পৌছে দেওয়াই এখন তার একমাত্র ধ্যেয়।

কিন্তু অন্যকে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছে দিতে গেলে নিজেকেও যে সে পথ মাড়াতে হয়। গুণসেনের সর্বনাশ ইচ্ছাকারী অগ্নিশর্মা যে গুণসেনের পূর্বেই অধঃপতনের চরম সীমায় পৌছে যাবে অগ্নিশর্মার তখন সে বোধও ছিল না।

অগ্নিশর্মা আচার্যের কথার যে প্রত্যুত্তর দিল তাতে তিনি হতাশ হয়ে গেলেন। সে বলল, আমি আর গুণসেনের মুখও দেখতে চাই না। ও আমার আজকের শত্রু নয়। আমি ভেবেছিলাম ও পূর্ব শত্রুতা ভুলে গেছে ও আমাকে সম্মানিত করতে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু সে আমাকে তিন তিন বার আমন্ত্রণ করে যে অপমান করেছে আমি তার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না। বৈররূপ বিষে আমার আকণ্ঠ ভরেই ওঠে নি তা এখন ছলকেও পড়ছে। আপনি যে শান্তি ও ক্ষমার কথা বলছেন, আমি তার উপাসনা করেও দেখেছি। তাতে বৈরর এই বিষ ছাড়া আর কিছু পাইনি। সেই বিষ আজ আমি সানন্দে পান করেছি। এতে যদি আমি বিনষ্ট হয়ে যাই তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু ওকে আমি বুঝিয়ে দিয়ে যাব, এ জীবনে না পারি ত পরবর্তী জীবনে। আমার আর হারাবারই বা কি আছে?

আচার্যের মনে হল অগ্নিশর্মার কাছে আজ তপস্যারও কোনো মূল্য নেই। বৈর নির্যাতনের বৃত্তি আজ তাকে উন্মত্ত করে দিয়েছে। অন্তঃশুদ্ধি বিহীন তপস্যা মানুষকে যে কোন গহ্বরে টেনে নিয়ে যায় তা কে জানে! অগ্নিশর্মা তপশ্চর্যার শক্তি ও গৌরবকে কালজ্বরে পরিণত করে ফেলেছে। অগ্নিশর্মাকে বাঁচানো আজ আর সহজ নয়।

বৃদ্ধ কৌণ্ডিন্য তাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ফিরে যাবার আগে আবারো বললেন, অগ্নিশর্মা, তুমি কি শেষ নিশ্চয় করে নিয়েছ? তুমি গুণসেনকে ক্ষমা করবার মতো উদারতা কি দেখাতে পারোনা? আমি তোমার হিতৈষী রূপেই বলছি, তপস্যায় তুমি যে সিদ্ধি লাভ করেছ তা হেলায় এভাবে বিনষ্ট করো না।

অগ্নিশর্মা এর প্রত্যুত্তরে বলল, আপনি ত জানেন আমার সঙ্কল্প অটল হয়। আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এইভাবে এই দর্ভাসনে বসে আমার দেহ ত্যাগ করব। আমি গুণসেনকে ক্ষমা করতে পারি না। যা হবার তা হোক। আমার একমাত্র সঙ্কল্প—প্রতিশোধ।

অগ্নিশর্মাকে আর কিছু বলার আচার্যেরও ছিল না। কিন্তু তপস্যার এই অধঃপাত তাঁর মুখে এক গভীর কালিমা পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে গেল।

আচার্য কৌণ্ডিন্য গুণসেনকে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে বললেন। সে যদি এখন তার কাছে যায় তবে তা আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করবে—এই বলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। গুণসেন নিজের ভুলের পশ্চাত্তাপ করতে করতে ও মনে মনে অগ্নিশর্মার ক্ষমা যাচনা করতে করতে প্রাসাদে ফিরে গেল।

অগ্নিশর্মা যে ইহজীবনে গুণসেনের কোনো অনিষ্ট করতে পারে তার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তাই সেই দর্ভাসনে বসে সেইভাবে অনাহারে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিল। কিন্তু জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করবার সময়ও সে অন্তরের ক্রোধ বিনষ্ট করতে পারল না—অনুশোচনা, আলোচনা, ক্ষমা—এর কোনোটিই সে স্বীকার করল না, বৈর নির্যাতনের ভাবনা নিয়েই সে দেহ ত্যাগ করল।

গুণসেন সেকথা শুনল। নিজের ভুলের জন্য তার পশ্চাত্তাপও হল কিন্তু সে আজ নিরুপায় ছিল। একদিন কৌতূহল প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে সে

অগ্নিশর্মাকে নির্বাতিত করেছে। অন্য সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে না হলেও নিজের অসাবধানতার জন্য তাকে ক্ষুধার পীড়ায় ব্যথিত করেছে।—এরই ভাবনা থেকে থেকে তার অন্তরকে ব্যথিত করতে লাগল। শ্বশুরের রাজ্যও এখন তার অরুচিকর বলে মনে হতে লাগল। সে তখন স্বরাজ্যে ফিরে গিয়ে আত্ম-সাধনায় মগ্ন হবে স্থির করল।

॥ ৯ ॥

জ্ঞানের অজীর্ণ যেমন অভিমান, তপস্যার অজীর্ণ তেমনি ক্রোধ। অগ্নিশর্মা সেই ক্রোধেরই বশীভূত হল। তবু তপস্যার প্রভাবও একেবারে নিষ্ফল যায় না। তাই সে বিদ্যুৎকুমার দেবতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করল। কিন্তু সেখানেও সে শান্তি লাভ করতে পারল না। তাকে ত তার বৈর-বৃত্তিকেই পরিতৃপ্ত করতে হবে।

গুণসেন প্রমাদ বশে যে সমস্ত ভুল করেছিল তার বিষয়ে সর্বদা জাগরূক ছিল। রাজ্য পরিচালনা সে করত কিন্তু অগ্নিশর্মার প্রতি যে সে অন্যায় করেছে তা কখনো ভুলতে পারত না। অবসর সময়ে সে যখন একা থাকত সেই ভাবনা বৃশ্চিক দংশনের মতো তার সমস্ত শরীরে এক জ্বালা পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে যেত। কি ভাবে, কি নিয়মে, কোন সূত্রে এই সব ঘটনা ঘটে ছিল সে কথাও সে চিন্তা করত। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে সে উপনীত হতে পারত না।

সেই সময় সেখানে এক তত্ত্বদর্শী পুরুষের আবির্ভাব হল। গুণসেন তাঁর কাছে তার হৃদয়ের কথা অকপটে খুলে বলল। তিনি গুণসেনকে কর্ম বৈচিত্র্যের বিষয়ে উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশ তার জীবনে এক রূপান্তর এনে দিল। সংসারকে সে এখন এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তার চোখের সামনে অজ্ঞানের যে পাতলা আবরণ ছিল তা যেন সহসা অপসারিত হয়ে গেল।

গুণসেনের হৃদয়ে এখন শান্তি, মৈত্রী ও ক্ষমার অনুরণন। সেই অনুরণনে দিব্য ভাবনায় সে ধ্যানের গভীরতায় ডুবে যেতে লাগল। সেই জন্মেই তার জন্মান্তর ঘটে গেল।

একদিন গুণসেন যখন মৈত্রী ভাবনায় ধ্যানের গভীরতায় ডুবে যাচ্ছিল সেদিন সহসা বিদ্যুৎকুমাররূপী অগ্নিশর্মা তাকে দেখতে পেল। তার পূর্ব বৈরের কথা মনে হওয়ায় গভীর আক্রোশে সে বিদ্যুৎ হয়ে তার ওপরে এসে পড়ল। মুহূর্তে বিদ্যুতের আগুনে গুণসেনের সমস্ত শরীর ঝলসে গেল। কিন্তু তার ক্ষমা ও মৈত্রী ভাবনা হতে সে একটু মাত্র বিচলিত হল না।

গুণসেন সেভাবে মৃত্যুবরণ করে সৌধর্ম দেবলোকে দেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করল।

[ক্রমশঃ

পাওপুরী

নবীনচন্দ্র সেন

জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সমাধি এই পাওপুরী গ্রামে। একটি বিস্তৃত সরোবরের মধ্যস্থলে তাঁহার সমাধি-মন্দির বিরাজিত। তাহাতে যাতায়াতের জন্য একপার্শ্বে তীর পর্যন্ত একটা প্রস্তর নির্মিত সেতু আছে। সরোবরটি জলজ কুসুম ও জলজ কুসুমসদৃশ বহুবিধ জলচর পক্ষী ও মৎস্যে পরিপূর্ণ। অহিংসাধর্মের এমনই মাহাত্ম্য যে, এই পক্ষিকুল ও মীনকুল মানুষ দেখিলে পলায়ন না করিয়া, বরং ছুটিয়া আসিয়া তাহার হস্ত হইতে আহার্য বস্তু আহার করে। সরোবরে যখন কমল কুমুদ প্রভৃতি জলজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে নানাবিধ জলচর পক্ষী সন্তরণ করিতে থাকে, তখন তাহার যে কি শোভা হয়, তাহা অবর্ণনীয়। জৈনদের জীবে দয়াই ধর্ম। উহা তাঁহারা এতদূর কার্যে পরিণত করেন যে, চৈত্র বৈশাখ মাসে যদি অনাবৃষ্টিবশতঃ জলাশয়ের জল শুষ্ক হইয়া উঠে, তাঁহারা গ্রামের ইন্দারা হইতে জল আনিয়া মৎস্যাদির জীবন রক্ষা করেন। তাঁহারা এই গ্রামটি কিনিয়া লইয়াছেন, এবং প্রজাদের পাট্টাতে এরূপ লিখিয়া লইয়াছেন যে, তাহারা গ্রামের চারি সীমার মধ্যে মৎস্য মাংস আহার করিতে পারিবে না এবং কোন জীব-হত্যা করিতে পারিবে না। জৈনদের এই গ্রামে আরও কয়েকটি শ্বেতমর্মর নির্মিত অতিশয় সুন্দর দেবালয় আছে; এবং তাহাতে শ্বেতমর্মর নির্মিত এবং বহুরত্নখচিত তীর্থঙ্কর দেবমূর্তি স্থাপিত আছে। এই সকল মন্দিরের সজ্জা, প্রাঙ্গন ও উদ্যান দেখিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়। ইহাদের তত্ত্বাবধারণের জন্য গ্রামে একটি 'পঞ্চ' আছে, এবং যাত্রীদের জন্য একটি সুন্দর ধর্মশালা আছে। সমস্ত স্থানটি পরিষ্কার, পবিত্র ও শান্তিপ্রদ। আমাদের হিন্দু তীর্থগুলি ইহার তুলনায় এক একটি নরক বলিলেও চলে।

বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ বর্ধিত হইলে, বৌদ্ধ যাজকেরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বৌদ্ধ ধর্মকে

নিরীশ্বরবাদে পরিণত করেন। এ কারণে ভক্তিপ্রাণ ভারতবাসী ইহার উপর ক্রমশঃ বিশ্বাসহীন হয়। তখন ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে ক্রমে ক্রমে বিষ্ণুর অবতারে, তাহার পর কৃষ্ণাবতারে এবং বৌদ্ধধর্মকে ক্রমে ক্রমে বর্তমান বৈষ্ণবধর্মে ও পরে তান্ত্রিক ধর্মে পরিণত করিলে, বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্মে রূপান্তরিত হইয়া ভারতবর্ষে আজ পূর্বগৌরবের ও প্রাবল্যের ছায়া রূপে বিরাজমান রহিয়াছে।* ইহার উপরও হিন্দুধর্ম প্রবর্তকগণ এরূপ বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, এখন যাবৎ হিন্দুগণ জৈনদের তীর্থ দর্শন করা দূরে থাকুক, তাহার নাম মাত্র করা মহাপাপ মনে করেন। আমার সবডিভিসনের ভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরেই পাওপুরীতে জৈনদের রথযাত্রার মেলা হয়। সকলে জানেন, আমাদের রথযাত্রা বৌদ্ধ ধর্ম হইতে গৃহীত। আমি রথ দেখিতে যাইব শুনিয়া, আমার একজন আমলা আমাকে মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিলেন, "কি হুজুর! পাওপুরীর রথ দেখিতে যাইতেছেন! এমন কার্য কখনও করিবেন না। সে 'সরাওক'দের (জৈনদের) তীর্থ। সেখানে হিন্দুর যাওয়া দূরে থাকুক, তাহার নাম করিলেও নরকে যাইতে হয়।" শীতের সময় যখন পাওপুরীতে শিবির প্রেরিত হইতেছে, তখন সেই আমলা আবার বলিলেন যে, উক্ত স্থানের সীমার মধ্যস্থিত আম্রকাননে শিবির স্থাপিত হইলে হিন্দু আমলা ও মোক্তারগণ নরকে যাইবার ভয়ে সে বাগানে তাহাদের রাওটি কখনও স্থাপন করিবেন না। আমি এবার তাঁহার নিষেধ না মানিয়া সেইখানে তাঁবু পাঠাইলাম। শিবিরে পৌছিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছি, এমন সময়ে কয়েকজন জৈন ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া, আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন যে, এই আমবাগান পাওপুরীর সীমার মধ্যে। এখানে মৎস্য মাংস আহার করিলে জৈনধর্মাবলম্বীরা বড় ব্যথিত হইবেন। এ কারণে কোন হাকিম পূর্বে এ বাগানে তাঁবু ফেলেন নাই। আমি তাঁহাদের বলিলাম যে, আমি যে কয়দিন সেই বাগানে থাকিব, মৎস্য মাংস গ্রহণ করিব না। তাঁহাদের তীর্থের প্রতি আমার ভক্তি আছে। সস্ত্রীক তীর্থ দর্শন করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মন্দিরের নিকট সেই বাগানে তাঁবু ফেলিয়াছি। তাঁহারা

* তৎকালে অনেকে জৈন ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্মের শাখা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ঐতিহাসিকভাবে জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম হইতে অনেক বেশী প্রাচীন। —সম্পাদক

অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বলিলেন, যদি আমার অনুমতি হয়, এ কয়দিন আমার জন্য মন্দির হইতে প্রসাদ আসিবে। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম এবং তাঁহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকিলে, তাঁহাদিগকে দুইবেলা আসিয়া আমার রন্ধনের রাওঠি দেখিয়া যাইতে বলিলাম। আমি তাঁহাদের সঙ্গেই মন্দির দেখিতে চলিলাম। সমস্ত মন্দির ও সমস্ত স্থান দেখিয়া ও মন্দিরে মন্দিরে সায়াহ্ন-আরতি দেখিয়া ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে শিবিরে ফিরিলাম। এমন সুন্দর সুরক্ষিত তীর্থস্থান আমি দেখি নাই। আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, স্ত্রীও ইতিমধ্যে পান্ধিতে মন্দিরে চলিয়া গিয়াছেন এবং রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলাম, তিনি মন্দিরাদি ও আরতি দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, সেই সরোবরস্থিত মহাবীর স্বামীর সমাধি-মন্দিরে তাঁহার সহিত কতকগুলি যাত্রী জৈন রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি এতক্ষণ সেখানে বসিয়া আরতি দেখিয়া, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে ছিলেন। তাহারা কিছুতেই তাঁহাকে আসিতে দিতেছিল না। এসকল রমণীরা পরদিবস হইতে দলে দলে আমার শিবিরে আসিত। সমস্ত দিন স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিত, এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের সঙ্গে তাঁহাকেও যাত্রী সাজাইয়া মন্দিরে লইয়া যাইত। প্রত্যহ দুইবেলা নিরামিষ আহার ও নানাবিধ লুচি, মালপো ও পিষ্টকাদি এরূপ বহুল পরিমাণে আসিত এবং তাহা এত উৎকৃষ্ট যে, যে দশদিন সেখানে ছিলাম, আমাদের রন্ধনকার্য করিতে হয় নাই। আমার ও পত্নীর প্রশংসায় স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমন কি, বেহার হইতে পর্যন্ত জৈন জমিদার ও মহাজনগণ আসিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আমার দেখাদেখি হিন্দু আমলা ও মোক্তার অনেকের নরকভীতি উড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা অনেকে এবার 'সরাওক'দের তীর্থ দর্শন করিয়া ও পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং তাহার বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এভাবে বড় আনন্দে পাওপুরীতে কাটাইয়া আসিলাম। তাহারপর প্রত্যেক বৎসর আমি এখানে দশদিন করিয়া সেরূপ আনন্দে কাটাইতাম।

আমার জীবন, তৃতীয় ভাগ, ১৩১৭, পৃ. ৩৩৬-৩৪০

পুস্তক পরিচয়

১। শ্রীসম্মেতশিখর : লেখক শ্রীমহেন্দ্রকুমার সিংঘী : প্রকাশক শ্রীজৈন সংস্কৃতি কলা মন্দির, কলিকাতা : মূল্য বারো টাকা।

ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ভারতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির গুরুত্ব স্বভাবতঃই অনুধাবনযোগ্য। এই সব প্রকাশনা জাতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস চেতনায় যে সহায়ক সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। নিভৃত গ্রামাঞ্চলে অথবা শৈল-শিখরে কিংবা অরণ্যের ছায়া-ক্রোড়ে ছড়িয়ে থাকা কীর্তিনিচয় অনুরাগী দর্শকের হৃদয়-কাননে বারংবার ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম উপলব্ধির শুভ্রতম পুষ্প-রাশিকে। বিভিন্ন পর্বের পুরাকীর্তিগুলি মনে করিয়ে দিতে পারে বসন্ত শেষের বেদনা যা'র তপ্ত শ্বাস নিষ্প্রভ করে কত ফলপুষ্প সমৃদ্ধ তরুরাজিকে, কিন্তু নির্গ্রন্থের পরম উপলব্ধি কিংবা ঋষিদের প্রতিবোধ এক শাশ্বত মহিমার জ্যোতিঃকেই বিকীর্ণ করে। লেখক শ্রীমহেন্দ্রকুমার সিংঘী এই পরম সত্যকেই তুলে ধরেছেন হিন্দী ভাষায় লিখিত "শ্রীসম্মেতশিখর" শীর্ষক এই সচিত্র পুস্তকে। বলাবাহুল্য চিরখ্যাত পারসনাথ অথবা পরেশনাথ পাহাড়ই জৈনদের নিকট সম্মেতশিখর নামে পরিচিত। ভারতীয় সভ্যতার শাশ্বত ধারার প্রেক্ষাপটে সম্মেত শিখরের পবিত্রতা এক পরম সাধনা ও মুক্তির প্রতীক স্বরূপ। এই পর্বতের অনন্ত পরিবেশেই একদা নির্বাণ প্রাপ্ত হ'য়েছেন ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে ২০ জন তীর্থংকর। পবিত্রতা-বোধের পরম উত্তরণ সম্ভব কৈবল্যমুখী সাধনার এমনই এক প্রাচীন তীর্থে। গ্রন্থের নানা স্থানে আলোচিত হ'য়েছে বিভিন্ন বিষয়ের তাৎপর্য ও পটভূমিকা। দীপ্ত প্রীতি-শিখায় উজ্জ্বল ও লাবণ্যময় ভাষায় পরিবেশিত হ'য়েছে সম্মেতাচলের ইতিহাস, মধুবনের মন্দির-কাহিনী ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী। এক সুবিন্যস্ত চিত্রমালার সাহায্যে লেখক তাঁর এমন এক অন্তরঙ্গ প্রেরণা ও উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন যা প্রকৃতই অতুলনীয়। পর্যটক মাত্রেই স্বীকার করবেন শ্রীসিংঘীর বর্ণনা ও অভিজ্ঞতার চমৎকারিত্ব। স্থানে স্থানে উপস্থাপিত বিষয়গুলি বিস্তৃত হবার

নয়। বরাকর নদীর বর্ণনায় প্রতিফলিত হ'য়েছে এক দিব্য সৌন্দর্যের আভাস। এই নদীই কি ঋজুবালুকা যার নীরব তট-প্রান্তে একদা 'তীর্থপতি শ্রীমহাবীর স্বামী' অনন্ত জ্ঞানের আধার স্বরূপ কেবলিত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন? সম্মেতশৈল অথবা সম্মেতাচল, মধুবন এবং ঋজুবালুকা যেন বাংলার সীমান্ত-সমীপের এমন এক একটি মহান ও চির-স্নিগ্ধ নিসর্গ-দৃশ্য যা' নির্বাণপ্রাপ্ত তীর্থংকরদের স্মৃতি-চারণে বন্দনারত ও অশ্রুময়।

২। শ্রীপাওয়াপুরী: লেখক শ্রীমহেন্দ্রকুমার সিংঘী: প্রকাশক শ্রীজৈন সংস্কৃতি কলা-মন্দির, কলিকাতা: মূল্য এগারো টাকা।

নিগ্রন্থ ধর্মের ইতিহাসে পাওয়াপুরী এমন এক মহাতীর্থ যা'র দিব্য মহিমা চিরঃস্মরণীয়। কোন পরমপুরুষের জীবন-গাথায় যখন জীবন ও মৃত্যু তথা কালের দুয়ারগুলি মরীচিকাবৎ প্রতীত হয় এবং অভীপ্সিত প্রতিবোধ মোচন করে জন্মান্তরের শৃঙ্খল তখনই রচিত হয় সেই উপলব্ধির প্রশান্ত ও পুষ্পিত বীথি যা' অনন্তের প্রতিশ্রুতিময়। এমনই এক মহত্তম জীবনের প্রেক্ষিতে পাওয়াপুরী (প্রাচীন মধ্যমা পাওয়া) ভারত ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। হিন্দীভাষায় রচিত বর্তমান পুস্তকে লেখক শ্রীমহেন্দ্র-কুমার সিংঘী এই অক্ষয় গৌরবকেই তুলে ধরেছেন। শ্রীজৈন সংস্কৃতি কলামন্দির থেকে প্রকাশিত পূর্ব-ভারতীয় জৈন তীর্থ সম্বন্ধীয় গ্রন্থমালার দ্বিতীয় উপহার এই সচিত্র ও সুলিখিত পুস্তকখানি। সীমিত পরিসরে মহাবীরের স্মৃতিধন্য পাওয়াপুরীর দিব্যরূপ প্রতিভাত হ'য়েছে বর্ণাঢ্য ও সাদা কালো চিত্রসমূহের সাহচর্যে এবং ভক্তির শিখায় আলোকিত অন্তরঙ্গ রচনা-শৈলীতে। পাওয়াপুরীর ইতিহাস তীর্থংকরের উপলব্ধির কাহিনী। এর মর্ম ও প্রতিবোধ সীমাবদ্ধ নয় ইতিবৃত্তের প্রথাগত সংলাপে ও বর্ণনায়।

নালন্দা ও রাজগীরের অদূরে অবস্থিত মাধ্যমা পাওয়ার পূর্বতন নাম ছিল অপাপা। এইখানে 'চরম তীর্থংকর' (শেষ তীর্থংকর) বিশ্বের মঙ্গল-হেতু সর্ব-প্রথম তাঁর ধর্মদেশনা দেন এবং এইখানেই শেষ ধর্ম-দেশনা দানকালে রাজা হস্তীপালকের গৃহে নির্বাণ লাভ করেন। 'অভিনিষ্ক্রমণের পর দীর্ঘ প্রব্রজ্যা-কাল অতিবাহিত হ'লে মহাবীর যখন তীর্থংকররূপে

পাওয়ায় উপনীত হন তখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আনত হন প্রথমে প্রশ্নকারী কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর প্রধান শিষ্য ও গণধর ইন্দ্রভূতি গৌতম। কথিত আছে, মহাবীরের অগ্নি-সংস্কার-স্থলে তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দ সংগ্রহ করতে থাকেন ভস্ম অথবা তার পরিবর্তে এক এক মুষ্টি মৃত্তিকা। এর ফলে সৃষ্টি হ'য়েছে এক বিস্তৃত জলাশয়, পরম অর্হৎ এর স্মৃতিপূতঃ পুণ্য সরোবর। এর বারিকণায় কর্মরেণুর ব্যথা সঞ্চিত এবং এর প্রশান্ত পরিবেশ যেন জন্মান্তরের অবশেষ নিগ্রন্থের করুণায় আর্দ্র। পাওয়ার সুদৃশ্য জল-মন্দির চিহ্নিত ক'রে রেখেছে এই অগ্নি-সংস্কারের স্থানটিকে। অপরপক্ষে, নিকটবর্তী গাঁও মন্দির স্মরণ করিয়ে দেবে হস্তীপালকের গৃহকে যেখানে মহাবীরের শেষ বাণী উচ্চারিত হয় এবং সমাগত হয় নির্বাণ-মুহূর্ত। পাওয়ার জল-মন্দিরের শোভা প্রকৃতই অনুপম: এর মাধুর্য বর্ণিত হয়েছে শ্রীসিংঘীর লেখায়।

শ্রীমহেন্দ্রকুমার সিংঘী নিবেদিত 'প্রাক্কথন'-এ উল্লিখিত হ'য়েছে দুইটি অমূল্য প্রকাশন, পুরাতাত্ত্বিক শ্রীভওরলাল নাহাটার 'মহাতীর্থ পাওয়াপুরী' এবং পুরণচাঁদ নাহার রচিত 'জৈন লেখ সংগ্রহ'। প্রস্তাবনায় শ্রীবিজয়সিং নাহার মনোজ্ঞভাবে পাওয়াপুরীর গুরুত্ব আলোচনা করেছেন।

এই জৈন মহাতীর্থের দীপ্তি সর্বদাই অম্লান। ভক্তজনের হৃদয়ে ও পর্যটকের মানস পটে পাওয়া এক ভক্তিস্নিগ্ধ বেদনা ও অনন্ত জ্ঞানের প্রতীকস্বরূপ। জল-মন্দিরের অপার সৌন্দর্য এবং তীর্থংকরের চরণ-রেখা যেন জন্মান্তরমুক্ত এক অদেখা প্রভুর চির-ভাস্বর আলোক বর্তিকা।

—শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার
কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ
কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. III. No. 5 : Sraman : September 1975

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

পরলোকগত পূরণচাঁদ শ্যামসুখা মহাশয় জৈন ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া, বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ সুলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈনধর্মসম্বন্ধে, কলেজে অধ্যয়নকালে আমার যে ধারণা ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা, মহত্ব এবং ঐতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি কিছু পরিমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের চিন্তা ও ধর্ম জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামসুখাজীর বইখানিও আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
তৃতীয় বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৮২ ॥ ষষ্ঠ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

জৈন মন্দির, গিরনার

তীর্থংকর মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাণিজ্যগ্রামে সোমিল নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন। তিনি যেমন ধনী ছিলেন তেমনি বেদাদি শাস্ত্রে পারংগত।

বর্দ্ধমানের আসার সংবাদ পেয়ে তিনি মনে মনে ভাবলেন, যাই, ওঁর কাছে গিয়ে কিছু শাস্ত্রার্থ করি। তিনি যদি যথাযথ প্রত্যুত্তর দিতে পারেন তবে তাঁর পর্যুপাসনা করব। নইলে তাঁকে নিরুত্তর করে দিয়ে ফিরে আসব।

সোমিল তাই তাঁর ৫০০ জন শিষ্যের মধ্য হতে ১০০ জন বাছাবাছা শিষ্য নিয়ে বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও তাঁকে বন্দনা করে তাঁর হতে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন, আপনার সিদ্ধান্তে কি যাত্রা, যাপনীয়, অব্যাবাধ ও প্রাসুক বিহার আছে ?

বর্দ্ধমান বললেন, হাঁ সোমিল, আমার সিদ্ধান্তে যাত্রা, যাপনীয়, অব্যাবাধ ও প্রাসুক বিহার আছে।

সোমিল বললেন, ভগবন্, আপনার যাত্রা কি ?

বর্দ্ধমান বললেন, তপ, নিয়ম, সংযম, স্বাধ্যায়, ধ্যান ও আবশ্যকাদি যোগে উদ্যম আমার যাত্রা।

ভগবন্, আপনার যাপনীয় কি ?

সোমিল, যাপনীয় দুইপ্রকার, এক ইন্দ্রিয় যাপনীয়, দুই ন-ইন্দ্রিয় যাপনীয়। চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক এই পাঁচ ইন্দ্রিয়। এই পাঁচ ইন্দ্রিয়কে আমি বশীভূত রাখি। এই আমার ইন্দ্রিয় যাপনীয়। আর ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ আমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের প্রাদুর্ভাব হয় না। তা আমার ন-ইন্দ্রিয় যাপনীয়।

ভগবন, আপনার অব্যাবাধ কি ?

সোমিল, আমার শরীরে বাত, পিত্ত, কফ আদি শরীর সম্বন্ধীয় যে দোষ তা উপশান্ত হয়েছে তাই আমার অব্যাবাধ।

ভগবন্, আপনার প্রাসুক বিহার কি ?

সোমিল, আমি দেবালয়, চৈত্য, স্ত্রী, পশু ও নপুংসকহীন বসতি আদিতে নির্দোষ ও এষণীয় পীঠ ফলক, শয্যাদি প্রাপ্ত হয়ে বিচরণ করি। তাই আমার প্রাসুক বিহার।

বর্দ্ধমানের এই প্রত্যুত্তরে সোমিল সন্তুষ্ট হলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে নানাবিধ প্রশ্ন করলেন। শেষে জিজ্ঞেস করলেন, ভগবন্, আপনি এক না দুই ? আপনি অক্ষয়, অব্যয়, সৎ না ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে অনেক রূপধারী ?

বর্দ্ধমান বললেন, সোমিল, আমি এক, আবার দুইও। আমি অক্ষয়, অব্যয়, সৎ, আবার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে বহুরূপধারীও ?

ভগবন্, সে কি রকম ?

সোমিল, আত্মদ্রব্যরূপে আমি এক, কিন্তু জ্ঞান ও দর্শন রূপে আমি দুই। আত্মপ্রদেশের অপেক্ষায় আমি অক্ষয়, অব্যয় ও সৎ কিন্তু পর্যায়ের দৃষ্টিতে আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে নানারূপধারী।

এ সেই অনেকান্তবাদের কথা। দ্রব্যরূপে নিত্য পর্যায়রূপে অনিত্য। এবং বাস্তবে সত্যও তাই।

সোমিল তত্ত্বোপদেশ পেয়ে শ্রাবক ধর্ম গ্রহণ করলেন।

বর্দ্ধমান সেই বছরের চাতুর্মাস্য সেখানেই ব্যতীত করলেন।

বর্ষাশেষে বাণিজ্যগ্রাম হতে প্রব্রজন করে কোশলের সাকেত, শ্রাবস্তী আদি নগর হয়ে পাঞ্চালের কাম্পিল্যপুরে এসে উপস্থিত হলেন ও নগরপ্রান্তের সহস্রাম্রবন উদ্যানে অবস্থান করলেন।

কাম্পিল্যপুরে অম্মড় নামে এক ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক থাকেন। তাঁর সাত শ' জন শিষ্য ছিল।

কাম্পিল্যপুরে ইন্দ্রভূতি গৌতম একদিন শুনে এলেন যে অম্মড় একই সময়ে এক শ' ঘরে আহার গ্রহণ করেন। সেকথা শুনে তাঁর মনে শঙ্কা উৎপন্ন হল। তিনি বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন্ অম্মড় সম্বন্ধে লোকে যা বলে

তাকি সত্যি ? অম্মড় কি একই সময়ে কাম্পিল্যপুরের এক শ' ঘরে অবস্থান ও একশ ঘরে আহার গ্রহণ করতে পারে ?

বর্দ্ধমান বললেন, হাঁ গৌতম, পারে।

ভগবন্, সে কি রকম ?

গৌতম, অম্মড় বিনীত ও তপঃ পরায়ণ। সেই তপস্যার প্রভাবে সে বীর্যলব্ধি বৈক্রিয়লব্ধি ও অবধিজ্ঞানলব্ধি লাভ করেছে। এই সব লব্ধির প্রভাবে সে একশ' রূপ ধারণ করে একশ' ঘরে আহার করে লোকদের চমৎকৃত করছে।

ভগবন্, সে কি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার যোগ্যতা রাখে ? সে কি নির্গ্রন্থ ধর্ম গ্রহণ করবে ?

না গৌতম, সে আমার শ্রমণ শিষ্য হবার যোগ্যতা রাখে না।

কাম্পিল্যপুর হতে প্রব্রজন করে বর্দ্ধমান আবার বিদেহ ভূমিতে ফিরে এলেন। সেই বছরের বর্ষাবাসও তিনি বাণিজ্যগ্রামে ব্যতীত করলেন।

বর্ষাকাল শেষ হলে তিনি কাশী ও কোশলের দিকে প্রস্থান করলেন কিন্তু বর্ষার আগ দিয়ে আবার বাণিজ্যগ্রামে ফিরে এলেন ও বাণিজ্যগ্রামের বাইরের দূতিপলাশ চৈত্যে অবস্থান করলেন।

একদিন দূতিপলাশ চৈত্যে পার্শ্বাপত্য শ্রমণ গাংগেয় এলেন। এসে নারক, তীর্যক, মনুষ্য ও দেবতা এই চতুর্বিধ জীব সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগলেন। এক সময় প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, সৎ নারক উৎপন্ন হয়, না অসৎ ? সৎ তীর্যক উৎপন্ন হয়, না অসৎ ? সৎ মনুষ্য উৎপন্ন, হয় না অসৎ ? সৎ দেবতা উৎপন্ন হয়, না অসৎ ?

বর্দ্ধমান বললেন, গাংগেয় সকলেই সৎ উৎপন্ন হয়, অসৎ কেউ উৎপন্ন হয় না।

ভগবন্, নারক, তীর্যক, মনুষ্য ও দেব সৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হন, না অসৎ ?

গাংগেয়, সকলে সৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অসৎ মৃত্যু কেউ প্রাপ্ত হয় না।

ভগবন্, সে কি রকম ? সৎ কি ভাবে উৎপন্ন হয় ? এবং যা মরে তার সত্তা কি রকম্ ?

গাংগেয়, পুরুষ শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব এই লোককে শাশ্বত বলেছেন। এই লোকে

তাই যা 'সর্বথা অসৎ' তার উৎপত্তি হয় না। আর যা 'সৎ' তার সর্বথা বিনাশ হয় না।

ভগবন্, এই সত্য কি আপনার আত্মপ্রত্যক্ষ না অনুমান বা আগমমূলক ?

গাংগেয়, এই সত্য আমার আত্মপ্রত্যক্ষ। অনুমান বা আগমমূলক নয়।

ভগবন্, সে কি রকম ? অনুমান ও আগম ছাড়া তত্ত্ব কি ভাবে জানা যায় ?

গাংগেয়, যিনি কেবল জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি পূর্ব হতেও জানেন, পশ্চিম হতেও জানেন, দক্ষিণ হতেও জানেন, উত্তর হতেও জানেন, পরিমিতও জানেন, অপরিমিতও জানেন। তাঁর জ্ঞান প্রত্যক্ষ হওয়ায় সমস্ত তত্ত্ব প্রতিভাসিত হয়।

ভগবন্, নারক, তীর্যক, মনুষ্য ও দেবতা নিজে উৎপন্ন হয়, না কারু প্রেরণায় ? নিজে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, না কারু প্রেরণায় ?

গাংগেয়, সমস্ত জীব নিজ নিজ শুভাশুভ কর্মানুসারে শুভাশুভ গতিতে উৎপন্ন ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় কারু প্রেরণায় নয়।

এই তত্ত্বালোচনায় গাংগেয় সন্তুষ্ট হলেন। তিনি ভগবান পার্শ্বের চতুর্যাম ধর্ম পরিত্যাগ করে বর্দ্ধমানের পঞ্চযাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

বর্দ্ধমান বাণিজ্যগ্রাম হতে বৈশালী এলেন, সেই বছরের বর্ষাবাস তিনি বৈশালীতেই ব্যতীত করলেন।

বৈশালী হতে প্রব্রজন করে বর্দ্ধমান মগধভূমি ও নানাস্থানে ধর্মোপদেশ দিতে দিতে রাজগৃহের গুণশীল চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন।

গুণশীল চৈত্যে অন্যতীর্থিক সাধু ও শ্রমণেরা থাকেন। তাঁরা পরস্পর বার্তালাপ করেন, পরস্পরের মত খণ্ডন ও মণ্ডন করেন। গৌতম তাঁদের সেই খণ্ডন মণ্ডন বার্তালাপ শুনে বর্দ্ধমানকে এসে একদিন প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, অন্যতীর্থিক শ্রমণদের কেউ বলেন শীল (সদাচার) শ্রেষ্ঠ, কেউ বলেন শ্রুত (জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ। আবার অন্যরা বলেন শীল ও শ্রুত দুই-ই শ্রেষ্ঠ। সে কি রকম ?

বর্দ্ধমান বললেন, গৌতম, অন্যতীর্থিকদের কথা ঠিক নয়। এই বিষয়ে আমার

মত এই : সংসারে পুরুষ চার রকম—কেউ শীল সম্পন্ন, শ্রুত সম্পন্ন নয় ; কেউ শ্রুত সম্পন্ন, শীল সম্পন্ন নয় ; কেউ শীল সম্পন্ন, শ্রুত সম্পন্নও ; কেউ শীল সম্পন্নও নয়, শ্রুত সম্পন্নও নয়। গৌতম যে শীলবান কিন্তু শ্রুতবান নয় অর্থাৎ যে পাপ প্রবৃত্তি হতে দূরে থাকে কিন্তু ধর্মের জ্ঞাতা নয় তাকে আমি দেশারাধক (ধর্মের একাংশের আরাধক) বলি। যে শীলবান নয় কিন্তু শ্রুতবান অর্থাৎ পাপ প্রবৃত্তি হতে যে দূরে নয়, অথচ যে ধর্মের জ্ঞাতা তাকে আমি দেশ-বিরাধক বলি। যে শীলবান ও শ্রুতবান অর্থাৎ পাপ হতে নিবৃত্ত ও ধর্মের জ্ঞাতা তাকে আমি সর্বারাধক বলি। যে শীলবানও নয়, শ্রুতবানও নয় অর্থাৎ যে পাপ হতে দূরে থাকে না ও ধর্মতত্ত্বের জ্ঞাতাও নয়, তাকে আমি সর্ববিরাধক বলি।

গৌতম বললেন, ভগবন্, অন্যতীর্থিকেরা বলেন, প্রাণী হিংসা, মিথ্যা, চুরি, সংগ্রহেচ্ছা, ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ আদি দুষ্ট ভাবে প্রবৃত্তিকারী প্রাণীর জীব ও তার জীবাত্মা পৃথক। এইভাবে এর বিপরীত শুভ ভাবে প্রবৃত্তিকারী প্রাণীর জীব ও তার জীবাত্মা পৃথক। ভগবন্, অন্যতীর্থিকদের এই মান্যতা সত্য, না মিথ্যা ?

বর্দ্ধমান বললেন, গৌতম অন্য তীর্থিকদের এই মান্যতা মিথ্যা। এই বিষয়ে আমার মত এই যে শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তিকারী প্রাণীর জীব ও জীবাত্মা একই। যা জীব, তাই জীবাত্মা।

ভগবন্, অন্যতীর্থিকেরা বলেন, যক্ষ ভর করলে কেবলীও মিথ্যা বা সত্য-মিথ্যা বলেন, সে কি রকম ?

গৌতম, অন্যতীর্থিকদের এই উক্তিও মিথ্যা। এই বিষয়ে আমার মত এই যে কেবলীর ওপর কখনো যক্ষের ভর হয় না বা তিনি মিথ্যা বা সত্য-মিথ্যা বলেন না। তিনি যা নির্দোষ সত্য তাই বলেন।

রাজগৃহ হতে বর্দ্ধমান চম্পার দিকে গেলেন। তারপর নানাস্থানে প্রব্রজন করে আবার রাজগৃহের গুণশীল চৈত্যে ফিরে এলেন।

সেই সময় গুণশীল চৈত্যের নিকটে কালোদায়ী, শৈলোদায়ী, শৈবালোদায়ী, উদক আদি অনেক অন্যতীর্থিক সাধু ও শ্রমণেরা বাস করতেন।

মাঝে মাঝে তাঁরা বর্দ্ধমানোক্ত তত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করতেন। একবার তাঁরা বর্দ্ধমান নিরূপিত পঞ্চাস্তিকায় বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। বলছিলেন, শ্রমণ জ্ঞাতপুত্র বলেন ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, জীবাস্তিকায় ও পুদ্গলাস্তিকায় এই পাঁচ রকমের অস্তিকায় আছে। এই পাঁচটীর মধ্যে জীবাস্তিকায়কে জীবকায় বলেন অন্য চারটিকে অজীবকায় বলেন। আবার ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায় ও জীবাস্তিকায়কে অরূপীকায় ও পুদ্গলাস্তিকায়কে রূপীকায় বলেন। একি সত্য ?

ঠিক সেই সময় গুণশীল চৈত্যে অবস্থিত বর্দ্ধমানকে বন্দনা ও নমস্কার করবার জন্য সেই পথ দিয়ে শ্রমণোপাসক মৃদ্দক যাচ্ছিলেন। তাঁকে দূর হতে দেখতে পেয়ে কালোদায়ী বললেন, দেবানুপ্রিয়, শ্রমণোপাসক মৃদ্দক ওই যাচ্ছে আমরা ওর কাছে গিয়ে আমাদের সন্দেহের নিরসন করি।

তখন তাঁরা সকলে মৃদ্দকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও বললেন, মৃদ্দক, নিগণ্ঠ নাতপুত্র পাঁচ অস্তিকায়ের কথা বলেন। তিনি কাউকে জীব বলেন, কাউকে অজীব, কাউকে রূপী, কাউকে অরূপী। তোমার এ বিষয়ে কি মত ? তুমি কি ধর্মাস্তিকায়াদিকে জান বা দেখ ?

মৃদ্দক বললেন, কালোদায়ি এদের কাজ হতে এদের অনুমান করাই যায়, অরূপী হবার জন্য ধর্মাস্তিকায়াদিকে জানা বা দেখা যায় না।

মৃদ্দক, তুমি কেমন শ্রমণোপাসক যে তোমার আচার্যোপদিষ্ট ধর্মাস্তিকায়াদিকে তুমি দেখ না বা জান না।

[ক্রমশঃ

গিরনার : রৈবতকে

শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

অসুখ হারিয়ে গেছে সুখের ভিতর
আজ এই এতদিন পর।
—যাক্‌গে হারিয়ে।
অমর্ষ হারিয়ে গেছে হর্ষের ভিতর
আজ এই এতদিন পর।
—যাক্‌গে হারিয়ে।
আলস্য হারালো লঘু লাস্যের ভিতর
আজ এই এতদিন পর।
—যাক্ গে হারিয়ে।
বৎসর বৎসর ধ'রে এ মনেই ছিলো যে মৎসর
ছেড়ে গেলো এতদিন পর।
—যাক্ ছেড়ে দিয়ে।
এই ব'লে মন ওঠে হেসে
জুনাগড়ে এসে।
হারিয়েছে বহু ভ্রম এ ভ্রমণ-শেষে
এসেছে নতুন প্রেম সেজে দেশ-ভ্রমণের বেশে
এইবার তার সাথে করা যাক্ ঘর।
মন বলে—হাঁা, হাঁা, তাই কর্।

যখন হাজির হই গিরিপাদমূলে
তখন বেলায় চড়া রোদ উঠে গেছে।
ভোরে যে হয়নি আসা হিসেবের ভুলে
নামবার বেলা খুবই আক্কেল হয়েছে।

গিরিনিয়ে ফেলে রেখে সমতল মানুষের যত খোঁকা-টাটি
গিরনারের দিকে চাই স্বপ্নের আবেশে
হাতে নিয়ে ভাড়া-করা লাঠি !
পঙ্গুও উঠছে দেখে ভয়-ভ্রান্তি সব গেলো ভেসে,
উঠবো মনস্থ ক'রে অশেষ সিঁড়ির দিকে হাঁটি।
কে জানে যে কত সহস্রাব্দ পুরাতত্ত্বের মিনার—
সুপ্রাচীন গিরিতীর্থ এই গিরনার।
উজ্জয়ন্ত রৈবতক···আরো যেন কী কী সব নাম
কবে থেকে হ'য়ে আছে পুরাণে কীর্তিত !
মনে ঠিক পড়ছে না, কোথা যেন প'ড়েও ছিলাম
সে সব পুরাণ-কথা পুস্তকে বিধৃত।

গিরিপদপ্রান্তে আমি সকালকে সাবলীল দেখে
যাত্রা শুরু করলাম শীতের শিহর গায়ে মেখে
যাত্রা শুরু করলাম কুয়াশা-চাদরে দেহ ঢেকে
যাত্রা শুরু করলাম না দেখেই সাথে এলো কে কে
কোনো কিছু অপ্রাপ্যকে পাবার আবেগে
নাগরিক খুৎখুঁতি পাহাড়ের নীচে ফেলে রেখে
সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি দ্রুত—
যেখানে বাতাস পরিস্রুত,
ক্লান্তির প্রতিষেধ যে বাতাসে আছে অনুস্যূত।

যতটা নিসর্গ-মোহ দুই চক্ষে ধরে
তার চেয়ে ঢের ফেলা-ছড়া আছে এ প্রাকৃত ঘরে।
ঘণ্টা দুয়েকেই ভেঙে দু'হাজার সিঁড়ি
জৈন মন্দিরে পৌঁছে যাই।
ঘুরে ঘুরে আধঘণ্টা সেখানে কাটাই !

অরিষ্টনেমির স্মৃতিপূত সেই স্থান—
এখানে সাধন তাঁর, এখানে নির্বাণ।

বস্তুপাল তেজপাল মন্দিরের কথা
যতই প্রশংসা করি—বাহুল্য হবে তা।

অতঃপর রাজুলের গুহামধ্যে ঢুকে ও বেরিয়ে
খোলা আর বন্ধ ঢের মন্দিরে বেড়িয়ে
উপরে চড়ায় সেই দরাজ সিঁড়িতে আসি নেমে
বেড়েছে রোদের তাত, সিঁড়ি ভাঙি ঘেমে—
যে সিঁড়িটা গেছে চ'লে গোমুখ ও গোমুখের পর
একেবারে গিরনার গিরির শিখর—
যেইখানে অধিষ্ঠাত্রী অম্বাজীর পূত অধিষ্ঠান
একান্ন পীঠের অন্যতম যেই স্থান—
পড়েছে যেখানে দেবী সতীর উদর
পৌঁছলাম হাজার পাঁচেক সিঁড়ি ভাঙবার পর।

ভক্তি নেই—অবিশ্বাসী—ভক্তিমার্গে সংশয়ী যে আমি
আমারও হ'লো না মনে যাওয়ামাত্র নামি।

বেশ কিছুক্ষণ সেথা এলাম কাটিয়ে।
…এই গিরি রৈবতক পবিত্র মহান!
জুনাগড় শহরের পাই গোটা মানচিত্রখান
সমীরিত এ শিখর থেকে।
আবছা শহর নীচে—তাকাই দাঁড়িয়ে
রৌদ্রতপ্ত পর্বতের পাথর মাড়িয়ে।
দুপুরে ধুঁকছে সবই চড়া রোদ গায়ে মেখে মেখে!
জৈনতীর্থ সেই নীচে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে—
বাঁকানো চাপের মতো শহর রয়েছে প'ড়ে পাহাড়ের পায়ে।
এত উঁচু থেকে দেখা স্পষ্ট নয় কিছু,
মায়ালোক ব'লে মনে হয় দূর শহর নীচুর।

পাশেই দত্তার গিরি যার নীচে পার্ক আর ড্যাম্—
অশোকের শিলালেখ গিরিপাদমূলে আছে আর
দামোদর কুণ্ডটাও খুব বেশি দূরে নয় তার।
তাকিয়ে নীচের দিকে অনুমান ক'রেই নিলাম।

আপাদমস্তক নিয়ে দুপুরের রদ্দুরের জ্বালা
এইবার নীচে নেমে আসবার পালা।
এতক্ষণে কড়া রোদে তেতেছে পাথর
চটিতে জিরোয় যাত্রী উত্তাপে কাতর ;
আমি শুধু দল-ছাড়া নেমে আসি একান্ত একেলা
—তাড়াতাড়ি সেরে নিতে নামবার পালা
হনুমানধারা নয়, আর না, আর না, গুরু দত্তাত্রেয়—
ভালোয় ভালোয় নীচে নেমে যাওয়া শ্রেয়।
রোদে পোড়ে অনাবৃত পাহাড়ের হাড়,
পাথরের সিঁড়িগুলো জ্বলন্ত অঙ্গার,
তবু তারই মাঝে পাই হেথা-হোথা ছায়াস্নিগ্ধ চটি,
ছায়ায় বিশ্রামকালে বরফ আখের রস খাওয়া ঘটি ঘটি।
বিশ্রামান্তে ফের নামা কাঠ-ফাটা রোদে
শারীরিক ক্লেশ স'য়ে মনের আমোদে
ভাবি কতক্ষণে শেষ হবে তপ্ত সোপানের সারি ;
আপাত অসাধ্য মনে হচ্ছেছিল যেটা
দেখা গেলো শেষাবধি তাও বেশ পারি।
সিঁড়ি শেষ হ'য়ে গেলো, বিকেল তিনটের কাছাকাছি
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গিরিপাদমূলে ফিরে আসি।

গৌতম পৃচ্ছা

[স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত একাঙ্কিকা]

প্রথম দৃশ্য

[স্থান পাবা। আর্য সোমিলের যজ্ঞশালা। হোমকুণ্ড হতে দূরে বসে একজন ব্রাহ্মণ শুক্লযজুর্বেদীয় স্বস্তিবচন পড়ছেন। হোম-কুণ্ডের সামনে বসে ইন্দ্রভূতি, সোমিলাদি ব্রাহ্মণ যজ্ঞে আহুতি প্রদান করছেন]

[স্বস্তিবচন]

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥
শং নো বাতঃ পবতাং শং নস্তপতু সূর্যঃ।
শং নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্যো অভিবর্ষতু ॥
অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রীঃ প্রতিধীয়তাম্।
শং ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শং যোঃ ॥

ইন্দ্রভূতি : সোমিল, এবার আমরা ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ...আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্দধিষ মে গিরঃ। ইন্দ্রস্তোমমিমং মম কৃষা যুজশ্চিদন্তরং। [আহুতি প্রদান]

সোমিল : [আকাশের দিকে চেয়ে] কই! ইন্দ্রের ত আবির্ভাব হল না।

মেতার্য : ইন্দ্রের আবির্ভাব! সে কাল গত হয়েছে সোমিল যখন অধ্বর্যুর আহ্বানে ইন্দ্র মর্ত্য লোকে আগমন করতেন।

ইন্দ্রভূতি : এখুনি এত অধৈর্য হয়ো না মেতার্য। [আকাশের দিকে চেয়ে] আমি যেন দূরে বহু দূরে বিমানের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

অগ্নিভূতি : হাঁ হাঁ ঠিকত। সে শব্দ ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সোমিল : যেখানে ইন্দ্রভূতি গৌতম অধ্বর্যু সেখানে ইন্দ্রের না এসে উপায় আছে।

অগ্নিভূতি : তুমি ঠিকই বলেছ। সমগ্র আর্যাবর্তের যিনি মার্তণ্ডস্বরূপ, যিনি সরস্বতীর বরপুত্র, যিনি বাদে সকলের মান মর্দন করেছেন তাঁর আহ্বানে ইন্দ্রকে আসতেই হবে। [আকাশের দিকে চেয়ে] এখন আর ধ্বনিই নয়, দেব বিমান সুস্পষ্ট রূপে দেখা যাচ্ছে।

মেতার্য : দেখা যাচ্ছে কিন্তু এ দেব বিমান যে বেগে ধাবিত হচ্ছে তাতে এখানে অবতরণ করবে তা মনে হয় না।

অগ্নিভূতি : মেতার্য, তুমি শ্রদ্ধাহীন, তুমি—

মেতার্য : আর্য অগ্নিভূতি, আপনি আপনার কথা ফিরিয়ে নিন্। আমি ঠিকই বলেছি—

সোমিল : তাইত। দেব বিমান যজ্ঞশালাকে যেন অতিক্রম করে যাচ্ছে।

ইন্দ্রভূতি : হুঁ। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও যেন অবতরণ করল বলে মনে হচ্ছে। একখানা নয় অনেক দেব বিমান। সংবাদ নাও, সোমিল।

সোমিল : আমি দেখছি। আপনি ততক্ষণ যজ্ঞক্রিয়া চালিয়ে যান।

ইন্দ্রভূতি : ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ ইন্দ্রায়…ও কিসের কোলাহল সোমিল।

সোমিল : [উঠে বাইরের দিকে চেয়ে] অগণিত লোক চলেছে মহাসেন উদ্যানের দিকে ও ভারি কোলাহল। বিমানও ওখানেই অবতরণ করেছে বলে মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রভূতি : মহাসেন উদ্যানে? কেন? ওখানে কি কেউ আবার যজ্ঞের আয়োজন করেছে?

সোমিল : না না।

ইন্দ্রভূতি : তবে?

সোমিল : ঠিক জানি না কিন্তু মানুষের প্রবাহত যেন ওদিকেই চলেছে। দেখি কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করি। [এগিয়ে গিয়ে] শোনো শোনো—

[একজন নাগরিকের প্রবেশ]

নাগরিক : দেবানুপ্রিয়, আপনি আমায় ডেকেছেন ?

সোমিল : হাঁ। এই সাত সকালে হন্তদন্ত হয়ে তোমরা কোথায় চলেছ ?

নাগরিক : মহাসেন উদ্যানে।

সোমিল : মহাসেন উদ্যানে ? সেখানে কি আছে ?

নাগরিক : ও সে জানেন না বুঝি ? আর জানবেনই বা কি করে ? যজ্ঞশালার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন নিজেদের। দেবতা নিয়ে আপনাদের কারবার, মানুষের দিকে তাকাবার সময় কই ?

সোমিল : বটে ! সেই সময় আর নেই। তাই তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু কি হচ্ছে ওখানে ?

নাগরিক : কি আর হবে ? ওখানে মহাবীর এসেছেন।

সোমিল : কে মহাবীর ?

নাগরিক : তীর্থংকর মহাবীর।

ইন্দ্রভূতি : তীর্থংকর ? এ নিয়ে ক'টি হল সোমিল ? পূরণ কাশ্যপ, পকুদ্ধ কাচ্চায়ন…

সোমিল : তা হবে গোটা ছয়। ওদের শাস্ত্রে আছে কিনা ২৪ জন তীর্থংকর হবে। ২৩ জন হয়ে গেছে—একজন বাকী। তাই সবাই নিজেকে তীর্থংকর বলে ঘোষণা করছে। দেখা যাক ধোপে শেষ পর্যন্ত কে টেকে !

নাগরিক : না ইনি সে রকম নন্।

ইন্দ্রভূতি : তুমি দেখেছ নাকি ?

নাগরিক : দেখেছি বৈ কী ! যেমন জ্ঞানী তেমনি সুবক্তা। কেমন সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন ধর্মের তত্ত্ব, অর্ধ মাগধীতে।

সোমিল : কেন দেব-ভাষা জানে না বুঝি ?

নাগরিক : জানবেন না কেন ? কিন্তু সে ভাষা আমরা কি সবাই জানি ? তাই আমাদের জন্য তিনি আমাদের ভাষায় উপদেশ দিলেন।

ইন্দ্রভূতি : বুঝেছি কোন শঠ প্রবঞ্চক বা ঐন্দ্রজালিক বাগবিস্তারে তোমাদের বিমুগ্ধ করেছে।

নাগরিক : না, ব্রাহ্মণ না। তাঁর কথা শুনবার জন্ত দেবতারাও আসছেন তাঁর ধর্ম সভায়। তিনি অনন্ত, তিনি অদ্বিতীয়।

ইন্দ্রভূতি : দেবতারা ? আচ্ছা তুমি যাও। কিন্তু শোনো। কি বলেন তিনি ?

নাগরিক : [ফিরে] বলেন বিশ্বাস করো আত্মা রয়েছে। আমি যেমন তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখছি, আত্মাকেও তেমনি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সেই আত্মাকে রক্ষা করো। হিংসায় বিনষ্ট করো না। তুমিই তোমার ভাগ্যের নির্মাতা !

ইন্দ্রভূতি : তুমিই তোমার ভাগ্যের নির্মাতা ! [সোমিলের দিকে চেয়ে] তবে কথা কি ছিল সোমিল ! জানে না, ইন্দ্র যদি রুষ্ট হন তবে বারি বর্ষিত হবে না, যদি বারি বর্ষিত না হয় তবে অন্ন উৎপন্ন হবে না। যদি অন্ন উৎপন্ন না হয় তবে···

সোমিল : তবে অবধারিত মৃত্যু। এই জন্তই ত বলা হয় পরস্পরং বর্দ্ধয়ন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও।

ইন্দ্রভূতি : তুমিই তোমার ভাগ্যের নির্মাতা ! মিথ্যা, শঠ, প্রবঞ্চক, ঐন্দ্রজালিক।

নাগরিক : তিনি শঠ নন, প্রবঞ্চক নন, ঐন্দ্রজালিক নন, তিনি সর্বজ্ঞ।

ইন্দ্রভূতি : সর্বজ্ঞ ? অসম্ভব। সর্বজ্ঞ যদি এ যুগে কেউ থাকে ত সে আমি।···

সোমিল : এখন কি করবেন, গৌতম ?

ইন্দ্রভূতি : কি করব ? আমি মহাসেন উত্থানে যাব। একখাপে যেমন দুই তলোয়ার থাকতে পারে না তেমনি এক সময়ে দুই সর্বজ্ঞ। আমি তাকে বাদে পরাস্ত করে তার গর্ব চুরচুর করে দিয়ে আসব। জানে না সে কার সঙ্গে প্রতিস্পর্দ্ধা করতে আসছে। অগ্নিভূতি, তুমি আমার শিষ্যদের ছত্র, চমরাদি নিয়ে প্রস্তুত হতে বল। আমি ততক্ষণে সেখানে যাবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে আসি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মহাসেন উদ্যান। গাছের তলায় মহাবীর বসে রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে অগণিত মানুষ]

ইন্দ্রভূতি : [প্রবেশ করে] অদ্ভুত ! এঁকে দেখামাত্রই আমার মধ্যে এ কি পরিবর্তন হয়ে গেল ! আমি এঁকে পরাস্ত করে বিজয়ী হব সেই ভাবনাই দেখছি আর আমার মধ্যে নেই। তবে কি ইনি সত্যি যোগসিদ্ধ ? —না ঐন্দ্রজালিক ? না-না, আমার মন যেন উধাও হয়ে ছুটে চলেছে ওই দিকে। উনি কি তবে সর্বজ্ঞ ? গৌতম, এ তোমার কি হল ? না, আমি ততক্ষণ এঁকে সর্বজ্ঞ বলে স্বীকার করব না যতক্ষণ না ইনি আমার আত্মা সম্পর্কে যে সংশয় রয়েছে তার নিরাকরণ না করে দেন। হাঁ, তবেই বুঝব ইনি সর্বজ্ঞ। [এগিয়ে যাচ্ছেন]

মহাবীর : এসো এসো ইন্দ্রভূতি, আমি তোমার প্রতীক্ষা করে আছি।

ইন্দ্রভূতি : ভগবন্, আপনি আমায় আশ্চর্য করে দিয়েছেন। আপনি কি করে জানলেন আমার নাম ?

মহাবীর : এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? তোমার নাম সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

ইন্দ্রভূতি : তা বটে !

মহাবীর : কিন্তু গৌতম, তোমার আত্মার অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দেহ। তাই নয় কি ?

ইন্দ্রভূতি : হাঁ, ভগবন্। কিন্তু এবার সত্যিই আপনি আমায় বিস্মিত করে দিয়েছেন। কারণ এই সন্দেহের কথা এক আমি ছাড়া সংসারে আর কেউ জানে না। সবাই আমায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলে জানে।

মহাবীর : তাতে ভুল কি গৌতম ! তুমি দিগ্বিজয়ী, কিন্তু তোমার এই সন্দেহেরও কোনো কারণ নেই।

ইন্দ্রভূতি : কিন্তু আত্মা আছে তা বিশ্বাসই বা করি কি করে যখন দেখি মৃত্যুর পর সমস্তই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিছুই অবশেষ থাকে না।

মহাবীর : গৌতম, কিছুই কি অবশেষ থাকে না ? তাই যদি হত তবে অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ-আদি বেদবাক্য নিষ্ফল হয়ে যেত।

কারণ আত্মা যদি পরভবে সংক্রমণই না করে তবে বেদোক্ত অগ্নিহবনাদির পারলৌকিক ফলও অর্থহীন।

ইন্দ্রভূতি: ভগবন্, আমার সন্দেহের কারণও তাই। তাছাড়া বেদের অন্যত্রও বলা হয়েছে…

মহাবীর: তোমার সন্দেহের কারণ আমি বুঝতে পারি গৌতম, কিন্তু তোমার কাজ আমি বুঝতে পারি না। তুমি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করো না অথচ যজমানের হয়ে যজ্ঞের আয়োজন করে তাতে অযথা জীব হত্যা করতে পার। আত্মাই যদি না থাকে তবে স্বর্গে সংক্রমণের প্রশ্ন কোথায়?

ইন্দ্রভূতি: [লজ্জিত ভাবে] ভগবন্।

মহাবীর: বল গৌতম, বল।

ইন্দ্রভূতি: ভগবন্, যজ্ঞ পরম্পরাগত তাই।

মহাবীর: গৌতম, এ তোমার মতো পণ্ডিতের উক্তি হতে পারে না। তোমার বুদ্ধি হতে হবে শাণিত তরবারির মতো। তোমাকে সব কিছু জ্ঞানের কষ্টি পাথরে পরখ করে দেখে নিতে হবে। গৌতম, পরম্পরা-গত হলেই তা সত্য হয়ে যায় না।…কিন্তু থাক ও কথা। গৌতম, তুমি এখন আমার একটি প্রশ্নের জবাব দাও, তুমি যা কিছু দেখছ, শুনছ, অনুভব করছ সে কে? এই যে সন্দেহ করছে, আত্মা আছে কি নেই, সেই বা কে?

ইন্দ্রভূতি: ভগবন্, সে পঞ্চভূতের মিশ্রণজাত অবস্থা বিশেষ মাত্র, যাকে আমরা 'অহম্' বলি। পৃথক পৃথক ভূতে যে গুণ দেখা যায় না তা একত্রে মিশ্রিত হবার জন্য তাতে প্রকটিত হয়েছে মাত্র। মদিরায় যে মাদকতা দেখা যায় তা তার উপাদান কারণে কোথায়?

মহাবীর: আছে গৌতম, আছে। অন্নেরও এক মাদকতা আছে তবে অল্প। অন্য বস্তুর সংযোগে তা বর্গাকারে বর্দ্ধিত হয় মাত্র। তুমি ত দর্শন শাস্ত্রের এই সর্বমান্য সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই জান, সৎবস্তুর বিনাশ নেই, অসৎ বস্তুর উৎপাদ নেই।

ইন্দ্রভূতি: জানি, ভগবন্।

মহাবীর : তাই যদি হয় তবে সেই বস্তুর গুণেরও উৎপাদ হয় না। কারণ গুণের সমূহইত দ্রব্য। গুণের পর্যায়ে প্রভেদ হতে পারে, নূতন গুণের আবির্ভাব হতে পারে না।

ইন্দ্রভূতি : আপনি ঠিকই বলেছেন, ভগবন্।

মহাবীর : আচ্ছা গৌতম, ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎব্যোম—এই পঞ্চভূতের কোনো একটি কি অনুভব করতে পারে, আমি আছি। বা তুমি যা অনুভব কর তা কি ভাগুতে পার : এই অংশ ক্ষিতি অনুভব করছে, এই অংশ অপ্, এই অংশ তেজ, এই রকম ?

ইন্দ্রভূতি : ভগবন্, অনুভবের টুকরো হয় না।

মহাবীর : তবে একথা বলতে হয় যে কোনো একটি দ্রব্যকেই অনুভব করতে হয়, আমি আছি। পঞ্চভূতের কোনো একটি কি তা অনুভব করতে পারে ?

ইন্দ্রভূতি : না ভগবন্।

মহাবীর : তবে তার অর্থ হল যে পঞ্চভূতের অতিরিক্ত আর একটা দ্রব্য রয়েছে যা অনুভব করে।

ইন্দ্রভূতি : ভগবন্, সেকথা স্বীকার করতেই হবে।

মহাবীর : আমি আছি যে অনুভব করে সেই দ্রব্যকে যদি তুমি স্বীকার করো তবে তোমাকে এও স্বীকার করতে হবে যে না তার উৎপত্তি আছে না তার বিনাশ। কারণ যা সৎ তার বিনাশ হয় না, যা অসৎ তার উদ্ভব হয় না। গৌতম, সেই স্বতন্ত্র দ্রব্যের নামই আত্মা বা জীব।

ইন্দ্রভূতি : বুঝতে পেরেছি ভগবন্ ; কিন্তু সেই বেদ বাক্য···

মহাবীর : তুমি 'বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি' এই শ্রুতিবাক্যের কথা বলছ না গৌতম।

ইন্দ্রভূতি : [আশ্চর্যভাবে] হাঁ, ভগবন্।

মহাবীর : কিন্তু তুমি তার তাৎপর্য ধরতে পারনি। এখানে বিজ্ঞানঘনর তাৎপর্য চেতন আত্মার সঙ্গে নয়, চেতনার যে বিভিন্ন জ্ঞান পর্যায়ের উদ্ভব হয় তার সঙ্গে। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তির তাৎপর্য পরবর্তী জ্ঞানপর্যায়ের অনুভবের সময় পূর্ববর্তী জ্ঞানপর্যায়ের অনুভব হয় না এইমাত্র।

ইন্দ্রভূতি : ভগবন্, আমার সমস্ত সংশয় নিরসিত হয়েছে আপনি আমায় শ্রমণ ধর্মে দীক্ষিত করুন।

মহাবীর : গৌতম, তোমার যেমন অভিরুচি।

[সোমিলের যজ্ঞশালা। সোমিল, ব্যক্ত, অচলভ্রাতা আদি চিন্তান্বিত ভাবে বসে রয়েছেন। সর্বত্র এক বিশৃঙ্খল ভাব]

[মেতার্যের প্রবেশ]

সোমিল : কি সংবাদ, মেতার্য? সেই ঐন্দ্রজালিককে কি গৌতম পরাস্ত করতে পেরেছেন? তিনি কি বিজয় গৌরবে সশিষ্য এখানে ফিরে আসছেন? মেতার্য, তুমি ওমন চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? আমাদের ইন্দ্রভূতিকে এমন সম্বর্দ্ধনা দিয়ে এখানে নিয়ে আসতে হবে যা লোক বহু দিন ধরে মনে রাখবে।

মেতার্য : তার আর প্রয়োজন নেই, সোমিল।

সোমিল : তুমি কি বলতে চাও, মেতার্য। ইন্দ্রভূতি গৌতম···

মেতার্য : তিনি বাদে পরাস্ত হয়েছেন।

সোমিল : না-না-না মেতার্য, তা হতে পারে না।

মেতার্য : হতে পারে না তাই এত দিন জানা ছিল কিন্তু এখন দেখছি তাই হয়েছে।

ব্যক্ত : মেতার্য, তুমি হয়ত ভুল শুনেছ।

মেতার্য : না, আমি ভুল শুনিনি। শুধু তাই নয়, আর্য ইন্দ্রভূতি বাদে পরাস্ত হয়ে সশিষ্য নিগ্রর্ন্থ ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

সোমিল : বল কি?

অচলভ্রাতা : আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

ব্যক্ত : আমারো না। এ অসম্ভব। ইন্দ্রভূতি শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। না-না না। পূবের সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে কিন্তু বাদে ইন্দ্রভূতিকে পরাস্ত করা, ইন্দ্রভূতির শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ, এ অবিশ্বাস্য।

মেতার্য : সেই অবিশ্বাস্যই সম্ভব হয়েছে, ব্যক্ত। আমাদের সনাতন ধর্মের এ ঘোর দুর্দিন। সুনন্দ এই সংবাদ নিয়ে এসেছিল। সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র আর্য অগ্নিভূতি সশিষ্য মহাসেন উদ্যানের দিকে চলে গেছেন।

সোমিল : কেন ?

মেতার্য : তিনিও তোমাদের মতো সেকথা বিশ্বাস করতে পারেন নি—তাই। পরিস্থিতি স্বচক্ষে গিয়ে দেখবেন। যদি সত্যিই তিনি শ্রমণ দীক্ষা নিয়ে থাকেন তবে মহাবীরের সঙ্গে তিনি বাদে প্রবৃত্ত হবেন। ইচ্ছা তাঁকে পরাস্ত করে ইন্দ্রভূতিকে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ফিরিয়ে আনা।

ব্যক্ত : সাধু! সাধু!

সোমিল : কিন্তু ?

ব্যক্ত : কিন্তু কি, সোমিল ?

সোমিল : আর্য ইন্দ্রভূতি যাঁকে বাদে পরাস্ত করতে পারেন নি, তাঁকে কি অগ্নিভূতি বাদে পরাস্ত করতে পারবেন ?

মেতার্য : আমারো সেই সন্দেহ রয়েছে, সোমিল।

সোমিল : সেক্ষেত্রে আমাদের কি কর্তব্য তা বিচারণীয়।

অচলভ্রাতা : অবশ্য অবশ্য।

সোমিল : আমি বলি কি···

[বায়ুভূতির প্রবেশ]

সোমিল : এই যে আর্য বায়ুভূতি এসে গেছেন।

বায়ুভূতি : [আসন গ্রহণ করে] তোমরা সেই দুঃসংবাদ অবশ্যই পেয়ে গেছ।

অচলভ্রাতা : হাঁ। সে নিয়েই আমরা কথা বলছিলাম, এখন আমাদের কী কর্তব্য ?

মেতার্য : সোমিল, তুমি কি বলছিলে যেন।

সোমিল : আমি বলছিলাম সে সংবাদ পেয়ে আর্য অগ্নিভূতি চলে গেছেন। কিন্তু তাঁকে একা ছেড়ে দেওয়া আমাদের উচিত হয় না।

বায়ুভূতি : ঠিক।

সোমিল : তাই আমি বলছিলাম ; কি আপনাদের সকলের সেখানে যাওয়া উচিত।

বায়ুভূতি : তুমি উপযুক্ত কথাই বলেছ। আমরা দশজন যদি সেখানে উপস্থিত থাকি তবে আক্রমণ যেদিক হতেই আসুক না কেন তা প্রতিহত করতে পারব।

অচলভ্রাতা : খুব তর্ক সঙ্গত।

মেতার্য : তর্ক সঙ্গত নয়, যুক্তি সংগত। তবে আমাদের শিগ্‌গির প্রস্তুত হয়ে নিতে হয়। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত নয়। কিন্তু সুনন্দ যেন এদিকেই আসছে।

সোমিল : কিন্তু ওর মুখ দেখে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। আর্য অগ্নিভূতি পরাজিত হয়ে যান নি ত।

[সুনন্দর প্রবেশ]

সোমিল : কি সুনন্দ, সংবাদ কী ?

সুনন্দ : সংবাদ ? সেই একই। আর্য অগ্নিভূতির পরাজয়…

মেতার্য : আর শ্রমণ দীক্ষা গ্রহণ।

সোমিল : আমার সেই আশঙ্কাই হয়ে ছিল ওর মুখ দেখে। ভগ্ন দূতের মতো ওর প্রবেশ।

বায়ুভূতি : [দাঁড়িয়ে] আমি তবে চলি।

মেতার্য : ওত ব্যস্ত হয়ে একা যাবেন না, বায়ুভূতি। শত্রু পক্ষ অত্যন্ত কুশলী। সম্মিলিত ভাবে যাওয়াতেই আমাদের মঙ্গল।

ব্যক্ত : ঠিক। আমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে একসঙ্গে সেখানে যাই এবং সব দিক হতে মহাবীরকে আক্রমণ করি।

মেতার্য : কে নাম দিয়ে ছিল মহাবীর। দেখছি কাজেও তাই।

বায়ুভূতি : হাসির কথা নয় মেতার্য। এ আমাদের কলঙ্ক। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে এসো সকলে। [প্রস্থানোদ্যোত]

সোমিল : কিন্তু আর্য বায়ুভূতি, আপনারা সকলে যদি সেখানে একসঙ্গে পরাজিত হন তা হলে ?

'বায়ুভূতি : [বেরুতে বেরুতে] তা হলে আর্য ইন্দ্রভূতিকেই আমরা অনুসরণ করব।

[সোমিল ও সুনন্দ ছাড়া সকলে চলে যাবে]

সোমিল : সুনন্দ !

সুনন্দ : যজ্ঞ শালার দরজা এবার বন্ধ করুন। ওঁরা কেউই সেখান হতে ফিরে আসবেন না।

মহাবীর বলেছিলেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

অহিংসা সম্বন্ধীয়

নিজের জীবন সকল প্রাণীর প্রিয়,
তারা তোমারই মত
সুখ দুঃখ অনুভব করে।
তাই কাউকে হত্যা করো না,
তাদের ভয় ও বৈর হতে রক্ষা কোরো।

সমস্ত জীব
বেঁচে থাকতে চায়,
মৃত্যু কেউ চায় না।
জীব হত্যা তাই পাপ,
সৎব্যক্তি জীব হত্যা করেন না।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
স্থাবর বা ত্রস,
কোনো রকম প্রাণীকেই
হত্যা করো না, বা করিও না।

যে নিজে হত্যা করে,
বা অন্তকে দিয়ে করায়,
বা হত্যার অনুমোদন করে,
সে বৈর বৃদ্ধি করে।

পৃথিবীর ছোট বড় প্রাণীকে
যে নিজের মতো মনে করে
সে পৃথিবীকে জানে ;
সেই জ্ঞানী যে নিজেকে
প্রমত্তদের মধ্যে সংযত রাখে।

সত্য সম্বন্ধীয়

যিনি সংযত
তিনি যা দেখেছেন তাই বলবেন,
অতিশয়োক্তি করবেন না,
অস্পষ্টও কিছু রাখবেন না,
সোজাসুজি বলবেন,
সমস্তটা বলবেন,
বোধগম্য করে বলবেন,
তাতে আবেগ বা উচ্ছ্বাস থাকবে না।

আমরা করব,
আমরা বলব,
আমাদের হবে,
এগুলি আপাত সত্য—
এ সত্যও যারা বলে
তারা পাপ করে।
তাই যারা নির্জলা মিথ্যা বলে
তারা আরো বেশী পাপ করে।

জ্ঞানীরা
মিথ্যা বলা গর্হিত বলেছেন
কারণ তা মানুষের মনে

অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে,
মিথ্যা তাই সর্বদা পরিহার কোরো।

নিজের জন্য বা পরের জন্য,
ভয়ে বা ক্রোধে,
মিথ্যে কথা বোলো না,
বা কাউকে দিয়ে বলিও না।

এমন কি যা সত্য
অথচ অন্যকে আঘাত করে
সে সত্যও বোলো না।

অন্ধকে অন্ধ,

বধিরকে বধির বলাও
দূষণীয়।

সন্তোষ সম্বন্ধীয়

যেমন যেমন লাভ হতে থাকে
তেমনি তেমনি লোভ,
লোভ লাভের সঙ্গে বাড়তে থাকে।
প্রয়োজন ছিল মাত্র
দু মাষা সোণার,
এখন লক্ষ মাষাতেও কুলোয় না।

যার সন্তোষ নেই,
সোণা ও রূপোর পাহাড়ও তাকে
পরিতৃপ্ত করতে পারে না;
চাওয়া আকাশের মতো অসীম।

ধন-ধান্য-ভরা পৃথিবীও
যদি কাউকে দেওয়া হয়,
তবু সে সন্তুষ্ট হবে না ;
সন্তোষ তাই অনুশীলন করো।

প্রতিমাসে
হাজার হাজার গরু যে দান করে,
তার চাইতে যে সন্তোষ অনুশীলন করে
সে শ্রেষ্ঠ।

[ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

[২য় খণ্ড]

॥ ১ ॥

রাজ্য উত্তরাধিকারীর জন্ম সময়ে আনন্দোৎসব করা জয়পুরের অধিবাসীদের পরম্পরাগত রীতি ছিল। তাই যখন রাজা সিংহকুমারের প্রধানা মহিষীর গর্ভে সেই উত্তরাধিকারীর আসবার সম্ভাবনা দেখা দিল তখন জয়পুরের অধিবাসীরা সেই আনন্দোৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত হল।

কিন্তু তবুও রাজমহিষীর গর্ভে যখন প্রথম পুত্রের জন্ম হল তখন সেকথা সাধারণে প্রচারিত হতে পেল না। রাজমহিষী পুত্রের জন্ম দিলেন ঠিকই কিন্তু সেকথা সর্বতোভাবে গোপন করে রাখলেন। শুধু তাই নয় তাঁর বিশ্বস্ত দাসীকে ডেকে বললেন, যে পুত্র আমার স্বামীর ভবিষ্যতে অনিষ্টাচরণ করবে সে পুত্রে আমার প্রয়োজন নেই। তুই একে রাজপ্রাসাদের বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে আয়।

দাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, দেবী, এই পুত্র ভবিষ্যতে পিতার অনিষ্টাচরণ করবে এ আপনার ধারণা মাত্র। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে জন্মমাত্রই পুত্রের পরিত্যাগ কি নিষ্ঠুর হবে না? এর জন্য হয়ত পরে আপনাকে পশ্চাত্তাপ করতে হতে পারে।

কিন্তু মহারাণী একটা কথাও কানে নিলেন না। যে পুত্র গর্ভে প্রবেশের সময়ই তাঁর মনে হয়েছে যে কালনাগ গর্ভে প্রবেশ করল, যার আমায় স্বামীর বুকের মাংস ভক্ষণের তাঁর দোহদ হয়েছে, তার কাছে তিনি আর কি আশা করেন? তাই তিনি সেকথা দাসীকে বুঝিয়ে বললেন। বললেন, যে তাঁর

গর্ভে পুত্ররূপে কোনো শত্রু প্রবেশ করেছে। তার হাত হতে তাঁর স্বামীকে রক্ষা করা তাঁর পবিত্র কর্তব্য।

দাসী তখন ভারী দুর্ভাবনায় পড়ে গেল। যুক্তিতে সে দেবীর সঙ্গে পেরে উঠছে না কিন্তু তার মনে হচ্ছে মহারাণী ভুল করছেন। কিন্তু সেত দাসীমাত্র। মহারাণীর আদেশ তাকে পালন করতেই হবে। তাই তার যত দুশ্চিন্তা।

দাসীর সেই অবস্থা দেখে মহারাণী বললেন, তোর কোনো ভয় নেই। মন্ত্রীকে বলেদে রাণী মৃতপুত্রের জন্ম দিয়েছেন। আনন্দোৎসব বা শোক কোনো কিছুরি দরকার নেই।

বাধ্য হয়ে তাই দাসীকে শিশুটি তুলে নিয়ে বাইরে যেতে হল।

কিন্তু ভাগ্যকে কে পরিবর্তিত করতে পারে? দাসীর সঙ্গে পথে রাজা সিংহকুমারের দেখা হয়ে গেল। দাসী সমস্ত বিষয় গোপন রাখবারও চেষ্টা করল। কিন্তু তখন তার কোনো বুদ্ধিই কাজ করছিল না। একেত অনিচ্ছা সত্বে সে শিশুটীকে বাইরে ফেলে দিয়ে আসতে যাচ্ছিল তারপর এই ঘৃণ্য কাজে তার মনও সায় দিচ্ছিল না। তাই সামান্য কথাতেই রাজা সিংহকুমার সমস্ত পরিস্থিতি বুঝে নিলেন।

রাজা তখন দাসীকে নিয়ে অন্তঃপুরে এলেন।

রাণী তখন রাজাকেও বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, যে পুত্র শুভ ভাব নিয়ে আসেনি তাকে পরিত্যাগ করাই মঙ্গল।

রাজা প্রত্যুত্তরে কর্মফলের কথা বললেন। বললেন, ভবিষ্যতে যদি আমার অনিষ্ট হবারই থাকে তবে তা কোনো না কোনো ভাবে হবেই। তা থেকে বাঁচবার জন্য এই শিশুর হত্যা, নিষ্ঠুরতাই নয়, কাপুরুষতাও।

তিনি আরো বললেন, ধরেই নিচ্ছি এই পুত্র হতে আমার অনিষ্ট হবে। কিন্তু যত দিন আমার হাতে ক্ষমতা ও দেহে শক্তি রয়েছে ততদিন ও আমার কিছুই করতে পারবে না। রাজ্য ও শক্তির লোভেই রাজপুত্ররা সাধারণতঃ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে। তাই ও বড় হতেই আমি যদি স্বেচ্ছায় ওর হাতে রাজ্যভার তুলে দি তবে সে সম্ভাবনা আর থাকবে না। তাছাড়া, অনিষ্টের আশঙ্কায় সর্বদাই যদি ভীত হয়ে থাকি তবে সমস্ত পৃথিবীকেই আমার শত্রু বলে ধরে নিতে হয়। সেই অবস্থায় মানুষের সুখ শান্তির লেশমাত্রই

থাকে না। তাই আমিও বলি তুমি এই আশঙ্কাকে মন হতে সর্বতোভাবে দূর করে দাও।

আত্মার কেউ অনিষ্ট করতে পারে না সেকথাও রাজা তাঁকে বোঝালেন। তারপর দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। রাজার তখন মনে হল, রাণীর মনে যেন পাশ্চাত্তাপ হয়েছে।

রাজা তখন সুস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, কুসমাবতী, তোমার কি সেদিনের কথা মনে পড়ে যেদিন তুমি কুমারী ছিলে ও সখীদের সঙ্গে উদ্যানে খেলা করতে যাচ্ছিলে। তারপর আমায় দেখে তোমার অবস্থা ন যযৌ ন তস্থৌর মতো হয় পড়ল। আমার কাছ হতে লজ্জায় পালিয়ে যেতে চাইলে কিন্তু তোমার পা উঠল না। তুমি বারবার পেছন ফিরে চাইলে। তাই দেখে তোমার সখীরা তোমাকে মধুর বিদ্রূপ করতে লাগল।

তারপর বিরহিনী এক হংসীর চিত্র এঁকে তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিলে। বিরহের তাপে তার কোমল গ্রীবা কেমন যেন নুয়ে পড়েছিল। তার তলায় তোমার প্রিয় সখীরা একটা শ্লোকও রচনা করে দিয়েছিল।

লজ্জিতভাবে মহারাণী বললেন, আর তুমি সেই বিরহিনী হংসীর পাশে এক হাঁসের চিত্রও অঙ্কিত করে দিয়েছিলে তাও আমি ভুলিনি।

রাজা বললেন, কুসুমাবতী, আমাদের জীবনের সেই বসন্ত। সেই বসন্ত-কালেই তোমার আমার প্রথম পরিচয়। তারপর সেই প্রেম বর্দ্ধিতই হয়েছে দিনের পর দিন। সেই ভালবাসারই পরিণাম এই শিশু। এই শিশু যে তাই কোনো দিন নিষ্ঠুর হবে তা আমি ভাবতেই পারি না। যে কাউকে দুঃখ দেয় নি সে কেন দুঃখ পাবে? তার পরও সে যদি দুঃখ পায় তবে বুঝতে হবে তা তার প্রারব্ধের জন্য। এবং সেই দুঃখের আমাদের হাসিমুখে সম্মুখীন হওয়াই কি কর্তব্য নয়?

পিতার হৃদয় কঠোর হতে পারে কিন্তু মার হৃদয় কখনো না। তাই যখন রাণী কুসুমাবতী দাসীর কাছ হতে পুত্রকে নিজের কোলে ফিরিয়ে নিলেন তখন তাঁর হৃদয়ে বাৎসল্য রস আবার প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছেন বা তাঁর ভয়ঙ্কর দোহদ হয়েছে তাতে এর কি দোষ? ক্ষণিক আবেগে একে পরিত্যাগ করতে গিয়ে তিনি কি নির্বুদ্ধিতাই না করেছেন।

সে তাঁর হৃদয়ের দুর্বলতা মাত্র। আমি যখন কারু অনিষ্ট করিনি তখন আমার গর্ভে কেন কুপুত্র আসবে এই চিন্তা করে তিনি তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন।

॥ ২ ॥

বৈরাগ্য যে কেবল ধর্মক্ষেত্রেই উৎপন্ন হয়ে থাকে তা নয়, কখনো কখনো তা যুদ্ধক্ষেত্রেও উৎপন্ন হয় যেখানে রক্তপিপাসা শান্ত করতে হৃদয় উন্মত্ত হয়ে ওঠে বা জয় ও স্বর্গের নেশা সমস্ত অন্তরকে পেয়ে বসে।

সিংহকুমার তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিয়েছেন যে তারা যেন, যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত না হয় বা যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মত্তের মতো বিচরণ না করে। তাঁর দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তারা যেন ছাউনির বাহির না হয় ও অস্ত্রধারণ না করে।

সেনাপতিরাও ভাবতে আরম্ভ করেছেন রাজার কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, তা না হলে থেকে থেকে তিনি এ ধরণের আদেশ জারী করবেন কেন? সৈন্যরা যদি যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মত্তের মতো বিচরণই না করবে তবে তাদের হাটে বাজারে ঘুরতে দেওয়াই উচিত ছিল। আর যদি অস্ত্র ধারণই না করবে তবে তাদের এতদূর টেনে আনাই বা কেন? কাল সকালেই হয়ত আবার আদেশ দেওয়া হবে সৈন্যরা যেন লুটপাট না করে, কারুর গায়ে হাত না দেয়। তবে কি তারা এখানে তীর্থ যাত্রা করতে এসেছে? যদি লুটপাট করে ধনরত্ন নিয়ে ঘরেই না ফিরবে তবে সমাধি করে এখানে বসে গেলেই হয়! এর চেয়ে ভালো ছিল যদি যুবরাজ তাদের অধিনায়কত্ব নিয়ে আসতেন। বয়সের জন্যই বোধ হয় সিংহ মহারাজের রক্ত এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. III. No. 6 : Sraman : October 1975

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
তৃতীয় বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৮২ ॥ সপ্তম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

সহস্রফণা পার্শ্বনাথ

রণকপুর, দক্ষিণ রাজস্থান

ভগবান পার্শ্বনাথ

পূরণচাঁদ নাহার

বর্ত্তমান সময় হইতে অষ্টাবিংশতি শতাধিক বর্ষ পূর্বে ভারতের ধনাঢ্যতম পুরাতন নগরী বারাণসীতে ইক্ষ্বাকু বংশীয় অশ্বসেন নৃপতির ঔরসে ও রাজ্ঞী বামাদেবীর গর্ভে পৌষ মাসের কৃষ্ণা দশমী তিথির মধ্য রাত্রে জৈনগণের ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থংকর ভগবান পার্শ্বনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুশস্থলাধিপতি রাজা প্রসেনজিতের কন্যা প্রভাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ভগবান পার্শ্বনাথ ৩০ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে যাপন করিয়া সর্বপরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক দীক্ষা গ্রহণ করেন ও ঘোর তপশ্চরণে রত হন। ইঁহার তপশ্চর্যাকাল মাত্র ৮৩ দিবস ব্যাপী ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি দৈবিক, ভৌতিক, মানুষিক প্রভৃতি অনেক প্রকার উপসর্গের মধ্যেও আত্মধ্যান হইতে বিচলিত হন নাই। ৮৩ দিবসান্তে ইনি লোকালোক প্রকাশক পূর্ণ কৈবল্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। এই জীবন্মুক্ত কৈবল্য অবস্থায় ৭০ বৎসর পর্যন্ত তিনি তীর্থংকর রূপে ধর্ম প্রচার করিয়া একশত বৎসর বয়ঃক্রমে খৃঃ পূঃ ৭৭৭ বর্ষে শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে পরম নির্বাণ লাভ করেন। ইহাই ভগবান পার্শ্বনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিছু সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ভগবান পার্শ্বনাথকে পৌরাণিক বা কাল্পনিক ব্যক্তিরূপে মনে করিতেন। কিন্তু অধুনা প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ গবেষণার ফলে, এই মত পরিবর্তিত হইয়াছে ও পার্শ্বনাথ ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন।[১] এক্ষণে Prof. Jacobi, Dr. V. A. Smith, Dr. Guerinot, Dr. Glasenapp প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের মতে অন্তিম তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের পূর্বে ভগবান পার্শ্বনাথ প্রচারিত চতুর্যাম ধর্ম প্রচলিত ছিল। এই চতুর্যাম ধর্মই বর্ত্তমান জৈনধর্মের মূলভিত্তি এবং ভগবান মহাবীরের মাতাপিতাও এই ধর্মই পালন

১ *Sacred Books of the East*, Vol. XLV, *Jaina Sutra*, Part II, P. XXI, Intro.

করিতেন, পরে ভগবান মহাবীর পঞ্চযাম ধর্ম প্রচার করেন। প্রায় তিন হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল তথাপি ভগবান পার্শ্বনাথের ব্যক্তিত্বের স্মৃতি জৈন-হৃদয়ে, জৈন-সাহিত্যে ও জৈন-ভাস্কর্যে অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছে। জৈনদিগের পবিত্র কল্পসূত্রের প্রথমাংশে যে তীর্থংকরদিগের জীবনীগুলি আছে তাহাতে পার্শ্বনাথের মাত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁহার বিস্তৃত জীবনী আরও অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) বিক্রমসম্বৎ ১১৩৯ পদ্মসুন্দরগণি-কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র (সংস্কৃত)
(২) " ১১৬৫ দেবভদ্র সূরি-কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র (প্রাকৃত)
(৩) " ১২২০ হেমচন্দ্র আচার্য-কৃত ত্রিষষ্ঠি-শলাকাপুরুষ চরিত্রে পার্শ্বনাথ চরিত্র, ৯ম পর্ব (সংস্কৃত) [জৈনধর্ম প্রসারক সভা, ভাব নগর হইতে প্রকাশিত]
(৪) " ১২৭৭ মাণিক্যচন্দ্র-কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র (সংস্কৃত)
(৫) " ১৪১২ ভাবদেব সূরি-কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র (সংস্কৃত) [ডাঃ ব্লুমফিল্ড সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। মূল যশোবিজয় গ্রন্থ মালায় বেনারস হইতে প্রকাশিত]
(৬) " ১৬৩২ হিম বিজয়গণি-কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র (সংস্কৃত) [শ্রীমোহনলাল জৈন গ্রন্থমালা বোম্বাই হইতে প্রকাশিত]
(৭) " ১৬৫৪ উদয়গণি-কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র (সংস্কৃত) [জৈনধর্ম প্রসারক সভা, ভাবনগর হইতে প্রকাশিত]
(৮) বিজয়চন্দ্র-কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র (সংস্কৃত)
(৯) সর্বানন্দ-কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র (সংস্কৃত)

দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ে কয়েক জন লেখকও পার্শ্বনাথ চরিত্র রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদিরাজ-কৃত পার্শ্বনাথ চরিত্র মাণিক্যচন্দ্র গ্রন্থমালায়

প্রকাশিত হইয়াছে ও পার্শ্বনাথ পুরাণ নামক গ্রন্থের ভূধর কবি বিরচিত ভাবানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের ন্যায় জৈনগণও তাঁহাদিগের উপাস্য তীর্থংকরগণের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার স্তুতি-স্তবনাদি রচনা করিয়া থাকেন। এই প্রথা প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু অন্যান্য তীর্থংকর-গণের অপেক্ষা ভগবান পার্শ্বনাথের স্তুতি, স্তোত্র, কবিতা, ভজনাদি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। পুরাকালের কি প্রাকৃত, কি সংস্কৃত স্তব-স্তোত্রাদি হউক, কিংবা বর্তমান দেশী ভাষায় রচিত নানাবিধ ভক্তিরস পূর্ণ পদাবলী হউক, ভগবান পার্শ্বনাথের নামের প্রাধান্য সর্বত্রই দৃষ্টি গোচর হয়। অতএব ভগবান পার্শ্বনাথকে জৈনধর্মের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কল্পসূত্রে তাঁহাকে পুরুষাদানী (পুরুষ প্রধান) বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। জন-সাধারণের মধ্যেও জৈনদিগের ভগবান পার্শ্বনাথের নাম যতদূর প্রসিদ্ধ অন্যান্য জৈন তীর্থংকরগণের নাম ততদূর খ্যাতি লাভ করে নাই। হাজারীবাগ জেলায় জৈনদিগের বিখ্যাত সম্মেত শিখর নামক যে তীর্থস্থান অবস্থিত আছে, ঐ পর্বতে ২৪টি জৈন তীর্থংকরের মধ্যে ২০ জন তীর্থংকর নির্বাণ লাভ করিয়া-ছিলেন, এইরূপ জৈন শাস্ত্রে উল্লেখ থাকা সত্বেও মাত্র পার্শ্বনাথের নামেই অদ্যাবধি ঐ পাহাড় 'পরেশনাথ পাহাড়' নামে পরিচিত। ভগবান পার্শ্বনাথই যে জৈনদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা, এই ধারণা জৈনেতরগণের মধ্যে এখনও এতদূর বদ্ধমূল যে, তাঁহারা যে কোন জৈন মন্দিরকে পরেশনাথ মন্দির বলিয়াই আখ্যা দিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ কলিকাতার মাণিকতলায় হালসীবাগানস্থিত স্বর্গীয় রায় বদ্রীদাস বাহাদুর প্রভৃতির নির্মিত জৈন মন্দির গুলি পরেশনাথের মন্দির বলিয়া সুপরিচিত অথচ তথায় একটি মন্দিরও ভগবান পার্শ্বনাথের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই মন্দিরগুলির মধ্যে একটি ৮ম তীর্থংকর শ্রীচন্দ্রপ্রভ ও দ্বিতীয়টি ১০ম তীর্থংকর শ্রীশীতলনাথ এবং তৃতীয়টি ২৪তম তীর্থংকর শ্রীমহাবীরের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই মহানগরীর মধ্যে বড়বাজার কটনষ্ট্রীটস্থিত জৈন মন্দির হইতে প্রতি বৎসর কার্তিকী শুক্ল পূর্ণিমায় যে রথ মহোৎসবের শোভাযাত্রা বহির্গত হয়, তাহা 'পরেশনাথের রথ ও শোভাযাত্রা' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, অথচ ঐ রথ মহোৎসবে যে

প্রতিমা পূজিত হয়, তাহা পঞ্চদশ তীর্থংকর ভগবান ধর্মনাথের। ভারতের উত্তর ও পশ্চিম এবং গুজরাট প্রান্তের প্রসিদ্ধ নগরাদি ও জৈন তীর্থস্থান, যেগুলি আমি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছি, ঐ সকল স্থানে প্রায় সর্বত্রই ভগবান পার্শ্বনাথের মন্দির দেখিয়াছি, যেরূপ ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দুদিগের শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্তি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে অভিহিত, সেইরূপ শ্রীপার্শ্বনাথ-মূর্তিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে আখ্যাত হইয়া জৈন ভক্তগণের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। এইরূপ বিভিন্ন নামের পার্শ্বনাথের মূর্তির সংখ্যাও শতাধিক দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে যেগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ, সেইগুলির তালিকা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করতঃ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি শেষ করিব।

জৈনদিগের উপান্ত্য তীর্থংকরগণের মধ্যে কি কারণে কেবল পার্শ্বনাথই এইরূপে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অলঙ্কৃত হইয়া পূজিত হইতেছেন, তাহার কোন গূঢ় তত্ত্ব এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। ভগবান পার্শ্বনাথের শিষ্য পরম্পরায় শ্রীরত্নপ্রভ সূরি রাজপুতানাস্থিত ওশিয়া নগরে অনেকগুলি রাজপুতদের জৈন ধর্মে দীক্ষিত করেন, ইহারাই ওশওয়াল নামে অভিহিত। এই ওসওয়াল বংশেই প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠের উৎপত্তি এবং এই ওসওয়ালগণ অদ্যাবধি বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া ভারতের নানাস্থানে ও অন্যান্য সুদূর প্রান্তে বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা অন্যান্য তীর্থংকর অপেক্ষা পার্শ্বনাথকেই যে অধিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবেন—ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমি যতদূর জ্ঞাত আছি, শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণই ভগবান পার্শ্বনাথকে নানা প্রকার নাম ভেদে অর্চনা করিয়া থাকেন। যদিও দিগম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত জৈনগণ বর্তমানে এই সমস্ত শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত পার্শ্বনাথের মন্দিরগুলিতে পূজা-অর্চনাদি করিতেছেন তথাপি তাঁহাদের শ্বেতাম্বরগণের ন্যায় শ্রীপার্শ্বনাথের মূর্তির পৃথক্ পৃথক নামভেদে পূজার্চনার বিবরণ পাওয়া যায় না।

ভগবান বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধে বর্তমান যুগে নানা ভাষায় বহু সংখ্যক ছোট বড় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত উপরোক্ত কয়েকটি পুস্তক ব্যতীত জৈন কি জৈনেতর কোন বিদ্বান কর্তৃক আধুনিক প্রণালীতে রচিত ঐতিহাসিক গবেষণা পূর্ণ ভগবান পার্শ্বনাথের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয় নাই। আশা করা যায়, এরূপ অত্যাবশ্যক গ্রন্থ শীঘ্রই সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত তীর্থংকর পার্শ্বনাথের আকারাদিক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নামের তালিকা।

	নাম		স্থান
১।	অঞ্জারা পার্শ্বনাথ		অঞ্জার (কাঠিয়াওয়াড়)
২।	অন্তরীক্ষ	,,	অকোলার নিকট (বেরার)
৩।	অমিঝরা	,,	গিরনার (কাঠিয়াওয়াড়)
৪।	উমরবাড়ী	,,	সুরত
৫।	ওয়াডী	,,	পাটন (গুজরাট)
৬।	করেড়া		করেড়া (উদয়পুরের সন্নিকট, রাজপুতানা)
৭।	কলিকুণ্ড		খম্বাৎ (গুজরাট)
৮।	কল্যাণী		পালনপুর (গুজরাট)
৯।	কংসারী		খম্বাৎ
১০।	কাপড়া		গুজরাট
১১।	কেশরীয়া		টীমা (পালনপুর)
১২।	কোকা		খম্বাৎ
১৩।	গম্ভারী		গুজরাট
১৪।	গাভলিয়া		মাণ্ডন (গুজরাট)
১৫	গোড়ী		আজমীর, উদয়পুর, পালি (মারওয়াড়), বিঠুরী (মারওয়াড়), বোম্বাই, মুর্শিদাবাদ
১৬।	ঘৃতকল্লোল	,,	কচ্ছদেশ
১৭।	চম্পা	,,	খম্বাৎ
১৮।	চিন্তামণি	,,	লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মুর্শিদাবাদ, বিকানীর, মেড়তা, যৈশল্মীর, পাটন, সাদরী
১৯।	জগবল্লভ	,,	ঋষভদেব (মেবার), আহমেদাবাদ
২০।	জীরাওলা	,,	সিরোহী (রাজপুতানা), আহমেদাবাদ
২১।	জোটবা	,,	চানস (মহেসানা, গুজরাট)
২২।	টাঁকলা	,,	খম্বাৎ
২৩।	দাদা	,,	বরোদা

নাম		স্থান
২৪। নওলাক্ষা	,,	পালি
২৫। নবখণ্ডা	,,	পাটন, ঘোঘাবন্দর (কাঠিয়াওয়াড়)
২৬। নব পল্লব	,,	খম্বাৎ
২৭। নাকোড়া	,,	বালোতরা (মারওয়াড়)
২৮। নাডলাই	,,	নাডলাই (মারওয়াড়)
২৯। পঞ্চাসরা	,,	পাটন
৩০। পল্লবিয়া	,,	পালনপুর
৩১। ফলবর্দ্ধী	,,	ফলোদী (মারওয়াড়)
৩২। বরকণা	,,	বরকণা (মারওয়াড়)
৩৩। বিজয়-চিন্তামণি		আহমেদাবাদ
৩৪। ভদ্রাবতী	,,	বেরার
৩৫। ভাভা	,,	পাটন
৩৬। ভীড়ভঞ্জন	,,	উনাভা (উত্তর গুজরাট)
৩৭। মকসী	,,	খেড়া (গোয়ালিয়র, মধ্যভারত)
৩৮। মনমোহন	,,	পাটন
৩৯। মনরঙ্গা	,,	মহেসানা
৪০। মহোরী	,,	টাঁটোই (গুজরাট)
৪১। মোরইয়া	,,	আহমেদাবাদ
৪২। লোঢ়ন	,,	ডভোই (গুজরাট)
৪৩। লোদ্রপুর	,,	লোদ্রবা (যৈশল্মীর)
৪৪। শামলা বা শামলীয়া		পাটন, মুর্শিদাবাদ
৪৫। শেষফণা	,,	আহমেদাবাদ, জুনাগড়
৪৬। সহস্রফণা	,,	পাটন, যোধপুর
৪৭। শঙ্খেশ্বর	,,	পাটন, বিকানীর
৪৮। সহস্রকূট	,,	পাটন
৪৯। সোম চিন্তামণি		খম্বাৎ
৫০। স্তম্ভন	,,	পাটন

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা থেকে পুনর্মুদ্রিত

মহাবীর বলেছিলেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধীয়

স্ত্রীলোক দেখা মাত্রই
তুমি যদি তাকে কামনা কর
তবে বায়ুবিদ্ধ হড় তৃণের মতো
কখনই স্থিরতা লাভ করবে না

তাই যে তপঃনিরত
সে স্ত্রীলোকের
রূপ, লাবণ্য, হাব-ভাব
হাস্ত-পরিহাস,
বিলাস ও বিভ্রম
চেয়ে দেখবে না
বা মনেও তাদের
স্থান দেবে না।

সমস্ত নদীর মধ্যে
বৈতরণী নদী
পার হওয়া যেমন দুষ্কর,
সমস্ত কামনার মধ্যে
স্ত্রীলোকের কামনা
জয় করাও তেমনি দুষ্কর।

দুঃশীল চরিত্র শ্রমণকে
মৃগচর্ম বা নগ্নতা,

জটা, পীতবর্ণ সংঘাটি
বা মুণ্ডিত মাথা
রক্ষা করতে সমর্থ নয়।

স্ত্রীলোকের দিকে না চাওয়া,
তাদের কামনা না করা,
তাদের বিষয়ে কথা না বলা,
বা চিন্তা না করা
উত্তম ধ্যানের সহায়ক
ও যে ব্রহ্মচর্য পালনে উদ্যত
তার অনুকূল।

যে ব্রহ্মচর্য পালনে উদ্যত
সে স্ত্রী-কথা পরিহার করবে
কারণ তা মনকে হ্লাদিত
ও কামনাকে উদ্‌দৃক্ত করে।

যে ব্রহ্মচর্য পালনে উদ্যত
সে স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা
পরিহার করবে
এবং বার বার তাদের সঙ্গে
কথা বলবে না।

যে ব্রহ্মচর্য পালনে উদ্যত
সে স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের
চারুতার দিকে
বা তাদের বিভ্রম উৎপাদক কটাক্ষের দিকে
চেয়ে দেখবে না,

তাদের স্নেহপূর্ণ বাক্যও সে
কানে শুনবে না।

যে ব্রহ্মচর্য পালনে উদ্যত
সে স্ত্রীলোকের
কূজন, ক্রন্দন, গীত,
হাস্য, সীৎকার ও বিলাপ
শোনা হতেও বিরত থাকবে।

যে ব্রহ্মচর্য পালনে উদ্যত
সে পূর্বানুভূত
স্ত্রীলোকের হাসি, ক্রীড়া, রতি,
দর্প ও বিত্রাসন
স্মরণ করবে না
বা তার চিন্তা করবে না।

যে ব্রহ্মচর্য পালনে উদ্যত
সে পুষ্টিকর আহার
গ্রহণ করবে না
কারণ তা কামনাকে বর্দ্ধিত করে।

বহু ইন্ধনপূর্ণ বনে
বাতাসের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে
দাবাগ্নি যেমন শান্ত হয় না,
অপরিমিতভোজী ব্রহ্মচারীর
ইন্দ্রিয়াগ্নিও তেমনি শান্ত হয় না,
অপরিমিত ভোজন হিতকর নয়।

যা শ্রুতিসুখকর
তাতে যেন তোমার
আগ্রহ না থাকে,
পরুষ স্পর্শের জন্য
নিজের শরীরকে তৈরী কর।

ইন্দ্রিয় বিষয়ের মধ্যে
সরাগত্ব বা বিরাগত্ব নেই,
তাদের প্রতি
অনুরাগ ও বিরাগ বশতঃই
মানুষ তাতে অনুরক্ত
ও বিরক্ত হয়।

যে সরাগ
ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়
তার দুঃখের কারণ হয়,
যার অনুরাগ বিরাগ নেই
তার তা দুঃখের
কারণ হয় না।

স্ত্রীলোকের দেহ, রূপ ও লাবণ্য
যে কামনা করে,
সে দুঃখই পায়।
যে দেহ, রূপ ও লাবণ্য কামনা করে
সে কি করে সুখী হতে পারে?
ভোগের সময়ও সে দুঃখই পায়
যার প্রস্তুতিতেও
তাকে দুঃখই পেতে হয়েছে

যে রূপ কামনা করে
সে অকালেই বিনষ্ট হয়।
দীপশিখায় আকৃষ্ট হয়ে
পতঙ্গ যেমন ছুটে যায়,
সেও তেমনি কামার্ত হয়ে
মৃত্যুর দিকেই ছুটে যায়।

যার রূপে অনুরাগ বিরাগ নেই
তার দুঃখও নেই,
যদিও সে এই সংসারেই থাকে,
তবু জল যেমন পদ্মপাতাকে
স্পর্শ করে না,
তেমনি বেদনাও তাকে
স্পর্শ করে না।

পরিগ্রহ সম্বন্ধীয়

যে জ্ঞানী
সংযম রক্ষার জন্যই সে কেবল
উপকরণ দ্রব্য রক্ষা করে,
কারণ আত্ম দেহেই
তার মমত্ব থাকে না।

কোনো দ্রব্য কাছে রাখা
পরিগ্রহ নয়,
পরিগ্রহ তাতে মমত্ববোধ।

রূপ চোখের বিষয়,
যখন তা সুখকর

তাতে অনুরাগ জন্মে,
যখন কষ্টকর
তখন বিরাগ।
যে উভয় অবস্থাতে সম থাকে,
সেই যথার্থতঃ রাগদ্বেষহীন
বা মমত্বহীন।

শব্দ কানের বিষয়,
যখন তা সুখকর
তাতে অনুরাগ জন্মে,
যখন কষ্টকর
তখন বিরাগ।
যে উভয় অবস্থাতে সম থাকে,
সেই যথার্থতঃ রাগদ্বেষহীন
বা মমত্বহীন।

গন্ধ নাকের বিষয়,
যখন তা সুখকর
তাতে অনুরাগ জন্মে,
যখন কষ্টকর
তখন বিরাগ।
যে উভয় অবস্থাতে সম থাকে,
সেই যথার্থতঃ রাগদ্বেষহীন
বা মমত্বহীন।

স্বাদ জিভের বিষয়,
যখন তা সুখকর
তাতে অনুরাগ জন্মে,

যখন কষ্টকর
তখন বিরাগ।
যে উভয় অবস্থাতে সম থাকে,
সেই যথার্থতঃ রাগদ্বেষহীন
বা মমত্বহীন।

স্পর্শ শরীরের বিষয়,
যখন তা সুখকর
তাতে অনুরাগ জন্মে,
যখন কষ্টকর
তখন বিরাগ।
যে উভয় অবস্থাতে সম থাকে,
সেই যথার্থতঃ রাগদ্বেষহীন
বা মমত্বহীন।

ভাব মনের বিষয়,
যখন তা সুখকর
তাতে অনুরাগ জন্মে,
যখন কষ্টকর
তখন বিরাগ।
যে উভয় অবস্থাতে সম থাকে,
সেই যথার্থতঃ রাগদ্বেষহীন
বা মমত্বহীন।

[ক্রমশঃ

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন-চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

আর্যগণ, বাতাস বইছে একথা কি সত্য ?

হাঁ, সত্য। কিন্তু তাতে কি ?

আর্যগণ, আপনারা কি বাতাসের রঙ ও রূপ দেখতে পান ?

না, বাতাসের রঙ বা রূপ দেখা যায় না।

আর্যগণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শকারী গন্ধ পরমাণু কি আছে ?

হাঁ, আছে।

আর্যগণ, আপনারা কি সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শকারী গন্ধ পরমাণু দেখতে পান ?

না, গন্ধপরমাণু দেখা যায় না।

আর্যগণ, অরণির মধ্যে কি অগ্নি অবস্থান করে ?

হাঁ, করে।

আপনারা কি অরণির অন্তর্গত সেই অগ্নি দেখতে পান ?

না, দেখতে পাই না।

আর্যগণ, সমুদ্রের ওই পারের কি কোনো রূপ আছে ?

হাঁ, আছে।

আর্যগণ, সমুদ্রের ওই পারের রূপ কি আপনারা দেখতে পান ?

না, পাই না।

আর্যগণ, দেবলোকগত রূপ কি আপনারা দেখতে পান ?

না, পাই না।

সেই রকম, আর্যগণ, আপনারা, আমরা বা অন্য কেউ যে বস্তু দেখতে পায় না তা নেই তা বলা যায় না। তা হলে এমন অনেক বস্তু রয়েছে যাদের

নিষেধ করতে হয়। এবং তা করলে আপনাদের লোকের এক বৃহৎ অংশকেই অস্বীকার করতে হয়।

মূদ্দক এভাবে অন্যতীর্থিকদের নিরুত্তর করে বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মূদ্দক অন্যতীর্থিকদের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তা অনুমোদন করে বর্দ্ধমান বললেন, মূদ্দক, অন্যতীর্থিকদের প্রশ্নের তুমি যথার্থ উত্তর দিয়েছ। কোনো প্রশ্ন বা উত্তর না বুঝে শুনে করা বা দেওয়া উচিত নয়। যে না বুঝে শুনে তর্ক করে বা কোনো বস্তু প্রতিপাদন করতে চায়, সে অর্হৎ ও কেবলী নিরূপিত ধর্মের অমর্যাদা করে। মূদ্দক, তুমি ঠিক, উচিত ও যথার্থ উত্তর দিয়েছ।

মূদ্দক আরো কিছুক্ষণ সেখানে বসে ধর্ম চর্চা করলেন। তারপর ঘরে ফিরে গেলেন।

সেই বছরের বর্ষাবাস বর্দ্ধমান রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন।

বর্ষাশেষে রাজগৃহ হতে প্রব্রজন করে বর্দ্ধমান নানা স্থানে পর্যটন করলেন। তারপর বর্ষার আগ দিয়ে আবার রাজগৃহে ফিরে এলেন।

ইন্দ্রভূতি গৌতম একদিন ভিক্ষাচর্যায় গিয়ে গুণশীল চৈত্যে ফিরে আসছিলেন। ঐ সময় কালোদায়ী, শৈলোদায়ী প্রভৃতি অন্যতীর্থিকদের কয়েকজন বর্দ্ধমানের পঞ্চাস্তিকায়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। গত বছর মূদ্দক তাঁদের নিরুত্তর করে দিলেও তাঁদের মনের সংশয় সবটা এখনো যায় নি। তাই গৌতমকে তাঁরা দেখতে পেয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, ধর্মাস্তিকায় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। ভালই হল জ্ঞাতপুত্রের শিষ্য গৌতমও এসে গেলেন। চল এঁকেই আমরা আমাদের সংশয়ের কথা বলি।

তখন তাঁরা গৌতমের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও বললেন, আর্য, আপনার ধর্মাচার্য জ্ঞাতপুত্র ধর্মাস্তিকায় আদি যে পঞ্চাস্তিকায়ের কথা বলেন তার মধ্যে চারটিকে অজীবকায় ও একটীকে জীবকায় বলেন। এ বিষয়ে আমরা কি বুঝব? এর রহস্য আমাদের বলুন।

প্রত্যুত্তরে গৌতম বললেন, দেবানুপ্রিয়, আমরা অস্তিকে নাস্তি বা নাস্তিকে অস্তি বলি না; আমরা অস্তিকে অস্তি এবং নাস্তিকে নাস্তি বলি।

হে দেবানুপ্রিয়, এ বিষয়ে তোমরা নিজেরাই বিচার কর যাতে এর রহস্ত বুঝতে পার।

এই বলে পঞ্চাস্তিকায়ের রহস্তকে আরো রহস্তময় করে দিয়ে গৌতম গুণশীল চৈত্যে ফিরে গেলেন।

অন্যতীর্থিকেরা গৌতমের কথায় কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁরা তখন গৌতমকে অনুসরণ করে বর্দ্ধমান যেখানে বসেছিলেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

বর্দ্ধমান তখন ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। প্রসঙ্গ আসতেই তিনি কালোদায়ীকে সম্বোধন করে বললেন, কালোদায়ি, তোমরা কি পঞ্চাস্তিকায়ের বিষয়ে আলোচনা করছিলে ?

হাঁ, দেবার্য, আপনি পঞ্চাস্তিকায় নিরূপণ করেছেন তা যেদিন হতে জানতে পারি সেদিন হতে তাই নিয়ে সময়ে সময়ে আলোচনা করি।

বর্দ্ধমান বললেন, কালোদায়ি, একথা সত্য যে আমি পঞ্চাস্তিকায় নিরূপণ করেছি। এবং এও সত্য যে আমি চার অস্তিকায়কে অজীবকায় এবং এক অস্তিকায়কে জীবকায়, চার অস্তিকায়কে অরূপীকায় ও এক অস্তিকায়কে রূপীকায় বলি।

ভগবন্, আপনার নিরূপিত এই ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায় বা জীবাস্তিকায়ের ওপর কেউ কি শুতে, বসতে বা দাঁড়াতে পারে ?

না, কালোদায়ি, তা পারে না। শোয়া, বসা বা দাঁড়ানো কেবল পুদ্গলাস্তিকায়ের ওপরই হতে পারে যা রূপী ও অজীবকায়, অন্যত্র নয়।

ভগবন্, পুদ্গলাস্তিকায়ে জীবের দুষ্টবিপাক পাপ কর্ম কি হয়ে থাকে ?

না, কালোদায়ি, তা হয় না।

ভগবন, তবে কি জীবাস্তিকায়ে জীবের দুষ্ট বিপাক পাপ কর্ম হয়ে থাকে ?

হাঁ, কালোদায়ি, কোনোপ্রকার কর্ম কেবল জীবাস্তিকায়েই সম্ভব।

বর্দ্ধমান তখন পঞ্চাস্তিকায়ের বিষয়টী তার কাছে সুস্পষ্ট করে বিবৃত করলেন। শুনে কালোদায়ির নির্গ্রন্থ প্রবচনে শ্রদ্ধা হল। সে নির্গ্রন্থ প্রবচন গ্রহণ করে বর্দ্ধমানের কাছে দীক্ষিত হল।

রাজগৃহের ঈশান কোণে ধনাঢ্যদের প্রাসাদমালায় সুশোভিত নালন্দা নামে

এক উপনগর ছিল। সেই উপনগরে লেব নামে এক ধনাঢ্য শ্রমণোপাসক বাস করত। নালন্দার উত্তর-পূর্ব দিকে লেবর শেষদ্রবিকা নামে এক উদকশালা ছিল। এই উদকশালার নিকটে হস্তিযাম নামে এক উদ্যান ছিল।

একসময় ভগবান বর্দ্ধমান হস্তিযামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় একদিন শেষদ্রবিকার কাছে ইন্দ্রভূতি গৌতমের সঙ্গে পার্শ্বাপত্য শ্রমণ মেতার্য গোত্রীয় উদকের দেখা হল। উদক গৌতমকে দেখতে পেয়ে বললেন, গৌতম, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি। উপপত্তি পূর্বক উত্তর দিন।

গৌতম বললেন, আয়ুষ্মন্, স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করুন।

উদক বললেন, গৌতম, আপনার ধর্মাচার্য শ্রমণোপাসককে এই বলে প্রত্যাখ্যান করান রাজাজ্ঞা আদি কারণে কোন গৃহস্থ বা চোরকে ধরা বা, ছাড়ার অতিরিক্ত আমি ত্রস জীবের হিংসা করব না। আর্য এই প্রকার প্রত্যাখ্যান অতিচার দোষে দুষ্ট। এতে যে প্রত্যাখ্যান করায় বা করে উভয়েই দোষী হয়। কারণ মৃত্যুর পর ত্রস জীব স্থাবর রূপে উৎপন্ন হতে পারে। এজন্য ত্রস রূপে যে অঘাত্য ছিল স্থাবর রূপে সে ঘাত্য হয়ে যায়। তাই প্রত্যাখ্যানে 'ত্রস জীবের' স্থানে 'ত্রসভূত জীবের' হওয়া উচিত। ভূত শব্দের ব্যবহারে সেই দোষ পরিহার করা যায়। গৌতম, আমার কথা কি আপনার ঠিক মনে হচ্ছে না?

গৌতম বললেন, আয়ুষ্মন্ উদক, আমার কিন্তু আপনার কথা ঠিক মনে হচ্ছে না। কারণ এতে বক্তব্যকে আরো জটিল করাই হয়। কারণ সংসারে সংসারী জীব কর্মানুসারে ত্রস হতে স্থাবর, স্থাবর হতে ত্রস রূপে জন্মগ্রহণ করেই। কিন্তু যখন ওই প্রত্যাখ্যান করান হয় তখন সেই সময় যারা ত্রস-কায়রূপে উৎপন্ন হয়েছে তাদেরই প্রত্যাখ্যান করান হয়, এইমাত্র। তাই ভূত বিশেষণ দেবার প্রয়োজন করে না।

গৌতম, 'ত্রস'-র আপনি কি অর্থ করেন? ত্রসপ্রাণ সো ত্রস বা অন্য।

আয়ুষ্মন্ উদক, আপনি যাদের ত্রসভূত প্রাণ বলেন আমরা তাদেরই ত্রস প্রাণ বলি। এ দুইই সমার্থক। আপনার বিচারে ত্রসভূতপ্রাণ ত্রস নির্দোষ, ত্রসপ্রাণ ত্রস সদোষ। কিন্তু আয়ুষ্মন্, যাতে বাস্তবিক কোনো ভেদ নেই,

এরকম বাক্যের একটির খণ্ডন ও অন্যের মণ্ডন করা বৃথাই নয়, মানুষকে আরো বিভ্রান্ত করা। আর্য উদক, ত্রস মরে স্থাবর হয় তাই ত্রস হিংসা প্রত্যাখ্যান কারীর হাতে সেই মরণ স্থাবর হত্যায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় আপনার সে কথাও ঠিক নয়, কারণ ত্রস নাম কর্মের উদয়েই জীবকে ত্রস বলা হয়। আর যখন ত্রস গতির আয়ু ক্ষয় হওয়ায় ত্রসকায়িক শরীর পরিত্যাগ করে স্থাবরকায়িক শরীর গ্রহণ করে তখন স্থাবরকায়িক নাম কর্মের জন্য তাদের স্থাবরকায়িকই বলা হবে।

আয়ুষ্মন্ গৌতম, তবে ত এমন কোনো পর্যায়ই পাওয়া যাবে না যা ত্যাজ্য হিংসার বিষয় হয় আর যখন হিংসার কোনো বিষয়ই থাকে না তখন কার হিংসার প্রত্যাখ্যান করবে। যদি সহসাই সমস্ত ত্রস মরে স্থাবর হয়ে যায় বা স্থাবর ত্রস তাহলে ত্রস হিংসা প্রত্যাখ্যান সে কিভাবে পালন করবে?

আয়ুষ্মন্ উদক, এমন কখনো হয় না যে সহসাই সব ত্রস স্থাবর, ও সব স্থাবর ত্রস হয়ে যায় কিন্তু যদি তর্কের জন্য আপনার কথা স্বীকারও করি তবু বলব যে তাতে ত্রস হিংসার প্রত্যাখ্যানে বাধা হয় না। কারণ স্থাবর পর্যায়ের হিংসায় তার ব্রত খণ্ডিত হয় না এবং সে অধিক ত্রস পর্যায়ের জীবের রক্ষা করে। আর্য উদক, যে সমস্ত শ্রমণোপাসক ত্রস জীবের হিংসা হতে নিবৃত্ত হয় তাদের জন্য কোনো পর্যায়ের হিংসার প্রত্যাখ্যান নয় বলা কি উচিত? এভাবে নির্গ্রন্থ প্রবচনে মতভেদ উপস্থিত করা কি ভালো?

গৌতম ও উদকের আলোচনায় আকৃষ্ট হয়ে সেখানে আরো কিছু পার্শ্বাপত্য শ্রমণেরা এসে উপস্থিত হলেন। তাই দেখে গৌতম বললেন, আর্য উদক, এই বিষয়ে আপনার স্থবির নির্গ্রন্থদেরই আমি জিজ্ঞেস করছি, আয়ুষ্মন্, এই সংসারে এমন অনেকের প্রতিজ্ঞা আছে: জীবন কাল পর্যন্ত শ্রমণের হিংসা করব না। শ্রমণদের কেউ যদি শ্রামণ্য পরিত্যাগ করে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে যায়, সেই অবস্থায় সাধু হিংসা পরিত্যাগকারী সেই গৃহস্থ যদি সেই গৃহস্থ রূপী সাধুর হিংসা করে তবে কি তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে?

না, গৌতম না। তাতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।

নির্গ্রন্থগণ, এই রকমই ত্রস জীব হিংসা পরিত্যাগকারী শ্রমণোপাসক যদি স্থাবরকায়ের হিংসাও করে ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।

নির্গ্রন্থগণ, কোন গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্র সর্বশ্রমণ করে সর্বত্যাগী শ্রমণ হয়ে যায় তবে তাকে সর্বহিংসা পরিত্যাগী বলা যায় কিনা?

হাঁ, গৌতম, নিশ্চয়ই বলা যায়।

কিন্তু সেই শ্রমণ চার বা পাঁচ বছর বা তার কিছু অধিক বা কিছু কম সময় পর্যন্ত শ্রমণ ধর্ম পালন করে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে আসে তবে কি তাকে সর্বহিংসা পরিত্যাগী বলা যাবে?

না, গৌতম না।

কিন্তু এ সেই জীবই যে প্রথমে সর্বহিংসা পরিত্যাগী ছিল কিন্তু এখন নয়। প্রথমে সংযত ছিল এখন নয়। এই রকমই ত্রসকায় হতে স্থাবরকায়ে উৎপন্ন জীব ত্রস নয়, স্থাবরই।

নির্গ্রন্থগণ, কোনো পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকা স্বীয় মত পরিত্যাগ করে নির্গ্রন্থ মত গ্রহণ করে তবে নির্গ্রন্থ শ্রমণ তার সঙ্গে আহারাদি করবে কি করবে না?

করবে, অবশ্য করবে।

সেই শ্রমণ যদি পুনরায় গৃহস্থ হয়ে যায় তবে তার সঙ্গে শ্রমণেরা আহারাদি করবে কি করবে না?

না, করবে না।

শ্রমণগণ, এই সেই জীব যার সঙ্গে প্রথমে আহারাদি করা যেত কিন্তু এখন যায় না। কারণ প্রথমে সে শ্রমণ ছিল এখন নয়। এই রকমই ত্রসকায় স্থাবরকায়ে উৎপন্ন জীব ত্রস হিংসা প্রত্যাখ্যান কারীর বিষয় নয়।

এভাবে গৌতম অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে ত্রস জীব মরে স্থাবর জীব হয় ও তাদের যদি হিংসা হয় ত শ্রমণোপাসকের ব্রত ভঙ্গ হয় এই বাস্তবতায় নিরসন করলেন।

সমস্ত জীব স্থাবর হয়ে গেলে ত্রস জীব হত্যা প্রত্যাখানকারীর ব্রত নির্বিষয় হয়ে যায়—উদকের এই উক্তির খণ্ডন করতে গিয়ে বললেন, শ্রমণগণ, যে সব শ্রমণোপাসক দেশ বিরতি ধর্ম পালন করে শেষে অনশনে সমাধিমরণ প্রাপ্ত হয় ও যে সব শ্রমণোপাসক প্রথমে বিশেষ ব্রত প্রত্যাখ্যান পালন করতে

না পেয়ে শেষে অনশনে সমাধিমরণ বরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাদের মৃত্যু কিরূপ ?

তাদের মৃত্যু প্রশংসনীয়।

যে সব জীব এভাবে মৃত্যু বরণ করে তারা ত্রস প্রাণীরূপে উৎপন্ন হয়। তারাই ত্রস জীব হত্যাপ্রত্যাখ্যানকারী শ্রমণোপাসকের ব্রতের বিষয়।

নির্গ্রন্থগণ, এমন কখনো হয় না যে সমস্ত ত্রস জীব স্থাবর হয়ে যাবে বা সমস্ত স্থাবর জীব ত্রস হয়ে যাবে। তখন কি একথা বলা উচিত যে এমন কোনো পর্যায় নেই যা শ্রমণোপাসকের ব্রতের বিষয় ? আর এই নিয়ে যে মত-ভেদ উপস্থিত করে তা কি সমর্থন যোগ্য ?

উদক তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ও গৌতমের সঙ্গে বর্দ্ধমানের কাছে এলেন। বর্দ্ধমানের প্রবচন শুনে তাঁর কাছে তিনি পঞ্চযাম ধর্মগ্রহণ করলেন।

এই বছরের চাতুর্মাস্য বর্দ্ধমান নালন্দায় ব্যতীত করলেন।

[ক্রমশঃ

আত্মদর্শন

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

[শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা-র 'আত্মাই আত্মার রক্ষক' অবলম্বনে]

বিত্তশালী মগধরাজা
শ্রেণিক নামে বিখ্যাত সেই,
ভ্রমণ-পথে উদয় হলেন
মণ্ডিকুক্ষি উদ্যানেতেই।

সেথায় এসে দেখতে পেলেন
নবীন সে-এক তপস্বীকে
বৃক্ষমূলে আসীন—প্রভা
ছুটছে তো তার দিগ্‌বিদিকে !

রূপ দেখে তার আকৃষ্ট রাজ
মৃত্তিকাতেই আসন নিয়ে—
করজোড়ে কহেন তারে
বিধিমতো প্রণাম দিয়ে :

আর্য, তোমার বয়েস নবীন,
তরুণ দেখি তোমার মুখ,
এই বয়েসেই শ্রমণ কেন
ভাসিয়ে দিয়ে সকল সুখ ?

তরুণ কহে, রাজন, আমি
অনাথ বড়, ছিল না যে—
রক্ষক কেউ, তাই যেছেছি
শ্রেয় এপথ বনের মাঝে !

বিস্মিত আর আশান্বিত
শ্রেণিক শুনে কহেন, তবে
শক্ত ভারা—রক্ষক নেই
এমন রূপবানের ভবে !

যা হোক, তোমার দৈন্ত আমি
দূর করতে জেনেই রাখো—
তোমার রক্ষাকর্তা হব,
কষ্ট তোমার থাকবে নাক'।

পাবে তুমি বন্ধু-স্বজন,
বিষয় সুখের দেখবে শ্রীমুখ,
রক্ষা তোমায় করব আমি,
অনাথ বলে থাকবে না দুখ !

শ্রমণ কহে, নিজেই অনাথ
এমন যিনি, তাঁর কথাতে—
যতই বোকা হোক না সেজন,
সহজে সে আর কী মাতে ?

শ্রেণিক শুনে বিস্মিত, কন—
পূজ্য তুমি বলছ কী সব ?
কী নেই আমার ? সৈন্ত আছে,
রাজ্যে আমার নিত্য পরব !

পরিবার ও পরিজনে
মুখর বাড়ি, আমার আদেশ
মানছে না কে ? অনাথ কিসে ?
সুখের আমার আছে কী শেষ ?

শ্রমণ কহে, রাজন, অনাথ—
অর্থ তুমি জানো না ঠিক,
আমি এবং অন্যে কেন
বলছি শোনো, যা স্বাভাবিক।

কৌশাম্বীর বিত্তশালী
সে-এক ঘরে জন্ম আমার,
একমাত্র না হলেও
বিশেষ স্নেহের পুত্র পিতার।

জীবনকালের প্রথম ভাগে
দাহজ্বরের যে রূপ দেখি,
সে যন্ত্রণা ভোলার যে নয়,
তীব্র জ্বালার শিকার সে কী!

শুশ্রূষা ও চিকিৎসায়ও
যন্ত্রণা মোর হয়নি তো ক্ষীণ,
সেই দিনই তো প্রথম বুঝি
অনাথ আমি, রক্ষকহীন!

পিতা আমার, মাতা আমার,
স্ত্রীও ছিলেন শয্যাপাশে,
কারো মায়াই সান্ত্বনাস্থল
হয়নি আমার নাভিশ্বাসে!

সেই তো আমার অনাথ হওয়া,
সবারই এক কাতরতা,
এমন কত জন্ম ধরেই
দুঃখ-ব্যথায় এক বারতা!

ঠিক করলাম এখন, যদি
কষ্ট থেকে রেহাই ভবে
চাই, তবে তো সংযম আর
অহিংসা-পথ নিতেই হবে !

শ্রমণ হব—এমনি ভেবে
আশ্রয় নিই ঘুমের কোলে,
সকাল হতেই অবাক হলাম,
কোথায় সে-জ্বর গেছে চলে !

পিতা-মাতার আদেশ নিয়ে
শ্রমণ মতে দীক্ষা নিলাম,
আত্মজ্ঞানের ভিতর দিয়েই
অনাথ থেকে সনাথ হলাম !

নরক মাঝে আত্মাই তো
কণ্টকিত শাল্মলী গাছ,
কামধেনু আর নন্দনবন,
কর্তা এবং বিকর্তারাজ !

আত্মাই তো বৈতরণী
নিয়ন্তা সব দুঃখ-সুখের ;
সদাচার ও কদাচারে
আত্মা সুহৃদ, শত্রু বুকের !

শ্রেণিক শুনে মুগ্ধ, কহেন :
সফল মহাভাগ হে স্বামী !
তোমায় ভোগের লোভ দেখিয়ে
লজ্জিত যে বড়ই আমি !

আমায় তুমি মুক্ত করো
তোমার অতুল ক্ষমার বলে,
অনাথ থেকে সনাথ করো,
আত্মা যাতে মোক্ষে টলে !

দীপালি ও ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া পর্ব

শিবচন্দ্র শীল

দীপালি ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্বের উৎপত্তির সহিত জৈনগুরু মহাবীরের সম্বন্ধ আছে বলিয়া ঐ পর্বদ্বয়ের প্রসঙ্গসূত্রে তদীয় চরিত্র কিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে। মহাবীরের প্রকৃত নাম বর্ধমান। ইনি মহাবীর, মহাবীরনাথ, বর্ধমান নায়পুত্ত, শ্রীবর্ধমান জিন, নায়কুলচন্দ, নাথকুলনিগন্থ, নিগন্থনাথ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। মহাবীর চতুর্বিংশ তীর্থকর ও অন্তিম জিন। ইনি বৈশালী নগরীর কোল্লাগ সন্নিবেশে নায়[১] (জ্ঞাতৃ) বা নাথকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সিদ্ধার্থ খত্তিয় বা সিদ্ধার্থ রায়া নায়কুলের প্রধান ছিলেন এবং তাঁহার মাতা ত্রিসলা (বিদেহদত্তা) বৈশালীর রাজা চেটকের ভগিনী ছিলেন। সিদ্ধার্থের গোত্র কাশ্যপ ও ত্রিসলার গোত্র বাশিষ্ঠ ছিল। কথিত আছে, মহাবীর প্রথমে কোডালগোত্র ব্রাহ্মণ ঋষভদত্তের পত্নী জালন্ধরায়ণ গোত্র ব্রাহ্মণী দেবানন্দার কুক্ষিতে জন্মিয়াছিলেন। নীচকুলে (ব্রাহ্মণকুলে) তীর্থকরের জন্মগ্রহণ করা উচিত নয় বলিয়া ইন্দ্রের আজ্ঞায় গর্ভরূপ মহাবীর, দেবানন্দার কুক্ষি হইতে ত্রিসলার উদরে নীত হইয়াছিলেন। মহাবীরের পিতা ও মাতা পার্শ্বনাথের শিষ্য পরম্পরায় ধর্মমত মানিয়া চলিতেন। মহাবীর, সমরবীর রাজার কন্যা যশোদাকে বিবাহ করেন এবং ৩০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া তদনন্তর পার্শ্বনাথের ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ধর্মসংস্কারক ও সম্প্রদায়ের প্রধান হইয়াছিলেন। [তীর্থংকর কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ধর্ম প্রচার করেন না। পার্শ্বনাথের সম্প্রদায় পরে মহাবীরের সম্প্রদায়ে যোগদান করে।—সম্পাদক] ইনি ৩২ বৎসর বয়সে অচেল (উলঙ্গ শ্রমণ ও ৪৩ বৎসর বয়সে কেবলী[২] ও জিন[৩] হইয়াছিলেন। শ্রমণ ভগবান মহাবীর, ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। বৈশালীর লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি সীহ নিগ্রন্থ[৪] (বন্ধনহীন), জৈন সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। বৌদ্ধ-শাস্ত্র মহাবগ্‌গে দেখিতে পাই, ভগবান বুদ্ধ যে কালে বৈশালীর মহাবনে

কূটাগারশালায় গিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেখানে সেনাপতি সীহ, নিগ্রন্থনাতপুত্রের (মহাবীরের) নিকট বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছিলেন।

মহাবীর, কৌশাম্বীর রাজা শতানীক এবং রাজগৃহের রাজা শ্রেণিককে (শ্রেণিক বিম্বিসার) জৈনমতাবলম্বী করিয়াছিলেন। গুজরাটের জৈনদের মতে মহাবীর বিক্রম সম্বৎ আরম্ভের ৪৭০ বৎসর পূর্বে (৫২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে) নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার জীবনকাল ৭২ বৎসর।
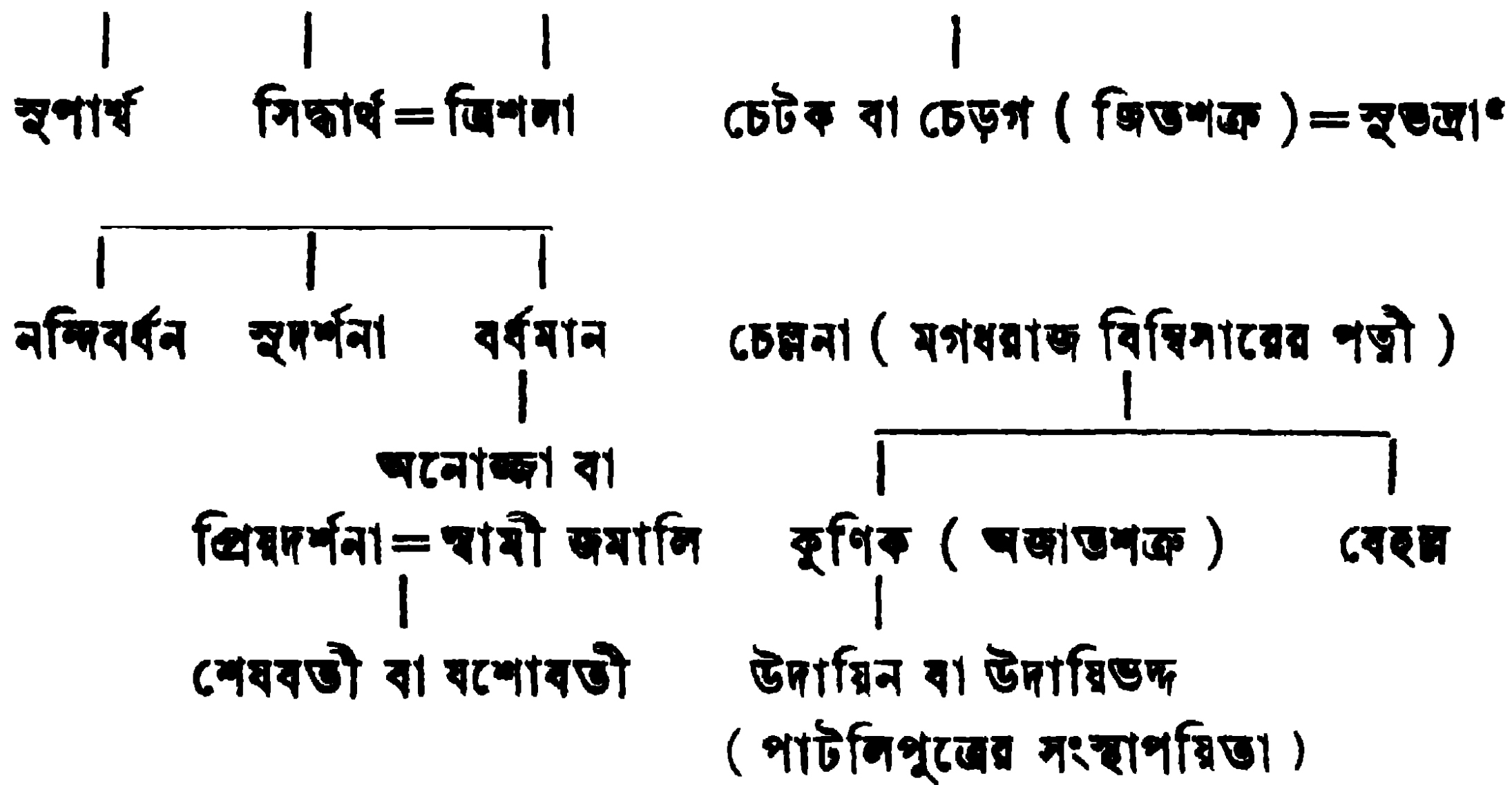
কার্তিক মাসে স্বাতি নক্ষত্রে অমাবস্যার রাত্রি শেষে[৬] পাপা বা পাবা[৭] নগরীতে মহাবীরের নির্বাণ হইয়াছিল। হরিবংশপুরাণে কথিত আছে, মহাবীরের নির্বাণের পর পাপা নগরীতে দীপোৎসব হইয়াছিল—

"জ্বলৎ প্রদীপালিকয়া প্রবৃদ্ধয়া সুরাসুরৈর্দীপিতয়া প্রদীপ্তয়া।
তদা স্ম পাবানগরী সমংততঃ প্রদীপিতাকাশতলা প্রকাশতে॥
তথৈব চ শ্রেণিক পূর্বভূভুজঃ প্রকৃত্য কল্যাণমহং সহপ্রজাঃ।
প্রজগ্মুরিংদ্রাশ্চ সুরৈর্যথাযথং প্রযাচমানা জিনবোধিমর্থিনঃ॥
ততস্তু লোকঃ প্রতিবর্ষমাদরাৎ প্রসিদ্ধ দীপালিকযাত্র ভারতে।
সমুদ্যতঃ পূজয়িতুং জিনেশ্বরং জিনেংদ্রনির্বাণবিভূতিভক্তিভাক্॥

প্রবৃদ্ধ জলমান প্রদীপশ্রেণি যাহা সুর ও অসুরগণ দীপিত ও প্রদীপ্ত করিয়াছিল, তদ্দ্বারা সমগ্র পাবা নগরী ও তদুপরিস্থিত আকাশতল প্রদীপিত

হইয়া প্রকাশ পাইতেছিল। আরও শ্রেণিক বিম্বিসার আদি সহস্র সহস্র ভূপতিগণ, কল্যাণ উৎসব করিয়া এবং ইন্দ্রগণ দেবগণের সহিত অধিষ্ঠানে মহাবীরের নিকট জ্ঞান যাচ্ঞা করিয়া স্ব-স্ব স্থানে গমন করিলেন। সেই হইতে জিনেন্দ্রের নির্বাণের ঐশ্বর্যে ভক্তিযুক্ত ভারতের লোক, বৎসর বৎসর আদর করিয়া প্রসিদ্ধ দীপালি দ্বারা জিনেশ্বরকে পূজা করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত অনহিলবাড় পাটনে ১৩৩৬ সংবতে লিখিত আচার্য সর্বানন্দ সূরি বিরচিত 'দীপোৎসবকল্প' নামক একখানি তালপত্রের পুঁথি আছে। ঐ পুঁথির শেষ শ্লোক দ্বারা জানা যায়, মহাবীরের নির্বাণ হইলে নন্দিবর্ধন নৃপ তৎপ্রতি প্রেমবশত চিন্তান্বিত হইলে তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে বুঝাইয়া আদর সহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন, তদবধি জগতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামক পর্ব প্রবর্তিত হইয়াছে। সেই শ্লোক এই—

আনংদক্রমকংদকংদলসমুদ্ভূতামৃতে নির্বৃতে
বীরে শ্রীমতি নংদিবর্ধননৃপস্তৎপ্রেমচিন্তান্বিতঃ।
সংবোধ্যাদরসুংদরেণ মনসা স্বস্রা স্বয়ং ভোজিতঃ
তৎপ্রাবর্তত পর্ব সর্ব জগতি ভ্রাতৃদ্বিতীয়াবিধম্।

১ জৈনদের দুই প্রধান সম্প্রদায়—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। নায়-কে শ্বেতাম্বরেরা জ্ঞাত ও দিগম্বরেরা জ্ঞাতৃ বলেন।

২ কেবলী—'কেবলানি পরিপূর্ণানি শুদ্ধান্যনন্তানি বা জ্ঞানাদীনি যস্য সন্তি স কেবলী'।

৩ জিন—'রাগাদিজেতৃত্বাদিতি'।

৪ পার্শ্বনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুরা নির্গ্রন্থ। সূত্রকৃতাঙ্গে পেঢালপুত্র মেদার্য গোত্র উদক, পার্শ্বের সম্প্রদায়ী নির্গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছেন।

৫ হরিবংশপুরাণ অনুসারে জিতশত্রু, নৃপেন্দ্র সিদ্ধার্থের অনুজার পতি ছিলেন। অতএব সুভদ্রাকে সিদ্ধার্থের ভগিনী বলিয়া জানা যাইতেছে। সিদ্ধার্থ ও চেটক পরস্পরের ভগিনীপতি ছিলেন।

৬ 'কার্তিকে স্বাতিষু কৃষ্ণভূতসুপ্রভাত সন্ধ্যা সময়ে' ইতি হরিবংশপুরাণ।

৭ বর্তমান পপ্পৌর বা পপৌর, ইহা Sewan-এর প্রায় ১॥০ ক্রোশ পূর্বে সংস্থিত। পাবাবাসী মল্লগণ, বেসালির লিচ্ছবিদিগের সহায় ছিলেন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৪ থেকে পুনর্মুদ্রিত

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

সিংহমহারাজ রণকৌশল জানেন না তা নয়। তবে যুদ্ধ করবার কোনো বাসনাই তাঁতে আর নেই। রাজ্যসীমানা বাড়ানোর যেমন তাঁর ইচ্ছা নেই তেমনি নিজের শক্তি ও সামর্থ্য প্রতিষ্ঠারও তাঁর অভিলাষ নেই।

তবু যুদ্ধক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই তাঁকে আসতে হয়েছে। কারণ তাঁর সৈন্যদের দু'দুবার পেছনে হটতে হয়েছে। সেই গ্লানিই তাঁর ক্ষত্রিয় রক্তকে উত্তপ্ত করে দিয়েছে। সীমান্তের সামান্য মাণ্ডলিক যদি এত উদ্ধত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে তবে তাঁর ক্ষত্রিয়ত্বে ধিক্! প্রজা-রক্ষকও কি তখন তাঁকে বলা যায়? তাই যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করতে তিনি ঠিক আসেন নি।

কিন্তু এখানে আসবার পর যুদ্ধের প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ তখন হঠাৎ কেমন যেন তিনি উদাসীন হয়ে গেলেন।

সেদিন সিংহ মহারাজ সৈন্যদের ছাউনি হতে নিজের শিবিরে ফিরে আসছিলেন। আসবার সময় পথ হতে খানিক দূরে বনের ধারে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল এক সাপের ওপর যে ব্যাঙকে খাবার জন্য ফণা তুলেছে। তখনই আবার তাঁর চোখ পড়ল এক নেউলের ওপর যে সাপকে বিনষ্ট করবার জন্য তার দিকে তাক করে রয়েছে। আর তার ঠিক অদূরে এক অজগর নেউলকে গিলবার জন্য মুখ হাঁ করে রয়েছে। সাপ ব্যাঙ্‌কে পরিত্যাগ করতে পারছেনা, না পারছে আবার নেউল হতে আত্মরক্ষা করতে। আর শেষ পর্যন্ত সবাইকেই যেতে হবে অজগরের পেটের মধ্যে। তাই দেখে তাঁর অনুচরদের কে একজন বলে উঠল—ভগবানের কি আশ্চর্য লীলা! তাঁর নিজেরো তখন মনে হয়েছে, জীব জীবকে আহার করে বেঁচে আছে। তিনি যদি এই যুদ্ধে কাউকে বাঁচাতে চান তবে তা কি করে বাঁচাতে পারেন! তাই তিনি নিরাশ হয়ে শিবিরে ফিরে এলেন। কিন্তু সেই দৃশ্য তাঁর মনে এক গভীর রেখাপাত করে গিয়েছিল।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে শ্রমণকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

  জৈন ভবন
  পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
  ফোন : ৩৩-২৬৫৫

  অথবা

  জৈন সূচনা কেন্দ্র
  ৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120
Vol. III. No. 7 : Sraman : November 1975
Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

পরলোকগত পূরণচাঁদ শ্যামসুখা মহাশয় জৈন ধর্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া, বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ সুলিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, জৈনধর্ম সম্বন্ধে, কলেজে অধ্যয়নকালে আমার যে ধারণা ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হয় ও জৈনধর্মের গভীরতা, মহত্ব এবং ঐতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে আমি কিছু পরিমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের চিন্তা ও ধর্ম জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামসুখাজীর বইখানিও আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ ॥ অগ্রহায়ণ ১৩৮২ ॥ অষ্টম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

পূরণচাঁদ নাহার

জন্ম : ১৫মে, ১৮৭৫ মৃত্যু : ৬ জুলাই, ১৯৩৬

পুরণচাঁদ নাহার

স্বর্গীয় পুরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের জন্ম শতবার্ষিকী আজ আমরা পালন করছি। আজ হতে ১০০ বছর আগে (১৫মে ১৮৭৫) আজিমগঞ্জের প্রখ্যাত নাহার পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা রায় বাহাদুর সিতাবচাঁদ নাহার ছিলেন সেখানকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদার। শুধু তাই নয়, তিনি যেমন ধর্ম পরায়ণ ছিলেন, তেমনি বিদ্যোৎসাহী। বহু জৈন ভজন সংগ্রহ করে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেছিলেন। তার মধ্যে স্বলিখিত হিন্দী ও বাঙ্‌লা ভজনও সংগৃহীত হয়েছিল। পিতার সেই কাব্য প্রতিভা ও স্বধর্মানুরাগ, প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্প প্রীতি পুরণচাঁদের মধ্যে আরো বিকশিত হয়ে সুন্দর রূপ গ্রহণ করেছিল।

পুরণচাঁদ তাঁর পিতা কতৃক তাঁর পিতামহীর নামে প্রতিষ্ঠিত প্রাণকুমারী জুবিলী হাইস্কুল হতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাঙ্‌লা দেশে আগত জৈন সমাজের তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েট। তারপর তিনি আইন অধ্যয়ন করেন ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুর জেলা আদালতে যোগ দেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পালি ভাষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বছরই তিনি কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে বাসের জন্ত উঠে আসেন ও ২৪ পরগণা জেলা আদালতে যোগ দান করেন। হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইড-এ সলিসিটর হবার জন্ত এই সময় তিনি কিছুদিন সলিসিটর ভূপেন্দ্রনাথ বসুর কাছে আর্টিকেল ক্লার্ক রূপে কাজ করেছিলেন। পরিশেষে এপেলেট সাইড-এ যোগ দেবেন বলে চেম্বার পরীক্ষা পাশ করে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে ভকিল রূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু আইন ব্যবসায় তাঁকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারে নি। সাহিত্য ও পুরাতত্বে তাঁর আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুদিন পরেই তিনি আইন

ব্য বসা পরিত্যাগ করে সাহিত্য সাধনা ও পুরাতত্বে সম্পূর্ণ ভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন।

সত্যি বলতে কি সাহিত্য সাধনা ও পুরাতত্বে তাঁর প্রবৃত্তি ছিল সহজাত। এই সহজাত প্রবৃত্তি বশেই তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন পুরাতত্ব সংগ্রহে ও সাহিত্য সৃষ্টিতে। পুরাতত্ব সংগ্রহ ছিল তাঁর নেশার মতো। যেখানে যেতেন সেখান হতে তিনি কিছু না কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। এর জন্য কত তীর্থ কত প্রত্নতাত্বিক স্থান তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। কত সময় তাঁকে বিপদ আপদের সম্মুখীনও হতে হয়েছে। কিন্তু তা তাঁকে দমিত করে নি। তারই পরিণাম স্বরূপ কুমার সিং হল স্থিত নাহার পরিবারের গুলাবকুমারী পুস্তকালয় ও সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। এই সংগ্রহশালায় কি নেই? যাঁরাই এই সংগ্রহশালা দেখেছেন তাঁরাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। কারণ কোনো এক একক ব্যক্তির পক্ষে এ ধরণের একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। এ ধরণের সংগ্রহ বড় বড় সরকারী সংগ্রহশালায়ও নেই। নেই তার কারণ এই সংগ্রহশালা ছিল তাঁর প্রাণের বস্তু। প্রাচীন মুদ্রা, চিত্র, ভাস্কর্য, মূর্তি, গ্রন্থ কোন সংগ্রহশালায় না পাওয়া যায়? কিন্তু পাওয়া যায় কি, বিভিন্ন উপলক্ষে পাওয়া আমন্ত্রণ পত্র, বিভিন্ন পরিবারের পারিবারিক শিল, বিয়ের চিঠি, পুরানো পত্র-পত্রিকা হতে কাটা ছবি, য়ুরোপীয় ভারতীয়, ইত্যাদি শিরোনামায় সুন্দর করে সাজানো। কত সময় তিনি দিতেন এ সবের পেছনে তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। তাঁর দেশলাই সংগ্রহে একটা গোটা যুগের ইতিহাস ধরা রয়েছে। করোনেশনের ছবি হতে বন্দে মাতরম্, গান্ধী যুগ। ঠাঁই পেয়েছে পৌরাণিক চিত্রের সঙ্গে য়ুরোপীয় চিত্র, রবি বর্মার ছবি। সেই দেশলাই এলবামের পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা গোটা যুগ জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই সংগ্রহালয় সম্বন্ধে আমার অমিয় চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে। "...এমন বিচিত্র শিল্প ঐশ্বর্য একত্র দেখতে পাওয়া সৌভাগ্য। ভারতের মহিমা নূতন করে উপলব্ধি করলাম।" পুরণচাঁদ নাহার যদি আর কিছু না করতেন, যদি তিনি শুধু এই সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত করে যেতেন তবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত, এবং সংগ্রহের জিনিষগুলো চির বিস্ময়ের কারণ হয়ে থাকত।

কিন্তু পূরণচাঁদ নাহার ছিলেন তাঁর সৃষ্টির চাইতে অনেক বড়। তিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত করেছিলেন এবং তাতে তাঁর জ্ঞানও ছিল গভীর। হিন্দী, ইংরাজী ও বাঙলায় তিনি সমান ভাবে লিখতে পারতেন। তাঁর 'জৈন লেখ সংগ্রহ' তিন ভাগে প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে ভারতের প্রায় ৩০০০ শিলালেখ সংগ্রহ ও সন্নিবেশিত হয়েছে। এই তিন ভাগের সঙ্গে আর একটি ভাগ সংযোজিত হবার ছিল। কিন্তু রাজস্থান ও দক্ষিণ ভারত হতে ঘুরে আসার পর হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয় (৩১মে, ১৯৩৬)। তাই সে ভাগ আর সংযোজিত হতে পারে নি। সে ভাগই মথুরার জৈন শিলা লেখ সম্পর্কিত। লেখগুলো সংগৃহীত হয়েছে। অপূর্ণ যা ছিল তা ভূমিকা। সেই ভূমিকা লেখার কাজেই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন যখন মৃত্যু এসে তাঁকে আমাদের কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এই সংগ্রহ এখন প্রকাশ করবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

তাঁর 'এপিটোম অব জৈনিস্ম' আর একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা ছাড়াও জৈন ধর্ম-তত্ব, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক এমন সুন্দর আর একখানা বই প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। এই বইটী জৈন ধর্মতত্বে প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। বইটী এখন পাওয়া যায় না। তাই এর পুনর্মূদ্রণ একান্ত প্রয়োজন।

ওঁর আর একখানি বই 'প্রাকৃত সূক্তরত্নমালা'। বিভিন্ন বিষয়ে ইংরেজী অনুবাদ-সহ প্রাকৃত ভাষার সূক্তি সংগ্রহ। এই বইটীর ভূমিকায় প্রাকৃত সম্পর্কে তিনি যে-অভিমত প্রকাশ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের অনেকের ধারণা সংস্কৃত হতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হতে অপভ্রংশের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তিনি তা বলেন না। তিনি বলেন প্রাকৃত হতেই সংস্কৃত উদ্ভূত হয়েছে, সংস্কৃত শব্দটির মধ্যেই তার সত্যতা নিবদ্ধ। অবশ্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার জননী প্রাকৃতই। কারণ প্রাকৃতই ছিল ভারতীয় জন সাধারণের ভাষা। তাঁর কথায়, "Some are of opinion that Prakrit is a corruption from Sanskrit, but the very terms 'Prakrita' and 'Sanskrita' speak contrawise. For the word 'Prakrita' is

derived from 'Prakriti' which means 'the original source', while the term 'Sanskrita' is derived from the root 'Kr' with the particle 'Sam' prefixed to it and conveys the meaning 'purified'. This may justly lead us to the conclusion that Prakrit was the popular language and the source which being purified by the erudite and scholastic Brahmins, come to be stereotyped into Sanskrit in the hands of the cultured classes."

'পাবাপুরীকা প্রাচীন ইতিহাস' হিন্দী ভাষায় লিখিত একটি ছোট্ট পুস্তিকা। মহাবীরের নির্বাণস্থলী পাবাপুরীর প্রাচীন ইতিহাস সেখানে বিবৃত হয়েছে। জৈন পূজা ও ভজন সংগৃহীত হয়েছে তাঁর 'সাঁঝি সংগ্রহে'। 'প্রথমাবলী' সচিত্র হিন্দী প্রথম পাঠ্যপুস্তকের মতো। এছাড়া তাঁর বিভিন্ন সময়ের হিন্দী লেখা কিছু সংগৃহীত হয়েছে 'প্রবন্ধাবলী'তে। 'প্রবন্ধাবলী' তাঁর মৃত্যুর পর শ্রীবিজয় সিং নাহার প্রকাশিত করেন। কিন্তু 'প্রবন্ধাবলী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধের অতিরিক্ত হিন্দী, গুজরাতী, বাঙলা ও ইংরাজীতে বহু প্রবন্ধ রয়েছে যা কোথাও পঠিত হয়েছে বা প্রকাশিত কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। সেগুলি একত্রিত করে পূরণচাঁদ গ্রন্থাবলী রূপে প্রকাশ করা যায় কিনা সেকথা ভাববার। আমার একথা বলবার কারণ এই যে তাঁর লিখিত অজস্র চিঠিপত্র ছাড়াও শ্বেতাম্বর দিগম্বর সম্পর্কিত রাজগীর মোকদ্দমায় কমিশনের সামনে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, বা ক্রশ এগজামিনের সময় প্রত্যুত্তর তার পাণ্ডুলিপি নাহার লাইব্রেরীতে আমি দেখেছি। বিবৃতির কথাই বলি। এই বিবৃতি ও প্রত্যুত্তরে জৈন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা যদি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ না করা হয় তবে অচিরেই তা বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সে ক্ষতি জৈন সমাজেরই অপূরণীয় ক্ষতি। এই বিবৃতি সম্বন্ধে স্বর্গীয় অজিতপ্রসাদের উক্তি আমি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই। কারণ অজিত প্রসাদ দিগম্বর সমাজের একজন দিকপাল পণ্ডিতই ছিলেন না, সেই কমিশনের সামনে তিনিই আবার পূরণচাঁদ নাহারকে ক্রশ এগজামিন করেন। তাই তাঁর উক্তির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর ভাষায়, "His

scholarship, his mastery of historical and philosophical matters in relation to Jainism was exhibited in an eminent degree when I cross-examined him for about a month."

সাহিত্য ও সংগ্রহ কাজে নিযুক্ত থাকা সত্বেও পুরণচাঁদ নাহার সার্বজনিক কাজেও প্রমুখ অংশ গ্রহণ করতেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টে তিনি অনেকদিন যাবৎ শ্বেতাম্বর জৈন পক্ষীয় প্রতিনিধি ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক, ইণ্টার মিডিয়েট ও বি. এ. পরীক্ষার পেপার সেটার ও পরীক্ষকও ছিলেন তিনি অনেককাল। এতদরিক্ত পি. আর. এস. এর বোর্ডেও তিনি পরীক্ষকের কাজ করেছেন। ইংলণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী, বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটী, বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটুট, নাগরী প্রচারণী সভা আদির মতো বহু সভা ও সমিতির তিনি বরেণ্য সদস্য ছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ ও লালবাগের অনেরারি ম্যাজিষ্ট্রেট, আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য ও এডওয়ার্ড করোনেশন স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ছিলেন তিনি মাননীয় করসপণ্ডেণ্ট ও ভাণ্ডারকার ইন্সটিটুট পুনা, জৈন শ্বেতাম্বর এডুকেশন বোর্ড বম্বে, রামমোহন লাইব্রেরী কলকাতা ও জৈন সাহিত্য সংশোধক সভা পুনার আজীবন সদস্য।

পুরণচাঁদ নাহারের তীর্থ সেবাও ছিল অদ্ভুত। বস্তুতঃ তাঁর এই সেবায় গর্ব ছিল জৈন শ্বেতাম্বর-সমাজের। পাবাপুরী ও রাজগৃহ তীর্থের জন্য তিনি সময়, শক্তি ও অর্থ দিয়ে অমূল্য সেবা দিয়েছেন। বর্তমান পাবাপুরী মন্দিরে সাজাহানকালীন যে প্রশস্তি পাওয়া গেছে তা তাঁরই প্রচেষ্টায়। তিনি বহু অনুসন্ধান করে সেটি মূল বেদীর তলা হতে বার করেন। তেমনি আর একটি প্রশস্তি খুঁজে বার করেন রাজগৃহের বিপুলাচল পর্বতোস্থিত পার্শ্বনাথ মন্দিরের। পাটনাস্থিত জৈন মন্দিরের একটি চরণ-এর ওপর ছত্রী নির্মাণেও তাঁর অনুদান স্মরণীয়।

তীর্থ সেবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবাও করেছেন পুরণচাঁদ। তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী সমাজ সংস্কারক যার ফলে কিছু লোক তাঁর বিরোধীও হয়ে পড়ে,

কিন্তু তিনি তার ভ্রূক্ষেপ করেন নি। কলকাতার জৈন সমাজে দেশী-বিলায়েতীর যুদ্ধ ছিল, সে সময়ের এক প্রমুখ ঘটনা, সংরক্ষণবাদী ও যাঁরা বিলেৎ গেছেন তাঁদের দ্বন্দ্ব। এ ব্যাপারেও তিনি হস্তক্ষেপ করেন ও দূরদর্শিতার সঙ্গে তার সমাধান করেন। বিবাহ ব্যাপারেও তিনি সংস্কার করেছিলেন। অখিল ভারতবর্ষীয় ওসওয়াল মহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় আজমীড়ে। এই অধিবেশনের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১০৪ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে সেই সভায় সভাপতিত্ব করতে যান পূরণচাঁদ। এ তাঁর অটুট মনোবলের পরিচয়ই দেয় না, দেয় তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও সমাজের প্রতি গভীর দরদের।

বলাবাহুল্য জৈন ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বই ছিল তাঁর প্রধান বিষয়। একথা ঠিক যে প্রাচীন ইতিহাসের জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে তবে প্রাচীন ঐতিহ্যের জ্ঞান আমাদের হয় না। এবং সে বিষয় এত গভীর যে তাতে একবার প্রবেশ করলে আর কিছুর আবশ্যকতাও থাকে না। তিনি তাঁর অনেক প্রবন্ধেই সেকথা বলেছেন। তবে তাই বলে একথা বলা যায় না যে সমকালীন সাহিত্যিক বা সামাজিক বিষয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি সমসাময়িকতার বিষয়ে অবহিত ছিলেন এবং বোধহয় জৈনরা সমসাময়িকতা বিষয়ে যত সতর্ক তেমন আর কেউই নয়। পূরণচাঁদের কথাই উদ্ধৃত করি। "তিনি তীর্থংকরই হোন বা চক্রবর্তী সময়ের গতি রোধ করবার শক্তি তাঁদেরো নেই। জৈন সাহিত্যে এজন্যই 'তেনং কালেণং তেনং সময়েণং —সেই কালে সেই সময়ে কথার ব্যবহার হয়।" সেই সমসাময়িকতার কথা মনে রেখেই তিনি পর্দাপ্রথা, স্ত্রীশিক্ষা, সাহিত্য আদি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। ওসওয়াল জাতি সম্পর্কে বহু পত্র ও নিবন্ধাদি প্রকাশিত করেছেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রণিধানযোগ্য: "কোনো জাতির সত্যিকার উন্নতি তখনই হতে পারে যখন সেই জাতির মহিলারা সুশিক্ষিতা হন ও তাঁদের বিচার উঁচু হয়। যতক্ষণ তা না হবে ততক্ষণ সত্য ও স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়।"

সাহিত্যের বিষয়ে তিনি লিখছেন: "সমাজ বৃক্ষের সাহিত্য ফল ও সাহিত্যরূপ ফলেই সমাজ বৃক্ষকে সবুজ রাখার শক্তি বিদ্যমান।" বোধহয় এই জন্যই জৈন সাহিত্য সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হোক এই ছিল তাঁর প্রাণের আকাঙ্খা। যখন বৌদ্ধসাহিত্য ভারতীয় ও বৈদেশিক বিভিন্ন ভাষায়

সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে তখন জৈন সাহিত্যই কেন প্রকাশিত হবে না। বিশেষ জৈন সাহিত্য যখন বিস্তার ও গভীরতায় যে কোন প্রগতিশীল সাহিত্যের সমকক্ষ। এদিকে জৈন সমাজের দৃষ্টি আজো আকৃষ্ট হয়নি।

প্রাচীনের মধ্যে যা কিছু ভালো তার প্রতি যেমন তাঁর আগ্রহ ছিল তেমনি তার মধ্যে যা দোষের সে সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতেও তিনি আবার পেছপা হন নি। জৈন সমাজ এমনিতে নিতান্ত ছোট এবং এই ছোট সমাজ শ্বেতাম্বর দিগম্বর ছাড়াও বহুবিধ গচ্ছ উপগচ্ছে বিভক্ত। এর কারণ রূপে তিনি যা নির্দেশ করেছেন সেকথা বলবার সাহস বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমাদেরো আছে কিনা সন্দেহ। কারণ জৈন সমাজ সেই নির্ভরতা আজো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর ভাষায়: "যদি জৈন ধর্ম কেবল আচার্যদের ওপর নির্ভরশীল না হত তবে এত ভাগ বিভাগ হত না। যদি ভগবান মহাবীরের বাণী শুনবার জন্য তাঁদের মুখাপেক্ষী না হতে হত তবে ভাগ বিভাগের জন্য আজ যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার কখনো কারণ দেখা দিত না।" এই উক্তির পেছনে রয়েছে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও ওজস্বিতা যার অভাবে আজো আমরা ঐক্যবন্ধনের পথ খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ অনৈক্যের কারণ এত হাস্যকর যে সেকথা বললে কেউই বিশ্বাস করবেন না। তাই তাঁর সম্পর্কে কিছু বললে বলতে হয় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনন্য ও অন্য ধরণের পরিপূর্ণ মানুষ। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে তাঁর পায়ে মাথা নত করে তাই আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পুরণচাঁদ নাহার লিখিত বাঙলা প্রবন্ধের তালিকা:

১। জৈন মতে জীব ভেদ [প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২১ ; শ্রমণ, কার্তিক ১৩৮১]

২। মুর্শিদাবাদের কয়েকখানি লিপি [সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৩, ১৩২৪]

৩। আসামের কতিপয় হিন্দু নরপতি, চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—ইতিহাস শাখা, ১৩৩০।

৪। জৈন দর্শনে ধ্যান, চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—দর্শন শাখা, ১৩৩০ [প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩০ ; শ্রমণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২]

৫। মুর্শিদাবাদের একটি প্রাচীন লিপি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩৩০-এর নবম অধিবেশনে পঠিত [সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩১, ১ম সংখ্যা]

৬। জৈন মূর্তি তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পঞ্চদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—ইতিহাস শাখা, ১৩৩১ [সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩৫ শ্রমণ, পৌষ ও মাঘ ১৩৮১]

৭। শ্বেতাম্বর দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রাচীনতা, উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ১৩৩৬ [শ্রমণ , ফাল্গুন ১৩৮০]

৮। জৈন ভাস্কর্যের নমুনা [বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৪০ ; শ্রমণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮২]

৯। ত্রৈভাষিক শিলালিপি [উদয়ন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১]

১০। হস্ত লিখিত গ্রন্থে চিত্রশিল্প [শ্রমণ, আষাঢ় ১৩৮০]

১১। প্রজাবৃন্দের প্রতি দুটী কথা, ১৯২২।

১২। ভগবান পার্শ্বনাথ, হরপ্রসাদ সম্বর্দ্ধন লেখমালা, [শ্রমণ, কার্ত্তিক ১৩৮২]

পার্শ্বনাথ মন্দিরের সম্মুখভাগ, অমর সাগর, জৈসলমীর

জৈন ভাস্কর্যের নমুনা

পূরণচাঁদ নাহার

এই জাগৃতির যুগে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতিতে সর্বদাই নিজ নিজ প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস প্রকাশ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইতেছে। যে সমস্ত ভাস্কর্য ও চারুকলা এ যাবৎ অন্ধকারাচ্ছাদিত ছিল তাহা প্রকাশে আনিয়া পূর্বপুরুষগণের লুপ্তপ্রায় কীর্তিকলাপ জনসাধারণে প্রচার করা হইতেছে। অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতির হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্তিগুলি ছাড়া ভূগর্ভ হইতে নালন্দা, মহেঞ্জোদারো, পাহাড়পুর আদিতে যে সমস্ত পুরাকালের সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে তাহা কিছুকাল পূর্বে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অর্বুদগিরির প্রসিদ্ধ দিলওয়ারা জৈন মন্দিরের বিষয় কর্ণেল টড্ সাহেব প্রকাশ করিবার পর ভারতের স্থানে স্থানে আরও জৈন মন্দির মূর্তি, যাহা এ যাবৎ অজ্ঞাত ছিল তাহা ক্রমশঃ উদ্ধার হইতেছে। রাজপুতানার বিখ্যাত মরুভূমির মধ্যস্থিত অতি দুর্গম স্থানে জৈসল্মীর রাজ্য অবস্থিত, তথায় জৈনদিগের প্রাচীন তাড়পত্রের পুঁথিগুলি ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ ব্যতীত জৈন মূর্তিগুলিও মুসলমান অত্যাচারের প্রারম্ভ হইতে অধিক সংখ্যায় সুরক্ষিত আছে। আমি এই মূর্তিগুলির শিলালিপি সংগ্রহের জন্য জৈসল্মীর যাত্রা করি। ঐ দুর্গম স্থানের জৈন মন্দিরগুলির ভাস্কর্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত

অর্থাৎ প্রায় ছয় সাত শত বৎসর ঐ সুদূর দুর্গম প্রদেশে যে সমস্ত শিল্পকলার অতুলনীয় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলাম তাহারই দুই একটি দৃষ্টান্ত অদ্য পাঠক পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

চিত্রে যে দু'টি নর্তকীর মূর্তি দেখিতেছেন তাহা পাষাণ নির্মিত; উহা জৈসল্মীর দুর্গস্থিত জৈন মন্দিরে রহিয়াছে। এগুলি সম্ভবতঃ চতুর্দশ পঞ্চদশ-শতাব্দীর ভাস্কর্য। ইহাতে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য উভয়েরই সমাবেশ আছে। সে সময়ে শিল্পকলা যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল মূর্তিগুলি তাহার বোধহয় উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূর্তিগুলি সর্বাঙ্গ পূর্ণ অবস্থায় আছে। ইহাদের নির্মাণ কৌশল দৃষ্ট মাত্রই প্রতীয়মান হয়। অঙ্গের সুন্দর সঞ্চালন, ভাবপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী, চাতুর্যপূর্ণ দৃঢ় রেখা প্রভৃতি ভাস্কর্য কলার যতপ্রকার বিশেষত্ব আছে সমস্তই মূর্তিগুলিতে দেখা যায়।

এই সংখ্যায় ২৩৫ পৃষ্ঠার চিত্রটি জৈসল্মীর হইতে দশ মাইল ব্যবধানে অমর সাগর নামক স্থানের পার্শ্বনাথ মন্দিরের সম্মুখ ভাগের দৃশ্য। ইহাতে বর্তমান যুগের রাজপুত শিল্পের উৎকৃষ্ট কারীগরী দেখান হইয়াছে।

বারান্তরে পাঠকগণের নিকট তথাকথিত ভাস্কর্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ, ১৩৪০

মহাবীর বলেছিলেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

উত্তম সম্বন্ধীয়

স্থাবর ও অস্থাবর বিষয়ে,
তা যতই সামান্য হোক না কেন,
যতদিন তোমার আসক্তি থাকবে,
বা তুমি আসক্তির অনুমোদন করবে,
ততদিন তুমি দুঃখ হতে মুক্ত হবে না।

মিথ্যেকথা বলা,
অব্রহ্মচর্য, পরিগ্রহ
ও অদত্ত দান গ্রহণ
সংসার বন্ধের কারণ,
তাই এদের হতে বিরত হও।

যার জাতের অহঙ্কার নেই,
রূপের অহঙ্কার নেই,
লাভের অহঙ্কার নেই,
শ্রুতজ্ঞানের অহঙ্কার নেই,
ও যে সমস্ত রকম মায়া পরিহার করে
ধর্ম ও ধ্যান পরায়ণ হয়,
সেই যথার্থ ভিক্ষু।

যে দেহ সম্বন্ধে উদাসীন,
গালাগাল দিলে,
মারলে, এমন কি তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে
বিদ্ধ করলেও,
পৃথিবীর মতো নির্বিকার
ও যার বাসনা ও কৌতূহল নেই,
সেই যথার্থ ভিক্ষু।

সম্যক দর্শন লাভ করে
সম্যক জ্ঞান, তপ ও
সংযমের জন্য যে প্রযত্নশীল,
পূর্ববদ্ধ কর্মকে
তপস্যার দ্বারা ক্ষয় করে
কায়মনবাক্যে
যে সর্বদা জাগরূক,
সেই যথার্থ ভিক্ষু।

ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ রূপ
কষায় যে পরিহার করেছে,
যে কেবলী প্ররূপিত বাক্যে দত্ত-চিত্ত,
যার সোণারূপো আদি বিষয় নেই
এবং যে বিষয়ীরও সংসর্গ করে না,
সেই যথার্থ ভিক্ষু।

সংসারের অধিকাংশ মানুষই
প্রলোভনময় ঐহিক বিষয়েই আকৃষ্ট।
ঐহিক বিষয়ের চিন্তা করোনা,

ক্রোধ পরিহার করো,
মান, মায়া ও লোভ পরিত্যাগ করো।

ভব-তৃষ্ণাই সেই লতা
যা ভয়ঙ্কর,
বিষময় যার ফল,
যথান্যায় তাকে উৎপাটিত করে
আমি সুখে বিচরণ করি।

যে সুখভোগ তোমার করায়ত্ত
সে সুখভোগ সেবন করোনা,
এ ভাবেই তুমি বিবেক লাভ করবে।
যারা সম্যক সংবুদ্ধ
তাদের অন্তেবাসী হয়ে
সম্যকচারিত্র লাভ কর।

তার পরিত্যাগই যথার্থ পরিত্যাগ
যে কাম্য সুখভোগ লাভ করেও
স্বেচ্ছায় তা পরিহার করে ;
তার পরিত্যাগ পরিত্যাগ নয়
যে বিবশতা বশতঃ
বস্ত্র, গন্ধ, অলঙ্কার, স্ত্রী ও শয্যা
ভোগ করতে সমর্থ হয় না।

দুর্জন সংসর্গ পরিত্যাগ কর
এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক,
দুর্জন সংসর্গ আপাত মধুর।

আহত হয়েও ক্রোধ কোরো না,
দুর্বাক্য শুনেও জ্বলে ওঠো না,
প্রশান্ত মনে সমস্ত কিছু সহ্য কোরো,
প্রতিবাদ করো না।

যা অনুকূল তা পরিহার করো,
সদা জাগরূক থাক
ও একস্থানে অবস্থান কোরোনা।
চারিত্রে শিথিলতা আসতে দিও না
ও সমস্তরকম উপসর্গ সহ্য কোরো।

শীত-গ্রীষ্ম, মশা-মাছি,
প্রিয়-অপ্রিয়, আধি-ব্যাধি
এই শরীরকে পীড়িত করবে,
সমভাবে তাদের সহ্য কর
ও পূর্বার্জিত কর্মরজঃ
বিনষ্ট কর।

•

গীতমাত্রই বিলাপ,
নৃত্য বিড়ম্বনা,
অলঙ্কার ভাররূপ,
সুখও দুঃখময়।

ঐশ্বর্য বা পরিজন
রক্ষা করতে সমর্থ হয় না—
একথা জান।
জীবন পরিজ্ঞাত হয়ে
কর্ম হতে মুক্ত হও।

যে সরল সে শুদ্ধ,
যে শুদ্ধ ধর্ম তাকে আশ্রয় করে,
ঘৃত সিঞ্চিত পাবকের মতো
সে নির্বাণ লাভে সমর্থ হয়।

ধর্ম উৎকৃষ্ট মঙ্গল,
অহিংসা, সংযম ও তপ সেই ধর্ম।
যে ধর্মে অবস্থিত
দেবতারাও তাঁকে নমস্কার করেন।

প্রাণী হত্যা কোরোনা,
প্রদত্ত না হলে কোনো দ্রব্য গ্রহণ করোনা,
মিথ্যা ও সংশয়পূর্ণ বাক্য বোলো না,
সংযমীদের ধর্ম এইরূপ।

নিজের সুখের জন্য
স্থাবর বা ত্রস জীবের যে হত্যা করে,
বা তাদের কষ্ট দেয়,
এবং যা প্রদত্ত হয়নি তা গ্রহণ করে,
যা আচরণীয় শিক্ষা লাভ করে না,
সে কষ্ট পায়।

তাই যে বিচক্ষণ
সে সংসার বন্ধনের
কারণ অবগত হয়ে
সত্যের অনুসন্ধান করবে
ও সমস্ত জীবে মৈত্রীভাব বজায় রাখবে।

জীব হত্যা না করা সমস্ত জ্ঞানের সার,
কারণ সমস্ত জীবকে নিজের মতো দেখাই
অহিংসা এবং এইটুকুই জানবার।

মর্ত্য, ঊর্দ্ধ ও অধঃ লোকের
কোনো প্রাণীকেই পীড়িত করবে না,
হাত পা সংযত
ও অদত্ত দান গ্রহণ না করে
বিচরণ করবে।

যারা সংযত
তারা কি ত্রস কি স্থাবর,
কি ছোট কি বড়,
এমন কি দাঁত ধোবার কাঠি পর্যন্ত
নিজে হতে নেয় না,
অন্যকে নিতে বলে না,
নিলে অনুমোদন করে না।

যে মায়ামুক্ত,
সরল ও তপঃনিরতঃ,
সে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে,
পূর্ববদ্ধ কর্মের ক্ষয় করে,
নূতন কর্মের বন্ধন করে না।

[ক্রমশঃ

বৰ্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন-চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

বর্ষা ঋতু শেষ হলে নানা স্থানে প্রব্রজন করতে করতে বর্দ্ধমান নালন্দা হতে বাণিজ্যগ্রামে এলেন। সেখানে দুতিপলাস চৈত্যে অবস্থান করলেন।

একদিন ভিক্ষাচর্যা হতে ফিরে আসবার পথে কোল্লাগ সন্নিবেশের নিকট ইন্দ্রভূতি গৌতম শুনতে পেলেন যে বর্দ্ধমানের গৃহস্থ শিষ্য শ্রমণোপাসক আনন্দ আমরণ অনশন নিয়ে দর্ভ শয্যায় শুয়ে রয়েছেন। তখন তিনি ভাবলেন যে আনন্দ হয় ত আর বেশী দিন বাঁচবে না তাই তার সঙ্গে দেখা করে যাই। গৌতম তখন কোল্লাগে তাঁর পৌষধশালায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

গৌতমকে দেখেই আনন্দ তাঁকে নমস্কার করে বললেন, ভগবন্, আমি অনশনে থাকায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি। আপনি নিকটে এলে আপনাকে নত মস্তক হয়ে বন্দনা করি।

গৌতম তাঁর নিকটে গেলে তিনি গৌতমের বন্দনা করলেন। তারপর তাঁদের মধ্যে নানা কথা হল। এক সময় আনন্দ প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, ঘরে থেকে গৃহস্থ ধর্ম পালন করতে করতে কি গৃহস্থ শ্রাবকের অবধি জ্ঞান হতে পারে?

গৌতম বললেন, হাঁ, আনন্দ, গৃহী শ্রমণোপাসকের অবধিজ্ঞান হতে পারে।

আনন্দ বললেন, ভগবন্, গৃহস্থ ধর্ম পালন করতে করতে আমারো অবধি জ্ঞান হয়েছে যাতে পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম লবণ সমুদ্রে পাঁচশ' যোজন, উত্তরে ক্ষুদ্র-হিমবৎ বর্ষধর, উর্দ্ধে সৌধর্ম কল্প ও অধোভাগে লোলচ্চুঅ নরকাবাস পর্যন্ত সমস্ত রূপী পদার্থ জানছি ও দেখছি।

গৌতম বললেন, আনন্দ, শ্রমণোপাসকের অবধি জ্ঞান হয় কিন্তু এত দূরগ্রাহী হয় না, যতটা তুমি বলছ। এই ভ্রান্ত কথনের জন্য তোমার আলোচনা করে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

আনন্দ বললেন, ভগবন্, জৈন প্রবচনে কি সত্য প্ররূপণের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে ?

না, আনন্দ, এমন নয়।

তবে ত ভগবন্, আপনিই প্রায়শ্চিত্ত করুন, কারণ আমার কথার প্রতিবাদ করে আপনি অসত্য প্ররূপনা করেছেন।

আনন্দের এই উক্তিতে গৌতমের মনে শঙ্কার উদ্ভব হল। তিনি দুতি-পলাস চৈত্যে ফিরে এসেই ভিক্ষা চর্যার আলোচনা করে বর্দ্ধমানকে আনন্দের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, ভগবন্, এ ব্যাপারে আলোচনা প্রায়শ্চিত্ত আনন্দের করা উচিত না আমার।

বর্দ্ধমান বললেন, গৌতম, এই বিষয়ে তোমারই আলোচনা প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত এবং আনন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা।

গৌতম তখনি আনন্দের কাছে ফিরে গেলেন ও আলোচনা প্রায়শ্চিত্ত করে আনন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

সে বছরের চাতুর্মাস্য বর্দ্ধমান বৈশালীতে ব্যতীত করলেন।

চাতুর্মাস্য শেষ হলে তিনি কোশল ভূমির দিকে প্রস্থান করলেন ও নানা নগর ও গ্রাম অতিক্রম করে সাকেতে এসে উপস্থিত হলেন।

সাকেতের এক বণিক জিনদেব সেই সময় কোটিবর্ষে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন। কোটিবর্ষ দিনাজপুরের নিকটস্থ বাণগড়। সেকালে কোটি-বর্ষ অনার্য দেশ বলে পরিগণিত হত। সেখানে কিরাতরাজ রাজত্ব করতেন।

জিনদেব কিরাতরাজকে বাণিজ্যার্থ বস্ত্র, মণি, রত্নাদি উপহার দিলেন যে ধরণের রত্নাদি তাঁর কোষে ছিল না।

কিরাতরাজ সেই রত্নাদি পেয়ে আনন্দিত হলেন ও বললেন, কি সুন্দর এই রত্ন! এ রত্ন কোথায় উৎপন্ন হয় ?

জিনদেব বললেন, এর চাইতেও ভালো ও মহার্ঘ রত্ন আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়।

কিরাতরাজ বললেন, ইচ্ছে ত করে তোমার দেশে যাই কিন্তু সাকেত-রাজের কি অনুমতি পাওয়া যাবে ?

কেন নয় ? আমি সেই অনুমতিপত্র আনিয়ে নেব।

জিনদেব সাকেত-রাজকে পত্র দিয়ে কিরাতরাজের সাকেতে যাবার অনুমতি পত্র আনিয়ে নিলেন। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সাকেতে এসে উপস্থিত হলেন।

বর্দ্ধমান তখন সাকেতে অবস্থান করছিলেন। দলে দলে সাকেতের অধিবাসীরা বর্দ্ধমানের ধর্মসভায় যায়। তাই দেখে একদিন কিরাতরাজ জিনদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, ভদ্র, এরা সব কোথায় চলেছে ?

জিনদেব তার প্রত্যুত্তর দিলেন, রাজন, এখানে আজ এক রত্ন ব্যবসায়ী এসেছেন যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রত্নের অধিকারী।

কিরাতরাজ সেকথা শুনে বললেন, মিত্র, তা হলেত খুব ভালোই হল! চল আমরা গিয়ে সেই শ্রেষ্ঠ রত্ন দেখে আসি।

কিরাতরাজ জিনদেবের সঙ্গে বর্দ্ধমানের ধর্মসভায় এলেন।

বর্দ্ধমান সেদিন রত্ন সম্বন্ধেই প্রবচন দিচ্ছিলেন। বলছিলেন সংসারে রত্ন দুই রকমের এক দ্রব্যরত্ন, অন্য ভাবরত্ন। হীরে, মণি, মাণিক্য যাদের বলি তারা দ্রব্যরত্ন। ভাব রত্ন তিনটি, সম্যক্ দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র। তত্ত্বে শ্রদ্ধা, তত্ত্বের জ্ঞান ও তদনুযায়ী জীবন যাপন। দ্রব্য রত্ন যতই মহার্ঘ হোক না কেন তার প্রভাব সীমিত। পরলোকে মানুষ তা সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারে না। কিন্তু ভাবরত্নের প্রভাব অসীম, শুধু ইহ জীবনেই নয়। পরজন্মেও তা ফলদায়ী হয়।

ভাব রত্নের কথা কিরাতরাজের মনে ধরল। তিনি বর্দ্ধমানের সামনে দাঁড়িয়ে করযোড়ে বললেন, ভগবন্, আমায় ভাবরত্ন দিন।

বর্দ্ধমান বললেন, তোমার যেমন অভিরুচি।

কিরাতরাজ তাঁর ধন, রত্ন, রাজ্য ও ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে বর্দ্ধমানের শ্রমণ সংঘে প্রবেশ করলেন।

বর্দ্ধমান সাকেত হতে পাঞ্চালের দিকে গমন করলেন। কাম্পিল্যে কিছুকাল অবস্থান করে সুরসেনের দিকে গেলেন ও মথুরা, শৌর্যপুর, নন্দীপুর আদি নগরে ভ্রমণ করে পুনরায় বিদেহ ভূমিতে ফিরে এলেন ও সেই বর্ষাবাস মিথিলায় ব্যতীত করলেন।

চাতুর্মাস্য শেষ হলে বর্দ্ধমান আবার মগধে ফিরে এলেন ও গ্রামানুগ্রাম বিচরণ করতে করতে রাজগৃহের গুণশীল চৈত্যে এসে অবস্থান করলেন।

গুণশীল চৈত্যে অন্যতীর্থিক শ্রমণেরাও থাকেন। তাঁরা একদিন বর্দ্ধমানের অনুযায়ী শ্রমণদের এসে বললেন, আর্যগণ, তোমরা তিন তিন ভাবে অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

সেকথা শুনে বর্দ্ধমান শিষ্যরা বললেন, আর্যগণ, কি কারণে আমরা অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত?

অন্যতীর্থিকেরা বললেন, তোমাদের যা দেওয়া হয়নি তাই গ্রহণ কর, খাও, আস্বাদন কর। এইজন্য তোমরা অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

আর্যগণ, আমরা কিভাবে যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করি, খাই, আস্বাদন করি।

আর্যগণ, আমাদের মতে দীয়মান অদত্ত, প্রতিগৃহ্যমান অপ্রতিগৃহীত, নিসৃজ্যমান অনিসৃষ্ট। এইজন্য দাতার হাত হতে স্খলিত হয়ে যতক্ষণ না তা তোমার পাত্রে এসে পড়ে তার আগে তাকে যদি কেউ সরিয়ে নেয়, তবে তা তোমাদের যায় না, দাতার যায়। এর তাৎপর্য হল যে পদার্থ তোমাদের পাত্রে এসে পড়ে তা অদত্ত। কারণ যে পদার্থ দানকালে তোমাদের নয়, পরেও তা তোমাদের হতে পারে না। এরূপে তোমরা যা তোমাদের দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করছ, খাচ্ছ ও আস্বাদন করছ। এখানে তোমরা অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

আর্যগণ, আমরা যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করি না, খাই না বা আস্বাদন করি না। যা দেওয়া হয়েছে তাই গ্রহণ করি, খাই ও আস্বাদন করি। এভাবে ত্রিবিধ ত্রিবিধপ্রকারে আমরা সংযত, বিরত ও পণ্ডিত।

আর্যগণ, কি ভাবে তোমরা যা তোমাদের দেওয়া হয় তাই গ্রহণ করো, খাও, আস্বাদন কর আমাদের বোঝাও।

আর্যগণ, আমাদের মতে দীয়মান দত্ত, প্রতিগৃহ্যমান প্রতিগৃহীত ও নিসৃজ্যমান নিসৃষ্ট। গৃহপতির হাত হতে স্খলিত হবার পর যদি তা মাঝখান হতে কেউ উড়িয়ে নেয় তবে তা আমাদেরি যায়, গৃহপতির নয়। এজন্য কোন হেতু যুক্তিতে আমরা অদত্তগ্রাহী সিদ্ধ হইনা। বরং আর্যগণ, তোমরাই ত্রিবিধ ত্রিবিধ ভাবে অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

কেন? আমরা কিভাবে অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত?

এইজন্য কি তোমরা অদত্ত দান গ্রহণ কর।

আমরা কিভাবে অদত্ত দান গ্রহণ করি?

আর্যগণ তোমরা এভাবে অদত্ত দান গ্রহণ কর। তোমাদের মতে দীয়মান অদত্ত, প্রতিগৃহ্যমান অপ্রতিগৃহীত ও নিসৃজ্যমান অনিসৃষ্ট। এভাবে তোমরা ত্রিবিধ ত্রিবিধ ভাবে অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

[ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

আর দশটা দৃশ্যের মতো এও একটা দৃশ্য না এর মধ্যে কোনো কিছুর ইঙ্গিত আছে সে কথা ভাবতে গিয়ে সিংহমহারাজের মনে হল, সমস্ত সংসারে যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে। এই ব্যাপারে ইতর প্রাণীর চাইতে মানুষও কিছু ভালো নয়। নির্দোষ প্রজাকে রাজকর্মচারীরা নানাভাবে পীড়িত করে। রাজকর্মচারীদের তিনি নিজে নানাভাবে শোষণ করেন। আর সবাইকে গ্রাস করবার জন্য কালও সর্বদা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত জগৎটাই মৃত্যুর করালগ্রাসের মধ্যে সমাবিষ্ট। তবু একে অন্যের অনিষ্ট করবার জন্য আমরা সর্বদা তৎপর। মৃত্যু বলে যে কিছু আছে তখন যেন তা আমাদের মনেই থাকে না। কিন্তু সংসারে যদি সব চাইতে নিশ্চিত কিছু থেকে থাকে, তবে তা মৃত্যু, সেকথা সে স্বীকার করুক আর নাই করুক।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে সে রাত্রে তাঁর ঘুম হল না। আর সেই বিনিদ্র রাত্রি তাঁর মনকে বৈরাগ্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়ে গেল—তিনি এক রাত্রেই সম্যকত্ব লাভ করলেন।

সিংহমহারাজ পরদিন সকালে মন্ত্রীকে ডেকে সেই কথাই বলছিলেন কি কি এমন সময় দূত এসে জানাল যে মাণ্ডলিক দুর্মতি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

দুর্মতি? নিজে?

সিংহমহারাজ ও মন্ত্রীর আশ্চর্যের সীমা নেই। কাল পর্যন্ত যে যুদ্ধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল সে কি আজ সকালে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারে? তবু সে যখন দেখা করতে এসেছে তখন দেখা না করাও ঠিক নয়। তাই সিংহমহারাজ বললেন, আচ্ছা, ওকে আসতে দাও।

দূত দুর্মতিকে ভেতরে নিয়ে এল। এক কুঠোর ছাড়া তখন তার হাতে অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না।

দুর্মতি শিবিরে প্রবেশ করেই সিংহমহারাজের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। এমন সাধুপ্রকৃতির অথচ শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধে অকারণ উপদ্রব করবার দোষ স্বীকার ও পশ্চাত্তাপের অভিনয় করে সে বলে উঠল, আপনি এখন আমায় রাখতেও পারেন, মারতেও পারেন। আমায় মারা যদি আপনার অভিপ্রেত হয় ত এই কুঠোর নিন। এখন আপনার যা ভালো মনে হয়।

সিংহমহারাজ একটু আগেই কালের বিচিত্র বিধানের কথা বলছিলেন। তাঁর মনে তখন উৎকট ঔদাসীন্য ছিল—সংসারে সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর। তাই তিনি যে তখন কারু প্রাণ নেবেন তা সম্ভবই ছিল না। তিনি তাই দুর্মতিকে অভয় দিয়ে বিদায় দিলেন।

এভাবে বিনাযুদ্ধে সিংহমহারাজের জয় হল। যারা লুটপাট করতে এসেছিল তারা নিরাশ হল। এত সস্তায় যুদ্ধ জয় তাদের একটুও ভালো লাগল না।

রাজধানীতে ফিরে আসার পরপরই সিংহমহারাজ নিজের রাজ্য পরিত্যাগের কথা ঘোষিত করে দিলেন। সে দিনের সেই দৃশ্য সংসার চক্রের ক্রূরতা ও কারুণ্যে তাঁর মন ভরে দিয়েছিল। এর মধ্যে হয়ত তিনি কোনো কিছুর ইঙ্গিতও দেখতে পেয়েছিলেন। তাই মন্ত্রীকে ডেকে তিনি সংসার পরিত্যাগ করবেন সেকথা বললেন। বললেন, ধর্মাচরণ ছাড়া এখন আমার আর কিছুতেই মন নেই, তুমি যুবরাজ আনন্দকুমারের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন কর।

[৩]

রাজ্য পরিত্যাগ করে শেষজীবন যে ধর্ম কার্যে ব্যতীত করবেন সে কথা সিংহমহারাজ রাণী কুসুমাবলীকেও বললেন। স্বামীর মুখে বিষাদের ছায়া

এদিকে কয়েকদিন হতে তিনিও লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু সে নিয়ে তিনি কোনো কথা বলেন নি। অন্তঃপুরের চার দেওয়ালে আবদ্ধ ও পরিচারিকাদের মুখে শোনা ভালোমন্দ খবরের ওপর নির্ভর করে চলমান জীবনের আকস্মিক পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি কিই বা বলবেন। আর যদি বলেনও ত তা নিজের মতো করেই বলবেন। তবে এটুকু তিনি বুঝে নিলেন যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তাঁর সহধর্মিণীর প্রতি সিংহমহারাজের এখন উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য এসে গেছে, যার জন্য অন্তঃপুরের আত্মীয় পরিজনের সংসর্গ এখন আর তাঁর ভালো লাগছে না।

একবারত তিনি পরিহাস করে বলেও ফেলেছিলেন, কি জানি কি গভীর চিন্তায় তুমি ডুবে আছ! আর যখন একান্তে থাক তখনত কথাই নেই। আমার প্রতি তোমার প্রেম চিরকালের তবু যখন তোমার সামনে এসে দাঁড়াই তখন তুমি আমায় দেখতেও পাও না। তুমি কি আর কারু প্রেমে পড়ে গেছ?

সিংহমহারাজ একটু হেসে প্রত্যুত্তর দিলেন, বিষয়ী জীব পারমার্থিক জিজ্ঞাসার কি বুঝবে?

কিন্তু সত্যত এই ছিল যে মহারাণী যখন সিংহমহারাজের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর পিতার সংসার পরিত্যাগের কথা চিন্তা করছিলেন। পিতা পুরুষদত্ত সামন্ত ও মন্ত্রী সহ আচার্য অমিততেজের কাছে যখন দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, যখন রাজ্যভার তাঁর ওপর এসে পড়েছিল— সেই সময়ের সেই সব অনুভবের কথা তাঁর মনে আসছিল।

আজ যখন তিনি তাঁর নিজের সংসার পরিত্যাগের কথা রাণীর কাছে খুলে বললেন তখন তিনি যে খুব বেশী আশ্চর্যান্বিত হলেন তা মনে হল না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে কার আশ্রয়ে ছেড়ে যাবে?

কেন, আনন্দকুমারের কাছে। তাছাড়া এতো এমন কোনো যাত্রা নয় যে তোমাকেও সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। এ কথা বলে সিংহমহারাজ রাণীকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু মা-র ত নিজের ছেলের ওপরই পুরো বিশ্বাস ছিল না। আনন্দ নিজের মায়ের মান সম্মান যে রাখত না তা নয় এবং যতদূর পারত তাঁকে কষ্টও

দিত না। কিন্তু মা'ত জানতেন যে আনন্দ এদিকে কিছু দিন হতে দুর্জন সংসর্গ করতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু সেকথা বলে স্বামীকে অপ্রসন্ন করতে তিনি চাইলেন না। যিনি সংসার পরিত্যাগ করতে মনস্থ করেছেন তাঁকে এ ধরণের কথা বলে কেন অকারণ সন্তপ্ত করা।

কিছু বলবার ছিল না। তাই দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। শেষে সিংহমহারাজই বললেন, বৈরাগ্যের কথা ছেড়ে দাও। বৃদ্ধ পিতা যদি বৈভব ও অধিকার আঁকড়ে পড়ে থাকে তবে যুবা পুত্রের মনে কি একথা উদিত হওয়া স্বাভাবিক নয় যে এই অন্তরায় যদি দূর হয়ে যায় তবেই ভালো হয়। সাধারণ গৃহস্থের কথা বলছি না কিন্তু রাজপরিবারেত এই আঁকড়ে থাকা পুত্রকে বঞ্চিত রাখার মতোই হয়ে পড়ে। ফলে সে কুসঙ্গে পড়ে যায়।

এই কথাই সিংহমহারাজ পুত্রের জন্মের সময়ে বলেছিলেন—সে কথা রাণী ভুলে যান নি। পুত্রের হাতে পিতার কিছু অনিষ্ট হবার পূর্বেই পিতা যদি পুত্রের হাতে দায়িত্ব দিয়ে সরে যান তবে তা অনুচিত বলে তাঁরও মনে হল না।

দেখো আজ হতে পঞ্চম দিন কুমারের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেছি। মাটি, দই, সরষে, চামর, গোরচন, সিংহ চর্ম, শ্বেতছত্র, ফুল, ভদ্রাসন আদি যা যা প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে মন্ত্রীকে আদেশ দিয়েছি। এ শুধু মুখের কথা নয়, সত্যসত্যই যে তার অভিষেক হচ্ছে তা কুমারের প্রতীতি হওয়া চাই। এই বলে সিংহমহারাজ কুসুমাবলীর মুখের দিকে চাইলেন।

অভিষেক হোক কিন্তু তার পর পরই যে তোমাকে বনে চলে যেতে হবে এর কি অর্থ আছে? তুমি আরো কিছু দিন কি এখানে থাকতে পারো না। —রাণী ধীরে ধীরে সে কথা সিংহমহারাজকে বললেন।

একবার নিশ্চয় করবার পর প্রমাদ করা উচিত নয়। সংসার চক্রে আবর্তিত হবার সময় এমন প্রমাদ কতই না করেছি। জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন কাটবার সঙ্কল্প নিয়ে তাকে যদি সফল না করি তবে আবার বন্ধনে আটকে যাব। —এই বলে সিংহমহারাজ চুপ করে রইলেন।

কুসুমাবলীর যদিও অনেক কিছু বলবার ছিল তবু তা নিরর্থক ভেবে তিনিও চুপ করে রইলেন।

[৪]

শরণ নেবার পর দুর্মতি যদি শান্ত হয়ে বসে থাকবে তবে তার দুর্মতি নামের সার্থকতা কি ? শরণাগতি নেওয়া ত তার কপট মাত্র ছিল। সে যখন দেখল যে সিংহমহারাজের প্রচণ্ড শক্তিকে সে নমিত করতে পারবে না, ও সিংহমহারাজও দু' দুবার হটে আসা তাঁর সৈন্যের অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে শান্ত হবেন না তখন সে শরণাগতির এই ছলের আশ্রয় নিয়েছিল। শরণাগতি নেওয়া ত কোনো গৌরব বা সৌভাগ্যের বিষয় নয়, নিজের পরাভব। তাই তা তার বৃশ্চিক দংশনের মতোই মনে হচ্ছিল। শরণাগতি নিয়েও সে তাই ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তৃত করছিল।

এবং দৈবও এবিষয়ে তাকে সাহায্য করল। যুবরাজ আনন্দের সৌহার্দ্য সে অনায়াসেই লাভ করল। আনন্দকুমার সিংহাসনারোহণের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। এমন কি এক মুহূর্তের বিলম্বও তার অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল।

দুর্মতি আনন্দকুমারের এই দুর্বলতার সুযোগ নিল। তার পরমমঙ্গলাকাঙ্খী-রূপে সে আনন্দকে গিয়ে বলল, কুমার আপনার রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতির সবটাই আমার ভান বলে মনে হচ্ছে। আপনাকে ভ্রান্ত করার এ এক প্রয়াস মাত্র। যে একবার অধিকারের আস্বাদ পেয়েছে, অধিকারের অহঙ্কার যার শরীরের অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে সে কি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেই অধিকারকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করতে পারে ? সে ভাই হোক বা পিতা, সে ভালো লোক হোক কি সংসার বিরক্ত—তাতে কি ? আমি ত বলি অধিকার দয়ার দান রূপে স্বীকার করা বা তার প্রতীক্ষা করা আপনার মতো বীর পুরুষের শোভা পায় না। আমি নিজে এই অধিকারের আস্বাদ গ্রহণ করেছি। যদিও আমি আজ আপনাদের শরণাগত তবু সেই অধিকারের মোহ আমি পরিত্যাগ করতে পারিনি।

[ক্রমশঃ

ডঃ আদিনাথ নেমিনাথ উপাধ্যে

ডঃ আদিনাথ নেমিনাথ উপাধ্যে গত ৮ই অক্টোবর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় কোলহাপুরে ৭২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত আদি প্রাচীন ভাষা ও জৈন বিদ্যার আন্তর্জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সাহিত্য সেবার জন্য প্রশস্তিপত্র দান করে এ বছর ১৫ই আগষ্ট রাষ্ট্রপতি তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন।

ডঃ উপাধ্যে জৈন বিদ্যা ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কিত সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষা বিষয়ক অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান মূলক এক শতাধিক প্রবন্ধ ও ২৫টিরও বেশী মহত্বপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থের সংশোধন ও সম্পাদন করেন। আচার্য কুন্দকুন্দ রচিত 'প্রবচনসার' গ্রন্থের বিদ্বত্বপূর্ণ সম্পাদনের জন্য ১৯৩৭ সালে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট্. উপাধি দান করে। স্বর্গীয় ডঃ হীরালাল জৈন-এর সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল জৈন বাঙ্‌ময়ের সেবা করে গেছেন। ধবলার ১৬ ভাগের সম্পাদনা ছাড়াও মূর্তিদেবী গ্রন্থমালা, মাণিকচন্দ্র দিগম্বর গ্রন্থমালা ও

জীবরাজ জৈন গ্রন্থমালার প্রধান সম্পাদকরূপে ডঃ উপাধ্যে ও ডঃ হীরালাল জৈন উভয়ে উভয়ের অনন্ত সহযোগী ছিলেন।

ডঃ উপাধ্যের সাহিত্যিক, শ্রমণিক, ও সামাজিক বহু সংস্থার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক ছিল ও তিনি জৈন বিদ্যার অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণায় বহুলোককে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর মৃত্যু জৈন বাঙ্ময়ের অপূরণীয় ক্ষতিরূপেই বিবেচিত হবে। তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ১২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. III. No. 8 : Sraman : December 1975

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১. সাতটি জৈন তীর্থ	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৩.০০
২. অতিমুক্ত	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৪.০০
৩. শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৩.০০
৪. ভগবান মহাবীর ও জৈন ধর্ম	—শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা	২.০০

हिन्दी

१ अतिमुक्त – श्री गणेश ललवानी
अनु: श्री राजकुमारी बेंगानी ४.००

२ श्री जिन गुरु गुण सचित्र पुष्पमाला
– श्री कान्तिसागरजी महाराज ५.००

३ श्रीमद् देवचन्दकृत अध्यात्मगीता
– श्री केशरीचन्द धूपिया .७५

४ भगवान महावीर (एलबम्) १०.००

English

1. Bhagavati Sutra
(Text with English Translation)
—Sri K. C. Lalwani
Vol. I (Satak 1-2) 40.00
Vol. II (Satak 3-6) 40.00

2. Essence of Jainism —Sri P. C. Samsukha .75
tr. by Sri Ganesh Lalwani

3. Thus Sayeth Our Lord —Sri Ganesh Lalwani 1.50

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ ॥ পৌষ ১৩৮২ ॥ নবম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

ভগবান বাহুবলী, শ্রবণ বেলগোলা

মহাযাত্রী

মুনি শ্রীরূপচন্দ্র

অর্থশূন্য অর্থের মধ্যে দাঁড়িয়ে
শূন্যকে স্পর্শ করা এক অর্থপূর্ণ অর্থ।
সত্তা,
শক্তি,
বিজয়দর্পের মূল্যকে
স্বীকারাত্মক নঙর্থে পরিণত করতে করতে
তুমি জন্ম দিলে নঙর্থক এক স্বীকৃতির,
(একথা বিবশ হয়েই বলছি,
এ তোমার কাজ নয়,)
তোমার ললাট হতে চুঁয়ে চুঁয়ে
বিন্দু হল প্রবাহ
কিন্তু তুমি প্রবাহ হলে না।
তোমার মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
সময় হল পরম্পরা
কিন্তু তুমি পরম্পরা হলে না।

মুনি শ্রীরূপচন্দ্র কৃত হিন্দী কাব্যগ্রন্থের শ্রীগণেশ লালওয়ানীকৃত বঙ্গানুবাদ 'ভিড়ে ভরা চোখ' এর উপর গত ২০শে ডিসেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রেক্ষাগৃহে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সেই কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা ওপরে প্রকাশিত হল।

আজ আমার মনে হচ্ছে
তোমায় নির্দেশকারী সব অর্থ
হয়ে গেছে নিরর্থক,
আমি সেই এক অর্থের খোঁজে
হারিয়ে গেছি নঙর্থে।

তুমি—
এক সম্পূর্ণ অর্থ কেবল এজন্য
কারণ কোন অর্থই বার হয় না তোমা হতে।
তুমি এমন এক মহাযাত্রী
সময় চলে যার সাহায্যে,
কিন্তু নিজে যে কখনো চলে না।

[শ্রবণ বেলগোলার ৫৬ ফিট উঁচু ভগবান বাহুবলীর বিশালকায় প্রতিমার চরণে বসে লিখিত]

পুরুলিয়ার একটি জৈন পুরাক্ষেত্র

শ্রীশিবেন্দু মান্না

প্রাক্‌ কথন

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ষ্টেটস রি-অরগানাইজেশন বিধি অনুসারে, ১লা নভেম্বর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বিহারের মানভূম জেলার একাংশ পুরুলিয়া জেলা রূপে পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিম বাংলার প্রায় সমতল ভূখণ্ডে পুরুলিয়া কেবল ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যই সঙ্গে আনে নি, তার সঙ্গে এনেছে এক সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—যার ধারা যুগ যুগান্ত ব্যাপী ভারতভূমিতে প্রবহমান। ২৪০৭ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে কল্পনাতীত দারিদ্র, শিল্প-অর্থনীতি-কৃষিতে নিদারুণ অনগ্রসরতা আমাদের বেদনার কারণ হলেও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের দিক থেকে এই জেলার জন্য আমরা গর্ব বোধ করতে পারি, যদিও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বিচারের ক্ষেত্রে জেলাওয়ারী রাজনৈতিক সীমারেখা অনকাংশে মূল্যহীন বলেই বোধ হয়।

প্রাচীনকালের বৃহত্তর রাঢ়-বঙ্গের, সিংভূম-মানভূম-ঝাড়খণ্ড এলাকার এবং পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা রাজ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রোত দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হয়েছে অধুনাতন পুরুলিয়া তথা পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের ওপর দিয়ে। এ ছাড়াও এই অঞ্চল অনার্য এবং আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত এবং সমন্বয়ভূমি, ফলে যেমন মনন-মানসিকতার ক্ষেত্রে, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে, লোক চর্যার ক্ষেত্রে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শৈলীতেও বিবিধ সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে এর অঙ্গে অঙ্গে এবং তদনুরূপ সংমিশ্রণও ঘটেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সর্বস্তরে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধর্ম-দর্শনের অন্যতম হচ্ছে জৈনধর্ম, এবং এই ধর্মের প্রভাব ও প্রসারের একটি মুখ্য কেন্দ্র হচ্ছে প্রাচীন 'প্রাচ্যদেশ'। ডঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, "প্রাচ্যদেশের আর্যীকরণ জৈনধর্মের

দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিলো।" প্রাচীনকালের রাঢ়ভূমি সহ-অধুনাতন পশ্চিম-বঙ্গের অধিকাংশ এলাকাই হচ্ছে পুরাণ বর্ণিত প্রাচ্যদেশ।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'দি হিষ্টরি অফ বেঙ্গল' (ভল্যুম-১) গ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে : "It appears from the statement of Hiuen Tsang that the Nirgranthas formed a dominant religious sect in Northern, Southern and Eastern Bengal in the 7th century A. D....The Nirgranthas, however, seem to have almost disappeared from Bengl in the subsequent period, and the numerous inscriptions of the Palas and the Senas contain no reference to them." [Pages 410-411, 1st Edition.]

হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের সময় বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের অপ্রতিহত প্রভাব থাকলেও পরবর্তীকালে পাল-সেন রাজত্বকালে জৈন ধর্মের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়ে গেল কেন? প্রাথমিক ভাবে এর কারণ স্বরূপে বলা যায় : পাল ও সেন রাজাদের আমলে বঙ্গদেশে যথাক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান। এ ছাড়া প্রাচ্যদেশীয় জৈনধর্ম তখন পশ্চিম ভারতাভিমুখী হতে সুরু করেছে। তথাপি রাঢ় দেশে তখনও জৈন ধর্মের প্রাধান্যের অবশেষটুকু ভালোভাবেই ছিল, কারণ "রাঢ়দেশ, বিশেষ করে সে অঞ্চলের তৎকালীন অরণ্যাবৃত বিস্তীর্ণ অংশ, কখনই পুরাপুরিভাবে পাল রাজশক্তির কর্তৃত্বের মধ্যে আসে নি। অতএব, উত্তরকালের আশ্রয়প্রার্থী জৈনধর্ম এই ভূভাগেই নিজ প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখবার চেষ্টা করে। সেন রাজাদের আমলেও এ-প্রতিষ্ঠা কতকাংশে বজায় ছিল মনে হয়।" [বাঁকুড়ার মন্দির, শ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৮]

যাই হোক, রাঢ়ভূমি বা অধুনাতন পুরুলিয়াতে জৈন ধর্ম কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান এখনও বিলুপ্ত হয়নি—পুরুলিয়ার 'সরাক' (শ্রাবক=সরাক) জাতির লোকেরাই তার প্রমাণ। রাঁচীর শ্রীশরৎচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করে গেছেন : "সরাক জাতির গঠন ধর্মবিশ্বাস-মূলক। ...বর্তমান কালে মানভূম জেলার উত্তর-পূর্বে রঘুনাথপুর, পাড়া ও গৌরাঙ্গডি থানার এলাকায় 'সরাক'-দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। আর দক্ষিণে ও পশ্চিমে চাণ্ডিল ও চাস থানায়

এলাকাতেও কতক সরাকের বাস এখনও আছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদম-সুমারীতে এই জেলায় প্রায় সাড়ে দশ হাজার সরাকের বাস ছিল।···কিন্তু এক সময় এই জেলার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম—সব দিকেই এই সরাক জাতির প্রভাব ও বসতি ছিল। এখনও নানা স্থানে প্রাচীন মন্দিরের এবং জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তির ভগ্নাবশেষ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। উত্তর-পূর্বে তেলকুপি ও চেলিয়ামা এবং গৌরাঙ্গডি, উত্তর-পশ্চিমে ছেছগাঁও ও বেলোঙ্গা; দক্ষিণ-পূর্বে পাকবিড়রা ও বুদ্ধপুর, দক্ষিণ-পশ্চিমে বোড়াম, তুলমি, দেওলি, সুইসা ও সফারণ এবং মধ্য ভাগে পাড়া, ছররা, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও সরাকদের মন্দিরগুলির সুন্দর স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনেক নিদর্শন বর্তমান" [মানভূম জেলায় সাহিত্য সেবা ও গবেষণার উপাদান, শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২]

কুপল্যাণ্ড সম্পাদিত মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে মন্তব্য করা হয়েছে: খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক পাঁচ ছয় শত বৎসর হইতে খ্রীষ্টিয় সমস্ত শতাব্দী পর্যন্ত এই জেলায় সরাকদের প্রাধান্য ছিল।

সুতরাং বঙ্গদেশে জৈন ধর্মের ধাত্রীভূমি পুরুলিয়া তথা বৃহত্তর রাঢ়ভূমি অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে জৈন পুরাকীর্তি 'আবিষ্কৃত' হবে এটা স্বতঃস্বীকার্য।

গ্রামের নাম ছড়রা

গ্রাম বাংলার অসংখ্য গ্রামের মধ্যে ছড়রা একটি গ্রাম হলেও ইতিহাসের স্বাক্ষর এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আজো জড়িয়ে আছে, তারই আকর্ষণে অনেক কৃত-বিদ্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ প্রত্ন-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এই গ্রামে এসেছেন। ছড়রা পূর্বতন মানভূম জেলা (বিহার প্রদেশের অন্তর্গত) অধুনাতন পুরুলিয়া জেলার (পশ্চিমবঙ্গ) একটি ছোট্ট গ্রাম [জে. এল. নং. ২৫০, পুরুলিয়া মফস্বল]। আয়তন প্রায় ২৫০০ একর। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে লোকসংখ্যা মাত্র ৩১০০ জন। শহর পুরুলিয়া থেকে পুরুলিয়া বরাকর রোড ধরে মানবাজারগামী বাসে চার মাইল উত্তর-পূর্বদিকে গেলেই এই গ্রামটি পাওয়া যাবে। বাস রাস্তার ধারেই গ্রামটির অবস্থান। বাস স্টপেজ—ছড়রা

হাইস্কুল। ট্রেণে গেলে পুরুলিয়া-আদ্রা লাইনে ছড়রা স্টেশনে নেমে মাইলখানেক পথ হাঁটতে হবে।

'ড়া' বা 'আড়া' প্রত্যয়ান্ত গ্রাম নাম পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গে যথেষ্ট সংখ্যক মিলে। ছড়রা অষ্ট্রিক শব্দোদ্ভূত। অষ্ট্রিক শব্দগোষ্ঠীতে 'ড়া' বা 'আড়া'-র অর্থ ঘর। 'আড়া'-র 'ড়া' প্রত্যয় স্থাননামে ব্যবহৃত হয়েছে। উচ্চারণ ভঙ্গী ছাড়রা=ছ(র্) ড়রা ছড়রা বা ছররা এইভাবে বিবর্তিত হয়েছে বলে অনুমান। গ্রাম নামটি ইংরাজীতে, মিঃ বেগলার লিখেছেন Chhorra, ডাল্টন লিখেছেন Churra, শ্রীবিনয় ঘোষ এবং মিঃ ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন লিখেছেন Chorra.

ছড়রা-র মন্দির

আজ থেকে অনধিক একশ বছর পূর্বে, ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জে. ডি. বেগলার পুরাবৃত্ত-অনুসন্ধানী পরিক্রমায় বহির্গত হয়ে এই গ্রামটিতে এসে মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ, পাথরের অসংখ্য ভগ্ন মূর্তি, মন্দির অলঙ্করণের অংশ বিশেষ সহ মাত্র দুটি প্রায় অক্ষত অভগ্ন পাথরের মন্দিরের সন্ধান পান। মিঃ বেগলারের মতে এই সব মন্দিরের এবং মূর্তির অধিকাংশই হোল ব্রাহ্মণ্য ও বিষ্ণোপাসকদের। তিনি এরই সাথে বুদ্ধ অথবা জনৈক জৈন তীর্থংকরের উৎকীর্ণ মূর্তি সহ উৎসর্গীকৃত চৈত্য সমূহও দেখেছিলেন বলে মন্তব্য করে গেছেন।

মিঃ বেগলারের পরিক্রমার অন্ততঃ একদশক পূর্বে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ছোটনাগপুরের তদানীন্তন কমিশনার লেঃ কর্ণেল ডাল্টন এতদ্‌অঞ্চলে পরিক্রমার পথে ছড়রাতে আসেন এবং দুটি অক্ষত অথচ পুরাতন দেউলের সন্ধান পান। ডাল্টন মন্তব্য করে গেছেন: পূর্বে এখানে সাতটি দেউল ছিল, যার মধ্যে পাঁচটি ভূমিস্যাৎ হয়ে গেছে এবং ভগ্ন মন্দিরের পাথর ইত্যাদি গ্রামবাসীরা তাঁদের ঘরদোরের কাজে লাগিয়েছেন।

মিঃ বেলগারের পরে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ব্লক ছড়রার পুরাকীর্তি দর্শনান্তে মন্তব্য করে গেছেন: দেউলগুলি পাথরের তৈরী, আকারে নাতিবৃহৎ, এবং যে সব মূর্তিআপাততঃ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলির অধিকাংশই জৈনমূর্তি, দেউলগুলিও জৈন উপাসকদের বলেই অনুমান, তবে লক্ষ্যনীয়ভাবে ব্যতিক্রম হোল একটি পাথরের লিঙ্গ।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ শ্রীঅনন্ত প্রসাদ শাস্ত্রী ছড়রাতে আসেন এবং তিনিও দুটি প্রায় অক্ষত, অভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান পাথরের দেউল দেখতে পান। দেউল দুটির মধ্যে একটি তখনও সংরক্ষণের উপযোগী বলে মন্তব্য করেছিলেন। এছাড়া শাস্ত্রী মহাশয় গ্রামের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় অসংখ্য ভগ্ন জৈনমূর্তি দেখতে পেয়েছিলেন।

কুপল্যাণ্ড সম্পাদিত মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারেও ছড়রার সাতটি দেউলের মধ্যে দুটি প্রায় অক্ষত দেউলের উল্লেখ আছে।

স্বর্গতঃ নির্মলকুমার বসু 'মানভূম জেলার মন্দির' প্রবন্ধে (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দ) মন্তব্য করেছেন : "ছড়রায় খাজুরাহার মত যুগল জৈন মূর্তি ও তীর্থংকরদের মূর্তিও যথেষ্ট পাওয়া যায়।"

লেঃ কর্ণেল ডাল্টন, মিঃ বেগলার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, অনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র রায় প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধান থেকে এ কথা স্বতঃই সমর্থিত হয় যে, ছাড়রায় একদা জৈন ধর্মের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রখ্যাত মন্দির প্রেমিক ও ভারতবিদ মিঃ ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন ছড়রা পরিদর্শনান্তে ছড়রার পূর্বোক্ত দুটি প্রায় অভগ্ন অক্ষত দেউলের মধ্যে মাত্র একটিকে তখনও সংরক্ষণের যোগ্য অবস্থায় দেখতে পান। ছড়রার দেউল সম্পর্কে 'নোটস্-অন দি টেম্পলস অফ পুরুলিয়া' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : "The one which is still standing has an entirely plain *tri-ratha* wall only the most rudimentary moulding at the base but the tower is quite extensively carved with square *bhumi-amlakar* large *chaityas* on the central projection, and small *chaityas* on the other sections—now badly worn. The ornamentation of the *'shikhar'* suggests an earlier stage than that of the Telkupi temples." [*Purulia District Census Handbook,* 1961]

ভারতীয় দেবালয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ত্রিরথ বিন্যাসটিই সর্বপ্রাচীন, পঞ্চরথ সপ্তরথ বিন্যাস পরবর্তী কালের। তাছাড়া, মিঃ ম্যাক্কাচ্চন ছড়রার সঙ্গে

তেলকুপির মন্দির শ্রেণীর শিখর দেশের যে তুলনা দিয়েছেন, সেই তেলকুপি গ্রাম তার বহু মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সহ কংসাবতী জলাধারে নিমজ্জিত হয়েছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় জল কমে গেলে নিমজ্জিত অথচ সংরক্ষণযোগ্য অবস্থায় দণ্ডায়মান কিছু কিছু মন্দিরের পূর্ণরূপ দৃষ্টিগোচর হতে পারে এবং টেলিফটো লেন্স যোগে আলোকচিত্রাদি নেয়া যেতে পারে। উৎসাহী এবং আগ্রহী ব্যক্তিরা, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার শ্রীমতী দেবলা মিত্র প্রণীত 'তেলকুপি—এ সাবমার্জড্ টেম্পল সাইট ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল' গ্রন্থটি দেখতে পারেন এবং হাওড়ার আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা (নবাসন, বাগনান) অথবা নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগারের সংগ্রহালয় বিভাগের উদ্যোগে যে সমস্ত আলোকচিত্রাদি সংরক্ষিত আছে তাও দেখতে পারেন। বলা বাহুল্য, তুলনামূলক বিচার বা আলোচনার ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অবলুপ্তি এবং সময় মতো সচেতন না হওয়া যে কতখানি দুর্ভাগ্যজনক তা তেলকুপি ও ছড়রার দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। তেলকুপিও এক সময় জৈন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

লেঃ কর্ণেল ডালটন, মিঃ বেগলার উল্লিখিত ছড়রার দুটি প্রায় অক্ষত দেউলের মধ্যে একটিকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা দেখে এসেছিলাম অপরটি ভূমিস্যাৎ হয়ে গেছে এবং গ্রামবাসীরা যথারীতি পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রেখে মন্দিরের পাথরগুলিকে নিজেদের ভোগে লাগিয়েছেন। ছড়রার 'সবে ধন নীলমণি' অমূল্য নিদর্শনটির বর্তমান অবস্থা কি রকম? মানুষী অবহেলা এবং প্রাকৃতিক পীড়ন উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার আয়ু আর বেশীদিন নয়, কারণ, দেউলটির সামনে পিছনে গণ্ডী অংশে শীর্ষদেশ পর্যন্ত লম্বালম্বি একটি ফাটল লক্ষ্যনীয়ভাবে চোখে লাগে। অনেক জায়গায় পাথর খসে পড়েছে আর শীর্ষদেশের আমলকের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষী অবহেলা এবং প্রাকৃতিক পীড়নের করুণ পরিণতি, ধ্বংসের বীজস্বরূপ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দেউলটিকে পাক দিয়ে সতেজ বেড়ে উঠছে—এর পরিণতি কি হতে পারে তা আমরা জানি। ছড়রার এই অমূল্য প্রত্নকীর্তিটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে কিছু আলোকচিত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শীকৃত তথ্য বিবরণ ইত্যাদি ছাড়া ভবিষ্যত অনুগামীদের জন্য বিশেষ কিছুই থাকবে না।
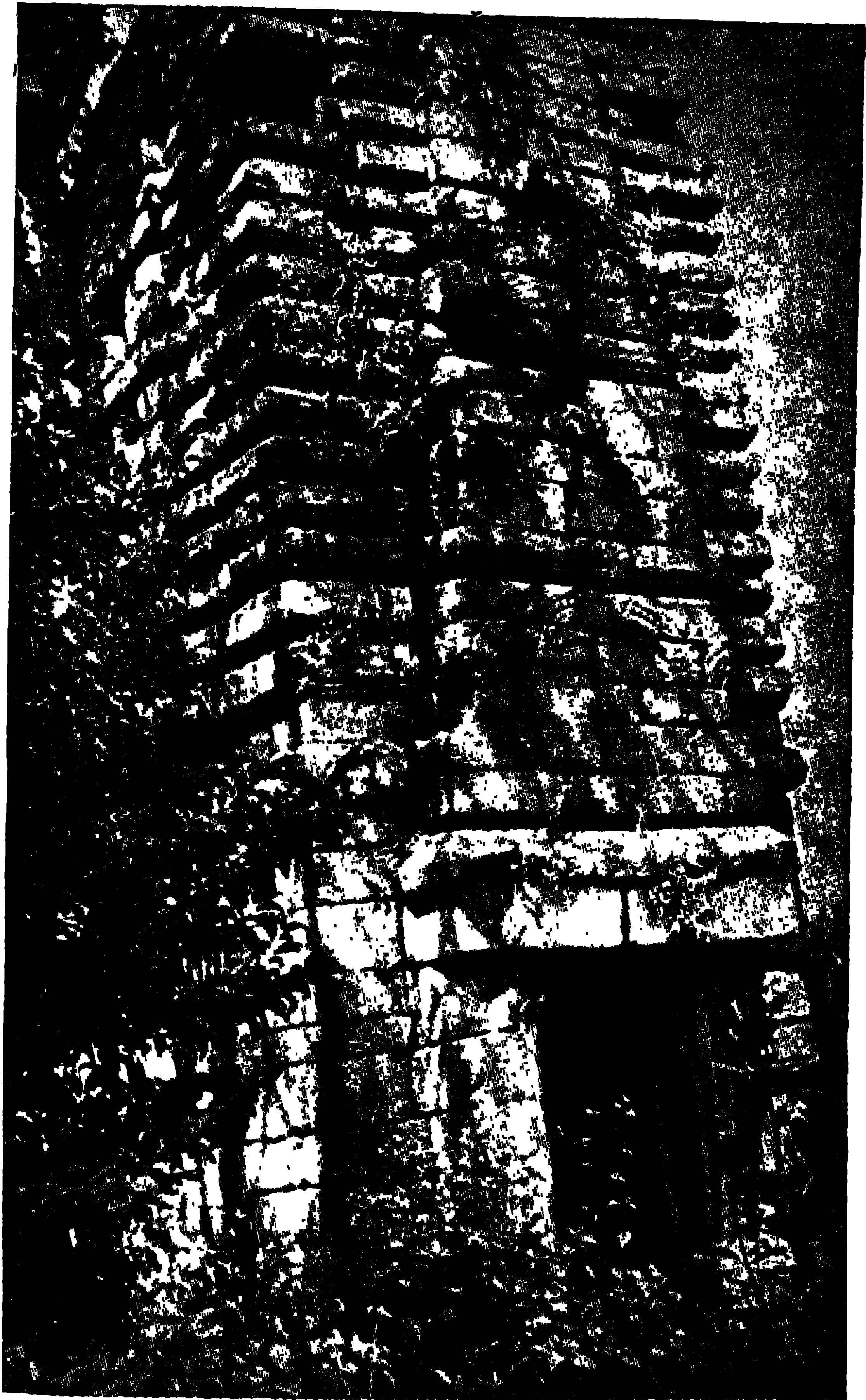
একটি অশ্বত্থবৃক্ষ দেউলটিকে পাক দিয়ে সতেজ বেড়ে উঠছে—এর পরিণতি কি হতে পারে তা আমরা জানি। পৃঃ ২৬৬

ছড়রার দেউলটির তিনটি অংশ—বাড়, গণ্ডী ও মস্তক। বাড় অংশের দুটি ভাগ—পা-ভাগ ও বরণ্ড। বাড় অংশের উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট এবং এই অংশটি ত্রি-রথ শৈলীতে নির্মিত। কেন্দ্রীয় রথটি দেউলের মূলগাত্র থেকে প্রায় ৩" ইঞ্চি উঁচু। স্বর্গত ম্যাক্‌কাচ্চন কতৃ‍ক গৃহীত দেউলটির বিভিন্ন অংশের মাপগুলি হোল : ভিত্তিভূমি—৭'৬" × ৭'; গর্ভগৃহ—৪' × ৩'৮"; উচ্চতা—আনুমানিক ২২' ফুট।

এছাড়া মৎগৃহীত অন্যান্য অংশের মাপগুলি হোল, গর্ভগৃহের উচ্চতা (গর্ভগৃহের ভূমি থেকে)—৮'২"; প্রবেশদ্বারের উচ্চতা (প্রবেশ পথের মেঝে থেকে)—৫'৫"; প্রবেশদ্বারের প্রস্থ—২'২"।

গর্ভগৃহের মাথাটি দুটি আয়তাকার পাথরের স্ল্যাব দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তার ওপর যে মন্দির শিখরটি বর্তমান অর্থাৎ গর্ভগৃহের ছাদ থেকে বেঁকি পর্যন্ত গণ্ডীর মধ্যেকার অংশটি ফাঁপা। ফাঁপা রাখা হোত যাতে মন্দিরের গণ্ডী অংশ অনাবশ্যক ভারী হয়ে না যায়। দেউলটির গণ্ডী অংশটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। কোণাংশগুলির স্তর একটি আমলকের আকারে খোদিত। অপর স্তরটিতে এককালে হয়ত অন্য প্রকার অলঙ্করণ ছিল, বর্তমানে দু-এক স্থানে তার আভাস মাত্র চোখে পড়ে। দেউলটির সম্মুখভাগের কেন্দ্রীয় পগটিতে বাড়ের বরণ্ড অংশের উপরে একটি এবং কিছু দূর ব্যবধানে আরও দুটি অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি ধরণের এক ধরণের অলঙ্করণের আভাস বেশ স্পষ্ট। দেউলের বাকী তিন দিকের কেন্দ্রীয় পগগুলিতে হয়ত কোণাপগগুলির মত আমলক সদৃশ অলঙ্করণ ছিল। ক্ষয় প্রাপ্ত পাথরের গায়ে যেন তারই ইঙ্গিত। দেউলের মস্তকাংশে বেঁকি ও আমলক ছাড়া আর কিছু নেই। আমলকের নিম্নাংশ এবং বেঁকির উর্দ্ধাংশের মধ্যে সামান্য পলেস্তারার আবরণ এখনও দেখা যায় এবং এই পলেস্তারার ওপর একটি সুকুমার অলঙ্করণ কালের হাত এড়িয়ে আজও রয়ে গেছে; এরই পরিপ্রেক্ষিতে, বোধ করি এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এককালে সমস্ত দেউলটিতে পলেস্তারার আবরণ ছিল এবং তার ওপর ছিল নানান মনোহারী চিত্তগ্রাহী নয়নলোভন শৈল্পিক কারুকর্ম।

এবার একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, ছড়রার দেউলটি কতকালের প্রাচীন? স্বর্গত শরৎচন্দ্র রায় (রাঁচী) একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন: "সম্ভবতঃ

সপ্তম শতাব্দীতে মানভূম জেলায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয় এবং দশম খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরাকাষ্ঠা হয়। এই জেলার হিন্দু দেবদেবীর পুরাতন মন্দিরগুলি অধিকাংশ ঐ সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়।" [প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২, পৃঃ ৫৪৬]

এতদ্ সত্ত্বেও যেহেতু "রাঢ়ভূমির অব্যবহিত পশ্চিমে সিংভূম, পুরুলিয়া থেকে শুরু করে পরেশনাথ পাহাড় ও গণ্ডোয়ানা অবধি এলাকা প্রাচীনকালে জৈন ধর্মের বিকাশের প্রধানতম কেন্দ্র ছিল", যেহেতু অন্যত্র জৈন ধর্মের গতি বা বিকাশ রুদ্ধ হলেও উত্তরকালে জৈন ধর্মের মূল কেন্দ্রটি রক্ষায় সর্বতো প্রচেষ্টা হয়েছিল বলে অনুমান।

এছাড়া, স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মিডিভ্যাল্ স্কালপ্চার' গ্রন্থে বলেছেন যে রাঢ়দেশে বা তার অব্যবহিত পশ্চিমে লিপিযুক্ত কোন জৈন মূর্তি পাওয়া যায় নি। প্রাপ্ত বিগ্রহগুলির কাল নির্ণয় সেজন্য অসুবিধা জনক হলেও তিনি অনুমান করেছেন, খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়ে এগুলি নির্মিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এ-মূর্তিগুলির অধিষ্ঠানের জন্য সেকালে মন্দিরাদিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "...খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতক অবধি, পূর্ব ভারতে রাঢ়ভূমিই জৈন ধর্মের শেষ আশ্রয় স্থল ছিল।" [বাঁকুড়ার মন্দির, শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩-১৪]

পূর্বোক্ত মন্তব্য সমূহের আলোকে আমরা অনুমান করতে পারি, খ্রীষ্টিয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে কোন এক সময় ছড়রার দেউলও নির্মিত হয়েছিল। ভারতীয় মঠ-মন্দির স্থাপনার ক্ষেত্রে যেহেতু পারমার্থিক চিন্তাই মুখ্য সেহেতু মঠ-মন্দির স্থাপনার ইতিহাস, সন তারিখ বাহুল্য বিবেচনায় বর্জিত হওয়ায় ঐতিহাসিক দিক থেকে আমাদের সমূহ ক্ষতি হয়েছে—ছড়রার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি বলে, যুক্তিনিষ্ঠ অনুমানের ওপরই কালনির্ণয় নির্ভরশীল হয়েছে।

অন্যান্য প্রত্ন-নিদর্শন

ছড়রা গ্রামের গোটা চারেক প্রায় আধুনিককালের মন্দিরে ভগ্ন ও অভগ্ন

দেবদেবী বা জৈন মূর্তির সমাবেশ ঘটেছে। বলা বাহুল্য এগুলি স্থানীয় জন-সাধারণ কর্তৃক পুজার্চনার নিমিত্ত সংগৃহীত। গ্রামের মধ্য স্থলে রয়েছে গ্রাম দেবতা ধর্ম ঠাকুরের থান। গ্রামবাসীদের কাছে ধর্ম ঠাকুরের থান হলেও সেটি আমাদের মতো বহিরাগতদের কাছে 'মিউজিয়ম'-বিশেষ। অলঙ্করণ সমৃদ্ধ ছোট ছোট পাথরের খণ্ড, ছোট ছোট মূর্তি, মূর্তির ভগ্নাংশ—যা কিছু এই গ্রামের নানান জায়গায় পাওয়া গেছে, সে সব কিছুই একটি জীর্ণ মাটির ঘরে, মাটির উঁচু বেদীর ওপর রাখা আছে। এই তথাকথিত মন্দিরটি স্থানীয় ডোমদের। তারা এখানে সংগৃহীত বিচিত্রিত প্রস্তরখণ্ড ও জৈন মূর্তিকে ধর্মরাজ জ্ঞানে পূজা করে থাকে। এখানে সংরক্ষিত একটি জৈন মূর্তির মস্তকে সর্পাচ্ছাদন দেখে পার্শ্বনাথের মূর্তি বলে অনুমান করা যায়। এই ধর্মরাজের থান থেকে পঞ্চাশ-ষাট ফুটের মধ্যে প্রায় একটি সরল রেখার আশেপাশে দুটি দালান মন্দিরের গাত্রে জৈনমূর্তি প্রোথিত আছে। দালান মন্দিরগুলি অর্বাচীন কালের। একটি হচ্ছে শিবমন্দির, অপরটিকে বলা হয় বাসন্তী মেলা। শিব মন্দিরের প্রবেশ পথের ডান দিকে দেয়াল গাত্রে যে জৈন মূর্তিটি প্রোথিত আছে সেটি অষ্টম তীর্থংকর চন্দ্রপ্রভর—পাদপীঠে খোদিত অর্দ্ধচন্দ্র তাঁরই লাঞ্ছন। বাসন্তী মেলা নামীয় দালান মন্দিরের একটি থামের গায়ে যে জৈনমূর্তিটি প্রোথিত আছে সেটি প্রথম তীর্থংকর আদিনাথ বা ঋষভনাথের — মূর্তির পাদপীঠে বৃষভ লাঞ্ছন আছে। রিলিফ পদ্ধতিতে খোদিত পাথরটির দৈর্ঘ্য ৩'৯", প্রস্থ ১'১১"; মূর্তিটির উচ্চতা ২'৬"। সমভঙ্গে দণ্ডায়মান দিগম্বর মূর্তি। এই মূর্তির দু'পাশে স্বল্প উচ্চতা-বিশিষ্ট সালঙ্কার, বসনাবৃত কটিদেশ, আভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান দুটি পুরুষ মূর্তি। এই মূর্তি দুটির দৃষ্টি—আদিনাথের মুখের দিকে নিবদ্ধ—এর ব্যঞ্জনাটি এই, সাধারণ মানুষের তুলনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত পার্থিব গুরু বা অপার্থিব দেবতা কত মহান! কত বিরাট!

পূর্বোক্ত ধর্মরাজের থানের কয়েক গজ দূরেই একটি দেউলের ভিত্তিবেদী দেখা যায়। এখানে একটি আমলক এবং নানাবিধ উচ্চতার কয়েকটি 'ভোটিভ' চৈত্য পড়ে রয়েছে। 'ভোটিভ' চৈত্যগুলি দেউলাকৃতি এবং চারিদিকে চারটি প্রকোষ্ঠে জৈন তীর্থংকর মূর্তি খোদিত আছে।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলি ছাড়াও গ্রামে একটি অতি সাম্প্রতিক কালের
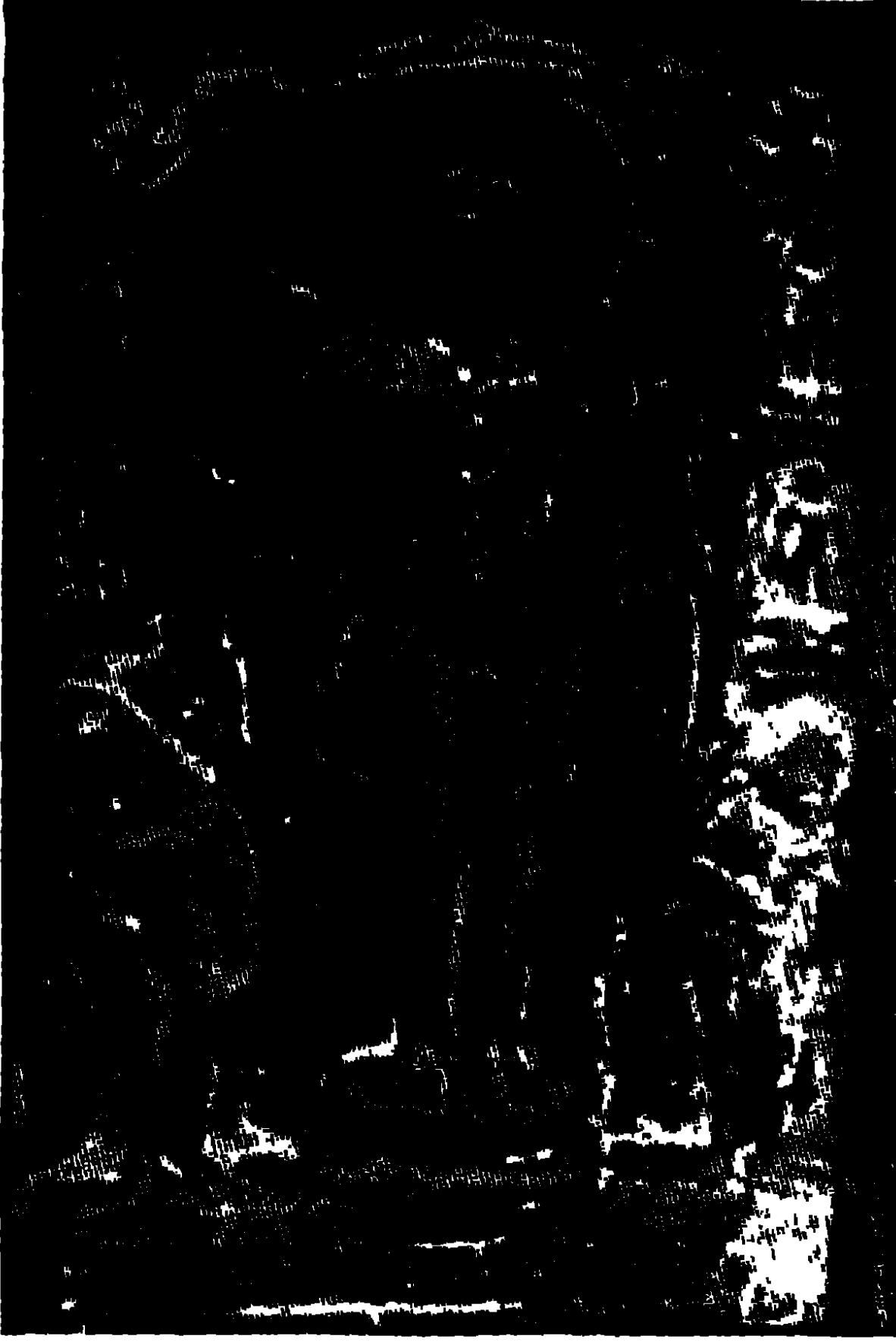
শিবমন্দিরের প্রবেশপথের ডান দিকে দেয়াল গাত্রে যে জৈন মূর্তিটি প্রোথিত আছে সেটি অষ্টম তীর্থংকর চন্দ্রপ্রভর—পাদপীঠে খোদিত অর্দ্ধচন্দ্র তাঁরই লাঞ্ছন।

পৃঃ ২১০

প্রথম তীর্থংকর ঋষভনাথ, বাসন্তীমেলা। মূর্তির দুপাশে দুটি পুরুষ মূর্তি। এই মূর্তি দুটির দৃষ্টি আদিনাথের মুখের দিকে নিবদ্ধ। ব্যঞ্জনা : সাধারণ মানুষের তুলনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত কত মহান! কত বিরাট!

পৃঃ ২১০

শিব মন্দির আছে। এখানেও গুটি দুয়েক উল্লেখযোগ্য মূর্তির নিদর্শন থাকায় প্রত্যক্ষদর্শীকৃত একটি বিবরণ তুলে ধরছি—"…এই দালান মন্দিরের অনতি প্রশস্ত গর্ভগৃহের দুটি দেওয়ালে দুটি জৈনমূর্তি গাঁথা আছে। একটি জৈনমূর্তি আদি তীর্থংকর ঋষভনাথের। খোদিত পাথরের খণ্ডটির উচ্চতা আনুমানিক ২½'। মূর্তির বামপার্শ্বে একটি ছোট পুরুষমূর্তি আভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান। মূর্তিটির গায়ে অলঙ্কার, কটিদেশ বস্ত্রাবৃত। ঋষভনাথের ডানদিকে অনুরূপ মূর্তি এককালে অবশ্যই ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা নেই। পরিবর্তে সে স্থানে একটি ছোট জৈনমূর্তি স্থূলহস্তে গ্রথিত। মূলমূর্তির পেছনে চালচিত্র মন্দিরাকৃতি। তবে বর্তমানে চালচিত্রটি ভেঙেচুরে বিকৃত হয়ে গেছে। যেটুকু অবশেষ আজও আছে তা দেখে একথা নিঃসন্দেহে মনে করা যেতে পারে যে, চালচিত্রটি এবং মূর্তির পার্শ্ববর্তী অংশগুলো এক সময় নানান অলঙ্করণে নিপুণভাবে খোদিত ছিল। …দ্বিতীয় জৈনমূর্তিটি—অপেক্ষাকৃত ছোট, মস্তকবিহীন এবং নানাভাবে বিকৃত।" [পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি ছড়রা, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় , ছত্রাক, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ]

ছড়রার পূর্বোল্লিখিত সাতটি দেউলের মধ্যে, ছড়রাতে আছে বা ছিল তিনটি, বাকী চারটির সন্ধান মিলবে ছড়রার উত্তর-পশ্চিমে বাঁধগড় গ্রামে।

প্রবন্ধে প্রকাশিত ছবিগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত

মহাবীর বলেছিলেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রমাদ সম্বন্ধীয়

সময় অতিক্রান্ত হলে
গাছের পাতা যেমন
শুকনো হয়ে ঝরে পড়ে
তেমনি মানুষের জীবন,
তাই মুহূর্তের জন্যও
প্রমাদ কোরো না।

কুশাগ্রস্থিত জলবিন্দু
যেমন ক্ষণস্থায়ী
তেমনি মানুষের জীবন,
তাই মুহূর্তের জন্যও
প্রমাদ কোরো না।

জীবন যখন অনিশ্চিত
ও দেহধারণ অনিয়ত
তখন পূর্বজন্মার্জিত কর্ম
শীঘ্র ক্ষয় করো,
মুহূর্তের জন্যও প্রমাদ কোরো না।

মনুষ্যদেহ লাভ দুষ্কর,
দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেই তা লাভ করা যায়,

কর্মের ফলও আবার প্রগাঢ়,
মুহূর্তের জন্যও তাই
প্রমাদ কোরো না।

যখন তোমার দেহ জীর্ণ হবে,
পলিত হবে চুল,
তখন তোমার সামর্থ্য থাকবে না,
তাই মুহূর্তের জন্যও
প্রমাদ কোরো না।

সমস্ত আসক্তি পরিহার কর,
পদ্মপত্র
শরতের স্বচ্ছ জল হতেও
যেমন অলিপ্ত থাকে
তেমনি অলিপ্ত থাক,
মুহূর্তের জন্যও প্রমাদ কোরো না।

বিসমমার্গে
অবতরণ কোরো না,
তাহলে বিপথগামী
ভার বাহকের মতো
পশ্চাত্তাপ করতে হবে,
মুহূর্তের জন্যও প্রমাদ কোরো না।

তুমি মহাসমুদ্র
অতিক্রম করে এসেছ,
কূলে এসে কেন এই দ্বিধা ?
এইটুকু পার হয়ে এস,
মুহূর্তের জন্যও প্রমাদ কোরো না।

দুর্বলতা সম্বন্ধীয়

সে মূঢ়
যে নিষ্ঠুর ও অহঙ্কারী,
মায়ী ও দুর্বাক্যকথী,
অবিনীত ও সংযমহীন,
জীবন প্রবাহে
কাঠের টুকরোর মতো
সে ভেসে যায়।

সে মূঢ়
যে ইন্দ্রিয় বিষয়ে অন্ধ হয়ে
নিজের হিতের বিষয়ে চিন্তা করে না,
শুধু বিষয় ভোগে ক্রমশঃ ডুবে যায়,
শ্লেষ্মায় আটকে যাওয়া মাছির মতো
সে নিজেকে কেবল অবাদ্ধই করে।

সে মূঢ়
যে ভোগের জন্য ধর্ম পরিত্যাগ করে,
ভোগে আবদ্ধ হয়ে সে
নিজের ভবিষ্যৎ হারায়।

নিজ দুষ্কৃতের জন্য
যে সর্বদা ভীত,
সে তস্করের মতো দুঃখ পায়,
সংযম পালনে সমর্থ হয় না।

এখন না হলেও পরে আত্মজয় করব
একথা যে বলে,

সে যেন মনে করে—জীবন চিরন্তন,
কিন্তু শরীর যখন শিথিল হয়
ও মৃত্যু সমুপস্থিত,
তখন অনুশোচনা ছাড়া
আর কিছু থাকে না।

অন্যে নিদ্রিত থাকলেও
তুমি জাগরূক থাক,
কাউকে বিশ্বাস কোরো না,
সময় কুটিল ও শরীর দুর্বল,
ভারুণ্ড পক্ষীর মতো
অপ্রমত্ত হয়ে বিচরণ কর।

জীবন অনিশ্চিত
ও আয়ু পরিমিত,
মুক্তি পথ অবগত হয়ে
ভোগ সুখ পরিহার কর।

এই শরীর অনিত্য ও অশুচি,
অশুচিতা হতেই এর উদ্ভব,
ক্ষণিক আবাস মাত্র
ও দুঃখময়।

রূপ ও লাবণ্য
যা তোমায় মুগ্ধ করে রেখেছে
তা বিদ্যুৎ প্রকাশের মতোই ক্ষণস্থায়ী,
এর পর কি—
সে কি তুমি দেখবে না?

ব্যাধি ও রোগের আকর,
জরা ও মরণের বশীভূত
এই শরীরে
আমার একটুও আনন্দ নেই

কিছু আগে বা পরে
যে শরীর আমায়
পরিত্যাগ করে যেতে হবে,
তা আমায় আনন্দ দেয় না,
বুদ্বুদ বা ফেনার মতো
তা ক্ষণস্থায়ী।

জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ,
রোগ দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ,
এমন কি
সমস্ত সংসারই দুঃখময়,
এখানে জীবগণ
কেবল দুঃখ ভোগই করে।

কামোপভোগ
ক্ষণিক সুখ দেয়,
কিন্তু দুঃখ,
আরো দুঃখ তার অনুবর্তন করে,
সংসার বিমুক্তির এগুলি বাধা
ও অনর্থের খনি।

কিম্পাক ফল ভক্ষণের
পরিণাম যেমন ভয়াবহ,

কামোপভোগের পরিণামও
তেমনি ভয়াবহ।

কিম্পাক ফল দেখতে সুন্দর,
খেতেও সুস্বাদু,
কিন্তু খেলে মৃত্যু নিশ্চিত,
তেমনি কামোপভোগ।

যে ভোগে লিপ্ত
সে সংসারে জড়িয়ে পড়ে,
যে ভোগে লিপ্ত নয়
সে সংসারে জড়ায় না,
যে ভোগে লিপ্ত
সে সংসার চক্রে আবর্ত্তিত হয়,
যে ভোগে লিপ্ত নয়
সে মুক্তি লাভ করে।

স্ত্রীলোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের
চারুতায়,
সুমধুর বাক্যে বা কটাক্ষে,
মনোভিনিবেশ কোরো না,
কারণ সেগুলি
কাম বর্দ্ধিত করে।

পাপ কর্ম হতে
এই মুহূর্তেই নিবৃত্ত হও,
কারণ জীবন অনিশ্চিত,
যারা কাম মূর্চ্ছিত

ও ভোগে লিপ্ত,
তারা সংযমাভাবে
প্রতারিতই হয়।

কূর্ম যেমন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
আবরণের মধ্যে সংবৃত্ত করে নেয়,
মেধাবীও তেমনি নিজের
ইন্দ্রিয় সমুদায়কে
পাপ কর্ম হতে নিবৃত্ত করে'
আত্মায় সমাহিত করে।

জীবন গেলেও
ধর্ম পরিত্যাগ করব না—
এরূপ যার দৃঢ় সংকল্প,
ঝটিকা যেমন মেরুপর্বতকে
বিচলিত করতে পারে না,
ইন্দ্রিয় গ্রামও তেমনি তাকে
বিচলিত করতে পারে না।

[ক্রমশঃ

বর্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

না, আর্যগণ, তোমরাই ত্রিবিধ ত্রিবিধ ভাবে অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

কেন ? কিভাবে আমরা অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত ?

আর্যগণ, তোমরা হাঁটবার সময় পৃথিবীকায় জীবের ওপর আক্রমণ কর, প্রহার কর, পা দিয়ে ডল, ঘঁস, তাদের পীড়িত কর, তাদের হত্যা কর। এভাবে পৃথিবীকায় জীবের ওপর আক্রমণকারী তোমরা অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত।

আর্যগণ, আমরা চলবার সময় পৃথিবীকায় জীবের ওপর আক্রমণ করি না। শরীর রক্ষার জন্য, অসুস্থ সেবার জন্য অথবা বিহার চর্যার জন্য যখন আমরা মাটির ওপর চলি তখন বিবেকপূর্ণ ভাবে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করি। তাই আমরা পৃথিবীকে আক্রমণ করি না, পৃথিবীকায় জীব বিনাশ করি না। কিন্তু আর্যগণ, তোমরা নিজেরাই পৃথিবীকায় জীব আক্রমণ কর, নিহত কর ও অসংযত, অবিরত ও অপণ্ডিত হও।

আর্যগণ, তোমাদের মত অগম্যমান অগত, ব্যতিক্রম্যমান অব্যতিক্রান্ত, সংপ্রাপ্যমান অসংপ্রাপ্ত ?

আর্যগণ, না, আমাদের মত এরূপ নয়। আমাদের মতে গম্যমান গত, ব্যতিক্রম্যমান ব্যতিক্রান্ত ও সংপ্রাপ্যমান সংপ্রাপ্ত।

অন্যতীর্থকেরা এভাবে নিরুত্তর হয়ে ফিরে গেল।

গুণশীল চৈত্যে অন্তেবাসী কালোদায়ী একদিন বর্দ্ধমানকে প্রশ্ন করলেন, ভগবন্, দুষ্টফলদায়ক অশুভ কর্ম জীব নিজে করে সে কথা কি সত্য ?

বর্দ্ধমান বললেন, হাঁ কালোদায়ী, জীব দুষ্ট ফলদায়ক কর্ম নিজে করে সেকথা সত্য।

ভগবন্, জীব এরকম অশুভ ফলদায়ক কর্ম কিভাবে করে ?

কালোদায়ী, সরস বহুব্যঞ্জনযুক্ত বিষ মিশ্রিত অন্ন যখন কেউ ভোজন করে তখন তা তার ভালো লাগে। তার তৎকালিক স্বাদে লুব্ধ হয়ে সে তা খায় কিন্তু তার পরিণাম অনিষ্টকর। কালোদায়ী, সেইরকম কেউ যখন হিংসা করে, চুরী করে, কাম ক্রোধ লোভ ও মোহের বশবর্ত্তী হয় তখন তা তার ভালো লাগে। কিন্তু তাতে যে পাপকর্মের বন্ধন হয় তা অনিষ্টকর। এবং সেই ফল তাকেই ভোগ করতে হয়।

কালোদায়ী আরো অনেক প্রশ্ন করলেন। বর্দ্ধমান তার যথাযথ উত্তর দিলেন।

বর্দ্ধমান সেই বর্ষাবাস রাজগৃহে ব্যতীত করলেন।

বর্ষা অতিক্রান্ত হলে তিনি মগধভূমিতেই বিচরণ করে নির্গ্রন্থ ধর্ম প্রচার করলেন। আবার বর্ষার আগ দিয়ে রাজগৃহে ফিরে এলেন।

রাজগৃহে তখন বহু অন্য তীর্থকেরা বাস করে। তত্ত্ব নিয়ে তারা আলোচনা করে, নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে। গৌতম সে সমস্ত আলোচনা শোনেন, অনুধাবন করেন। মনে প্রশ্ন জাগলে বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। তার নিরাকরণ করে নেন।

পরমাণু সম্পর্কে আলোচনা শুনে গৌতমের মনে প্রশ্ন জেগেছে। তার নিরাকরণের জন্য তিনি বর্দ্ধমানের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বন্দনা করে বললেন, ভগবন্, অন্য তীর্থিকেরা বলে দুই পরমাণু একত্র হয় না কারণ তাতে স্নিগ্ধতা নেই। তিন পরমাণু একত্র হয় কারণ তিন পরমাণুতে স্নিগ্ধতা আছে। এই একত্রিত তিন পরমাণুকে বিশ্লেষণ করলে তিন ভাগ হতে পারে, দুভাগ হতে পারে। দুভাগ হলে দেড় দেড় পরমাণুর এক এক ভাগ হবে। এভাবে চার পাঁচ পরমাণু একত্র মিলিত হতে পারে। ভগবন্ তাদের একথা কি সত্য ?

বর্দ্ধমান বললেন, গৌতম, পরমাণু সম্পর্কে অন্যতীর্থিকদের এই মান্যতা আমার ঠিক মনে হয় না। এই বিষয়ে আমার মত এই যে দুই পরমাণুও

একত্র হতে পারে কারণ তাদের মধ্যেও পরস্পরকে যুক্ত করার স্নিগ্ধতা আছে। মিলিত দুই পরমাণুকে ভাঙলে আবার তা এক এক পরমাণু হবে। এভাবে তিন পরমাণুও মিলিত হতে পারে। তবে মিলিত তিন পরমাণুকে দুভাগে ভাঙলে অন্যতীর্থিকেরা যেমন বলেন দেড় দেড় পরমাণুর দুই ভাগ হবে, তা হয় না। দুই ভাগের এক ভাগে এক পরমাণু থাকবে, অন্যভাগে দুই পরমাণু।

এভাবে গৌতম বর্দ্ধমানকে অনেক প্রশ্ন করলেন। বর্দ্ধমান তার প্রত্যেকটীর নিরসন করলেন।

পরের বছরের বর্ষাবাস নালন্দায় ব্যতীত হল।

নালন্দা হতে বর্দ্ধমান মিথিলার দিকে গমন করলেন। সেই বছরের বর্ষাবাস মিথিলায় ব্যতীত হল।

মিথিলা হতে তিনি রাজগৃহে আবার ফিরে এলেন।

রাজগৃহে তখন বর্দ্ধমানের গৃহস্থ শিষ্য মহাশতক অনশন নিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। আনন্দের মত তাঁরও অবধিজ্ঞান হয়েছে। তিনিও বহুদূর অবধি দেখতে ও জানতে পান।

মহাশতক যখন একদিন রাত্রে ধর্মধ্যানে রাত্রি জাগরণ করছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী রেবতী মদিরা পান করে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন ও তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করলেন। মহাশতক প্রথমে নিরুত্তর রইলেন কিন্তু যখন রেবতী নানাভাবে তাঁকে প্রলুব্ধ করা হতে বিরত হলেন না তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, রেবতী, এত উন্মত্ত হয়ো না। আমি দেখতে পাচ্ছি সাত দিনের মধ্যে তোমার দুরারোগ্য রোগে মৃত্যু হবে ও তুমি নরকে যাবে।

রেবতী সে কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন ও প্রতিনিবৃত্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ভাবলেন মহাশতক তাঁকে না জানি কিভাবে এখন হত্যা করবেন!

মহাশতকের কথামত রেবতী সাত দিনের মধ্যেই দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

বর্দ্ধমান মহাশতকের ক্রোধের কথা, রেবতীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগের কথা জানতে পেরেছেন। তিনি তাই গৌতমকে ডেকে বললেন, গৌতম, আমার অন্তেবাসী মহাশতক যেখানে অবস্থান করছে সেখানে যাও ও গিয়ে

তাকে বল যে রেবতী তাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করলেও তার ক্রুদ্ধ হওয়া, রেবতীকে কটু বাক্য বলা উচিত হয়নি। সমভাবে অবস্থানকারী শ্রমণো-পাসককে এসব উপেক্ষা করতে হয়। যথার্থ সত্য হলেও অপ্রিয় কঠোর শব্দ বলতে হয় না। দেবানুপ্রিয় রেবতীকে কটুবাক্য বলে তুমি ভাল করনি। তুমি তার আলোচনা করো, শুদ্ধ হও।

গৌতম মহাশতককে গিয়ে সেকথা বললেন। মহাশতক নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ও আলোচনা করে পরিশুদ্ধ হলেন।

সেই বছরের বর্ষাবাস বর্দ্ধমান রাজগৃহেই ব্যতীত করলেন।

বর্ষাবাস অতীত হলেও বর্দ্ধমান সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন।

সেই সময় একদিন গৌতম বর্দ্ধমানের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন্, এই অবসর্পিণীর ষষ্ঠ দুষম-দুষম কালে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ হবে জানতে ইচ্ছে করি।

বর্দ্ধমান বললেন, গৌতম, সেই সময় চারদিক হাহাকার, আর্তনাদ ও কোলাহলময় হবে। বিষম অবস্থার জন্য কঠোর, ভয়ঙ্কর ও অসহ্য বাতাসের ঘূর্ণী ও আঁধি প্রবাহিত হবে, দিক সকল ধূমিল, ধূলোময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। কালের রুক্ষতার জন্য ঋতু বিকৃত হবে, চাঁদ অধিক শীতল হবে, সূর্য অধিক উষ্ণ।

সেই সময় জোরে জোরে বিদ্যুৎ চমকিত হবে, প্রবল বাতাসের সঙ্গে মুষল ধারে বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির জল অরস, বিরস, টক, তিতো, বিষাক্ত ও ঝাঁঝালো হবার জন্য জীব জগৎ পোষণ না করে নানারূপ ব্যাধি ও বেদনার উদ্ভব করবে। সেই জলে মানুষ পশুপক্ষী গাছপালা বিনষ্ট হবে, বৈতাঢ্য পর্বত ব্যতীত অন্য পর্বত অহরহ বজ্রপাতে ছিন্ন ভিন্ন হবে, গঙ্গা ও সিন্ধুর অতিরিক্ত অন্য নদী, সরোবর, তড়াগাদি পরিশুষ্ক, শূন্য, সমতল হবে?

ভগবন্, সেই সময় ভারতবর্ষের মাটির অবস্থা কিরূপ হবে?

গৌতম, সেই সময় মাটি অঙ্গার তুল্য হবে। আগুনের মতো গরম, মরুভূমির মতো বালুকাময়, শৈবালচ্ছন্ন ঝিলের মতো কংকরময়।

ভগবন্, সেই সময়ে মানুষের অবস্থা কিরূপ হবে?

গৌতম, সেই সময় মানুষের অবস্থা অত্যন্ত দয়নীয় হবে, বিরূপ, বিবর্ণ,

দুঃস্পর্শ, বিরস শরীর মানুষ নির্লজ্জ, কপট, ক্লেশপ্রিয়, হিংসক ও বৈরশীল হবে। তার নখ বড় হবে, চুল পিঙ্গল, বর্ণ শ্যাম, মাথা বিকৃত ও শরীর শিরাময়।

সে নির্বল হবে, বামনাকার হবে, ব্যাধি পীড়িত হবে, চর্মরোগ গ্রস্ত হবে ও তার সমস্ত চেষ্টা নিন্দনীয় হবে।

সে উৎসাহহীন হবে, সত্বহীন হবে, তেজোহীন হবে। ষোল বছর হতে না হতে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু লাভ করবে।

মানুষের সংখ্যা পরিমিত হবে। গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর নিকটস্থ বৈতাঢ্য পর্বতের কন্দরে তারা বাস করবে।

ভগবন্, সেই সময় মানুষ কি আহার করবে ?

গৌতম, সেই সময় গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর প্রবাহ রথমার্গের মতো সঙ্কীর্ণ হবে। গভীরতা চক্রনাভির মতো। সেই জল মৎস ও কচ্ছপাদিতে পূর্ণ থাকবে। মানুষ সকাল ও সন্ধ্যায় কন্দর হতে নির্গত হয়ে সেই কচ্ছপাদি ধরে ডাঙ্গায় নিয়ে যাবে ও রোদে পোড়া তাদের মাংস আহার করবে।

বর্দ্ধমান সেখান হতে বিহার করে অপাপা পুরীতে এলেন। সেই তাঁর জীবনের অন্তিম বর্ষাবাস।

[ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

তার নিজের মনোভাবকেই যেন দুর্মতি ব্যক্ত করছে তার কল্পিত সাফল্যের উদ্ঘোষ যেন দূর হতে শোনা যাচ্ছে, আনন্দকুমারের সেইরকম মনে হল। সে তাই খানিকক্ষণ দুর্মতির দিকে চেয়ে রইল। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে বলল, চার পাঁচ দিন অপেক্ষা করায় আমাদের কি ক্ষতি? পিতার কাছ হতে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া কি ভালো দেখায়?

কুমার, আপনি এখনো অনুভবহীন। ধরেই নিচ্ছি চার পাঁচ দিন পর আপনার অভিষেক হয়ে যাবে। আপনি পিতার উত্তরাধিকারীও হবেন। কিন্তু তারপর? যতদিন এই বুড়ো বেঁচে থাকবে তা সে সাধুই হোক কি মুনি আপনি স্বতন্ত্র হয়ে কি রাজ্য পরিচালনা করতে পারবেন? আপনার পিতা কি আপনাকে চালিত করবার চেষ্টা করবেন না?

অভিষেকের পরেও, পিতার জীবিতাবস্থায় যে সে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে না আনন্দকুমারেরও এখন তা মনে হতে লাগল। এই জন্যইত অনেক রাজকুমার পিতাকে হত্যা করে রাজবৈভব হস্তগত করেছে। দুর্মতির কথাত ফেলে দেবার মতো নয়।

দুর্মতি দেখল যে কুমারের মনে তার কথার প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে। আর এখানে বেশী সময় ব্যতীত করা উচিত নয়। পাছে তার ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায়, তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাদের ত রাজপিতার রক্তে হস্ত রঞ্জিত করবার দরকার নেই। যাতে তিনি বাধা না হন সেজন্য এক জায়গায় বন্দী করে রেখে দিলেই চলবে। অমাত্য বা সামন্তরা কেউ বিদ্রোহ

করবে সে ভয়ও আপনার রাখা উচিত নয়। তাছাড়া সাহায্য করবার জন্ত আমি ত আপনার কাছেই রয়েছি।

কিন্তু পিতাকে বন্দীই বা করা যায় কি করে ?

সে তো খুব সহজ। তাঁর সামনে না গিয়ে তাঁকে এখানে আমন্ত্রিত করে।

তিনি যদি না আসেন। যদি বুঝতে পারেন এ কপট আমন্ত্রণ !

দুর্মতি কপট হাসি হেসে বলল, এসব কাজ ত ছেলেখেলা নয় ? আপনি ও আমি ছাড়া আর কে জানবে ? যদি আমন্ত্রণ জানাতে ভয় হয় আপনাকে আমি অন্ত পথ বলছি। আপনার অভিষেকের পূর্বে তিনি অবশ্যই আপনাকে তাঁর কাছে ডাকবেন। আমি বলি কি তখন আপনি ওঁর কাছে যাবেন না। তখন তিনি নিজেই আপনার কাছে আসবেন। আর সেই সময়ই কাজ হাসিল করতে হবে।

আনন্দের সেকথা মনঃপূত হল। প্রথমতঃ অধিকার তাকে সম্পূর্ণ লাভ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতের কাঁটাও যাতে অবশেষ না থাকে তাও তাকে দেখতে হবে। সিংহ মহারাজকে বন্দী না করা পর্যন্ত তা হওয়া সম্ভব নয়।

যে সিংহ মহারাজ শত্রুকেও ক্ষমা করতে পারেন, অভয় দানের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় দিতে পারেন, যিনি অজাতশত্রুর মতো, সংসারের জালজঞ্জাল হতে যাঁর বৃত্তি নিবৃত্ত হয়েছে, অন্তর্মুখ হয়েছে তাঁকে প্রতারিত করা, প্রতারিত করে কারাগারে বন্দী করা এবং সেও শত্রুর হাতে নয়, নিজের পুত্রের হাতে তা কিছু শক্ত ছিল না। কিন্তু প্রতারণা করা এক নিকৃষ্টতম কাপুরুষতা।

আনন্দকুমার তার পিতার বিরুদ্ধে সেই নিকৃষ্ট প্রতারণার আশ্রয়ই গ্রহণ করল। সিংহ মহারাজ যেই তাকে ডাকবার জন্ত তার আবাসে এলেন ওমনি আনন্দ কুমারের অনুচরেরা তাঁকে ধরে কারাগারে বন্দী করে রাখল। নিজের পুত্রের হাতে এই জঘন্ত কাজ হতে দেখেও সিংহ মহারাজ তাঁর চিত্তবৃত্তিকে শান্ত রাখলেন। জীবনে বা বিষয়ে তাঁর আর কোনো মমত্ব ছিল না।

আনন্দ কুমার যারা পিতার পক্ষাবলম্বন করতে পারে সন্দেহ করল, তাদের সকলকেই কারাগারে বন্দী করে রাখল।

কুসুমাবলী যখন পুত্রের এই কুকৃত্যের কথা শুনলেন তখন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে এলে স্বপ্নদর্শন ও দোহদের কথা তাঁর মনে এল। এই পুত্রকে ত তিনি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন এবং একমাত্র মহারাজের আগ্রহেই তাকে পালন পোষণ করেছিলেন। সেই পুত্রের হাতে এই অপকৃত্য হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিতা হলেন। মহারাজের স্থিতপ্রজ্ঞরূপ বাণী তাঁর মনে এল। নিজের পুত্রও যদি পিতাকে হত্যা করে তবে পুত্রের তত দোষ নয়, যত কি পূর্ব পূর্ব কর্মের। এবং সেকথা মনে করে ধৈর্যাবলম্বন করাতেই সত্যিকার কল্যাণ।

কুসুমাবলী পুত্রের কাছে গিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন কিন্তু তাঁর সমস্ত অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হল।

সিংহ মহারাজ কারাগারে গিয়েও শান্ত রইলেন, কোনোরকম মানসিক বিকার আসতে দিলেন না। এই সংসারইত এক কারাগার। এই ভাবনাই দুর্ধ্যান হতে তাঁকে বিরত রাখল। এবং শেষে যাতে শান্তিময় ভাবে জীবনের শেষ করতে পারেন তার জন্য অনশন ব্রত গ্রহণ করলেন।

আনন্দকুমারের এই অনশন ব্রত সহ্য হল না। ভাবল আমাকে জগতে আরো বেশী লাঞ্ছিত করবার জন্যই যেন তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করেছেন। এরকম লোককে জীবিত রাখাই বিপজ্জনক। তাই সঙ্কল্প করে সে একদিন নিজেই গিয়ে সিংহ মহারাজকে হত্যা করে এল।

প্রাণান্তকর কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সিংহ মহারাজ তখনো ধৈর্য ও ক্ষমাকে পরিত্যাগ করলেন না। আর আনন্দ? তারই বা কী করার ছিল? নিজ কৃত পূর্ব কর্মেরই ফল মানুষ ভোগ করে, অন্যের অপরাধ বা গুণ নিমিত্ত মাত্র।

যে অগ্নিশর্মাকে অজ্ঞানতঃই গুণসেন নির্যাতিত করেছিল, তিন তিনবার মাসান্তের উপবাসের পর আমন্ত্রিত করেও ভিক্ষা দেয়নি এবং যে মরবার সময় বৈরবৃত্তিকে আরো শাণিত করেছিল সেই অগ্নিশর্মা কেবল দেহ বদল করে আনন্দ নামক পুত্ররূপে গুণসেন-রূপী সিংহ মহারাজের ঔরসে উৎপন্ন হয়েছিল। আনন্দ কুমার কর্মের ফলদাতৃ শক্তির কাছে বিবশ ছিল।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

WB/NC-120

Vol. III. No. 9 Sraman : January 1976

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১.	সাতটী জৈন তীর্থ	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৩.০০
২.	অতিমুক্ত	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৪.০০
৩.	শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা	—শ্রীগণেশ লালওয়ানী	৩.০০
৪.	ভগবান মহাবীর ও জৈন ধর্ম	—শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা	২.৫০

हिन्दी

१	अतिमुक्त – श्री गणेश ललवानी अनु: श्री राजकुमारी बेंगानी	४.००
२	श्री जिन गुरु गुण सचित्र पुष्पमाला – श्री कान्तिसागरजी महाराज	५.००
३	श्रीमद् देवचन्दकृत अध्यात्मगीता – श्री केशरीचन्द धूपिया	.७५
४	भगवान महावीर (एलबम्)	१०.००

English

1. Bhagavati Sutra
   (Text with English Translation)
   —Sri K. C. Lalwani
   - Vol. I (Satak 1-2) — 40.00
   - Vol. II (Satak 3-6) — 40.00
2. Essence of Jainism —Sri P. C. Samsukha, tr. by Sri Ganesh Lalwani — .75
3. Thus Sayeth Our Lord —Sri Ganesh Lalwani — 1.50

ভ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৮২ ॥ দশম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

সরস্বতী, কাঁকালীটিলা, মথুরা

জৈন দেবী সরস্বতী

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মথুরায় জৈনদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মথুরায় শ্বেতাম্বর জৈনদিগের একটি স্তূপের মধ্যে কয়েকটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরগুলির মধ্যে প্রথম বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের নিকটে ১৮৮৯ সালে বাক্ ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্ত্তিটির আকার ১'১০"×১'৩½"। মূর্ত্তিটির মস্তক ভাঙিয়া গিয়াছে। দেবী জানু উঁচু করিয়া একটি চতুষ্কোণ পাদপীঠের উপর বসিয়া আছেন। দেবীর বাম হস্তে একখানি পুঁথি। দক্ষিণ হস্তটির উপরি ভাগ ভাঙিয়া গিয়াছে। তবে যতটুকু আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় হাতটি ঊর্দ্ধে উত্তোলিত ছিল। দেবী পট্ট বস্ত্র পরিহিতা। সরস্বতীর দুই দিকে দুই জন উপাসকের ছোট ছোট মূর্ত্তি। বাম দিকের মূর্ত্তিটির হাতে কলসী, তাহার পরিধানে ঢিলা পরিচ্ছদ—কটি দেশে পেটী দিয়া আঁটা; দক্ষিণ দিকে উপাসক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান।

এ সরস্বতী মূর্ত্তিটি লৌহ নির্মিত। (?) এই মূর্ত্তির নিম্ন ভাগে সাতটি ছত্রে লিপি আছে। শেষ ছত্রটি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। লিপিটি ৮৪ শকাব্দে (১৬২ খ্রীষ্টাব্দে) ক্ষোদিত। মূর্ত্তির নিম্নে লিপির পাঠ এইরূপ:

১। [সিদ্] ধম্ সক ৮৪ হিমংত মাসে চতুর্থে ৪ দিবসে ১১ অ—

২। স্য পুর্ব্বায়াং কোটিয়াত্তো [গ]ণাত্তো স্থানি[য়]াত্তো কুলাত্তো।

৩। বৈরত্তো শাখাত্তো শ্রীগুহ [া]ত্তো সংভোগাত্তো বাচকস্যার্য।

৪। [হ] স্তহস্তিস্য শিষ্যো গণিস্য আর্য্য মাঘহস্তিস্য শ্রদ্ধচরো বাচকস্য অ—

৫। র্য্য দেবস্য নির্ব্বর্ত্তনে গোবস্য সীহপুত্রস্য লোহিক কারুকস্য দান।

৬। সর্ব্বসত্ত্বানাং হিত সুখা এক সরস্বতী প্রতিষ্ঠাবিত্তা অবতলে রঙ্গানর্ত্তনো।

৭। মে [॥]

অনুবাদ—৮৪ অব্দের হেমন্ত মাসের ৪ চতুর্থে, একাদশ (চান্দ্র) দিবসে সীহপুত্র লৌহিককার 'গোব' নামক ব্যক্তির দানে, কোট্টিয়গণ, স্থানিয়কুল, বৈরশাখা ও শ্রীগুহ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন বাচক আর্য্য হস্তহস্তির শিষ্য গণি আর্য্য মাঘহস্তির শ্রদ্ধচর বাচক আর্য্যদেবের দৃষ্টান্তে—সর্ব্বসত্তাদিগের হিতের জন্য রঙ্গানর্ত্তনের অবতলে এক সরস্বতী (প্রতিমা) প্রতিষ্ঠাপিত হইল।

এই সরস্বতী মূর্ত্তির নিম্নস্থ লিপিতে "কোট্টিয়গণ", "স্থানীয়কুল", "বৈরশাখা" ও "শ্রীগুহ সম্ভোগে"র উল্লেখ দেখা যাইতেছে। এগুলি সমস্তই সেই সময়ের জৈন ব্যাপার। এই লিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে অন্ততঃ শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মধ্যে সরস্বতী অর্চ্চনা তৎকাল প্রচলিত জৈনধর্ম-প্রণালীর অনুমোদিত ছিল।[১] তাহা না হইলে মূর্ত্তি সম্বলিত এই লিপির অস্তিত্বের কোন অর্থ হয় না।

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অতি প্রাচীনকালে হিন্দু ও জৈন বলিয়া কোন পৃথক সম্প্রদায় ছিল না। ধর্মের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মত ভেদ হওয়ায়, বিশেষতঃ হিংসার অনুষ্ঠান বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায়, একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। [এই বিষয়ে জৈনরা ভিন্ন মত পোষণ করেন—সম্পাদক] ইঁহারা তীর্থঙ্করগণকে মহাপুরুষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং জৈন নামে অভিহিত হ'ন। ইঁহারা বলেন, ভগবানের মুখ নির্গতা বাণীই শ্রুত। ইঁহাদের মতে শ্রুত ও সরস্বতী অভিন্ন। সরস্বতীকে ইঁহারা "শ্রুতদেবী" বলিয়া থাকেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত জৈন-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—তীর্থঙ্করগণ শ্রুতদেবীকে নমস্কার করিতেন।[২] [জৈনরা ভগবান মানেন না। তীর্থংকর মুখ নিঃসৃত বাণীই শ্রুত। সুতরাং তীর্থংকরের শ্রুতদেবীকে নমস্কারের প্রশ্ন ওঠে না। গ্রন্থকারগণ বা আচার্য্যগণ শ্রুতদেবীকে নমস্কার করিয়া থাকেন। —সম্পাদক] জ্ঞাতা-ধর্ম-কথা সূত্রে (১ শ্রুঃ ৪ বর্গ ১ অঃ) বর্দ্ধমানাদির সহিত সরস্বতীর নমস্কার আছে :

১ *Guerinot—Jaina Bibliographie.*

২ কোটীশতং দ্বাদশ চৈব কোটী লক্ষাণ্যশীতিস্ত্র্যধিকানি চৈব।
পঞ্চাশদষ্টৌ চ সহস্রসংখ্যামেতচ্ছ্রুতং পঞ্চ পদং নমামি ॥ ইত্যাদি

"নমঃ শ্রীবর্দ্ধমানায় শ্রীপার্শ্ব প্রভবে নমঃ।
নমঃ শ্রীমৎসরস্বত্যৈ সহায়েভ্যো নমো নমঃ॥"

অখিল বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেবীর নাম তাঁহারা শ্রুতদেবী দিয়াছেন। শ্রুত সম্বন্ধে দিগম্বর জৈনদিগের গ্রন্থে একটি উপদেশ আছে। তাঁহাদের শাস্ত্র বলেন, শেষ তীর্থঙ্কর শ্রীবর্দ্ধমান মহাবীর স্বামী মোক্ষ মার্গের উপদেশ দান করেন। শ্রাবণ মাসের প্রতিপদ তিথিতে সূর্য্যোদয়ের সময়ে রৌদ্র মুহূর্ত্তে যখন চন্দ্র অভিজিৎ নক্ষত্রে ছিল, সেই সময়ে তিনি উপদেশ প্রদান করিয়া সংসার দুঃখ কাতর জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। ইন্দ্রভূতি গৌতম গণধর ঐদিন সন্ধ্যাকালে ভগবান্ মহাবীরের এই বাণীকে একাদশ "অঙ্গ" ও চতুর্দ্দশ "পূর্ব্ব" রূপে বিভক্ত করেন। অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে এই ১১ অঙ্গ ও ১৪ পূর্ব্বের অন্তর্গত করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মী সুধর্ম্মা স্বামীকে উপদেশ দেন। তিনি আবার জম্বু স্বামীকে উপদেশ করেন। জম্বু স্বামী অনেক মুনি ঋষিকে এই দ্বাদশাঙ্গ শ্রুত উপদেশ করেন। এই রূপে এই শ্রুতের প্রচার হয়। জৈনদিগের মতে ইহা ২৪৫৫ বর্ষ পূর্ব্বের কথা।

শ্রবণ বেলগোলায় একটি অষ্টধাতুর "শ্রুতস্কন্ধ-যন্ত্র" বা "সরস্বতী-যন্ত্র" আছে। এই যন্ত্র এই দ্বাদশাঙ্গ বাণীর। ইহাতে ১১ অঙ্গ, ১৪ পূর্ব্ব, ৫ প্রকীর্ণক ও ১৪ অঙ্গবাহ্য বাণীর বর্ণনা আছে। ইহাদের শ্লোক সংখ্যাও অঙ্কিত আছে। সকলের নীচে প্রথম প্রকোষ্ঠে ভেদ মতি জ্ঞানের ৩৬৬ শ্লোক, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে জ্ঞান বিকল্প ২০ গ্রন্থ, অঙ্গ ১২, অঙ্গবাহ্য ১৪। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রুতজ্ঞানের অক্ষর সংখ্যা ১৮৩৪৬৭৪৪০৭৩৭০৯৫৫১৬১৫। ইহার পর চতুর্থ প্রকোষ্ঠে একপদ-বর্ণ সংখ্যা ১৬৩৪৮৩০৭৮৮। পঞ্চম প্রকোষ্ঠে দ্বাদশাঙ্গ নামপদ সংখ্যা ১১২৮৩৫৮০০৫, ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে একাদশাঙ্গ পদ সংখ্যা ৪১৫০২০০০। ইহার পর শ্লোক সংখ্যার সহিত ১১ অঙ্গ আছে। দক্ষিণ দিকের প্রকোষ্ঠে শ্লোক সংখ্যার সহিত ৫ প্রকীর্ণক এবং বাম দিকের প্রকোষ্ঠে শ্লোক সংখ্যার সহিত ৫ চুলিকা আছে। যেখান হইতে শ্রুত স্কন্ধ বা সরস্বতীর শাখা বাহির হইয়াছে, সেখানে শ্লোক সংখ্যার সহিত ১৪ পূর্ব্ব আছে। সকলের উপর ধ্বজদণ্ডের আকারে অঙ্গবাহ্য ১৪ এবং ইহার ধ্বজায় অক্ষর সংখ্যা আছে। এই ১১ অঙ্গ ও ১৪ পূর্ব্ব শ্রুতের পঠন-পাঠন শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহুর সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ইহার পর অঙ্গজ্ঞানের অবনতি হইতে থাকে। ক্রমশঃ পতনোন্মুখ অঙ্গজ্ঞানের কিছু কিছু বীর-নির্ব্বাণ সংবৎ ৬৮৩ পর্য্যন্ত ছিল। কিছুকাল পরে অর্হৎবলী মুনি আসেন। ইনি মুনিগণের মধ্যে সঙ্ঘ স্থাপন করেন। ইঁহারই সময়ে দিগম্বর আম্নায়সারী মুনিদিগের চারি বিভাগ হয়।

অর্হৎবলী স্বামীর কিছুকাল পরে ধরসেনাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অগ্রহায়ণী পূর্ব্বের অন্তর্গত পঞ্চম বস্তুর মধ্যে চতুর্থ যে মহাকর্ম প্রাভৃত তদ্জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। অর্থাৎ উপরি উক্ত শ্রুত জ্ঞানের এক অংশের জ্ঞাতা ছিলেন। ইনি শ্রুত জ্ঞান রক্ষার জন্য পুষ্পদন্ত ও ভূতবলী মুনিকে ইহা উপদেশ করেন।

ভূতবলী স্বামী দেখিলেন যে প্রতিদিন বিদ্যার অবনতি হইতেছে; যাহা কিছু মৌখিক জ্ঞান আছে তাহাও নষ্ট হইয়া যাওয়া সম্ভব। এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং মনুষ্যের স্মৃতিশক্তির দিন দিন হ্রাস হইতেছে দেখিয়া তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থের নাম 'ষটখণ্ডাগম'। ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া জ্যৈষ্ঠ শুক্লা পঞ্চমীর দিন চারি সঙ্ঘ একত্র করিয়া বেষ্টনাদি উপকরণ দ্বারা মহাসমারোহে 'ষটখণ্ডাগমে'র পূজা করেন। আজ পর্য্যন্ত জৈন সমাজে ঐ তিথি 'জ্ঞান পঞ্চমী' নামে প্রসিদ্ধ। ঐদিন জৈন ধর্মাবলম্বী বিজ্ঞগণ বিধিপূর্বক নিজ নিজ শাস্ত্রের পূজা করিয়া থাকেন। [ইহা দিগম্বর মত। শ্বেতাম্বরগণ অঙ্গ সাহিত্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বলেন না। বস্তুতঃ সেই প্রাচীন অঙ্গ সাহিত্য শ্বেতাম্বরদিগের নিকটেই বর্তমান দিগম্বরেরা যাহা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বলেন। শ্বেতাম্বর জৈনরা কার্তিক শুক্লা পঞ্চমীতে জ্ঞান পঞ্চমী পালন করেন। —সম্পাদক]

ভূতবলীর পর বহু জৈনাচার্য্য প্রয়োজন মত নানা বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করেন। অতঃপর নবাঙ্কুরিত বৌদ্ধধর্ম তরুণাবস্থা লাভ করিলে, বহু রাজা মহারাজা ইহার অভিনবচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন। তবে এসময়েও কয়েকজন প্রভাবশালী জৈনাচার্য্য বড়বড় রাজসভায় গিয়া নির্ভীকভাবে অন্য মতের খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপনও না করিয়াছিলেন, তাহা নয়। তারপর বৌদ্ধাচার্য্যগণ অনেক জৈনশাস্ত্র নষ্ট করিয়া জলে ফেলিয়া দেন, এমন

কি মন্দির ও মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই সময়ে অকলঙ্কাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়া জৈন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। রাষ্ট্রকূট বংশীয় জৈনরাজ অমোঘবর্ষ ৮৬৪-৯২২ খ্রীষ্টাব্দে (৭৩৬-৭৯৯ শকাব্দ) বর্তমান ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে ইঁহার প্রধান গুরু জিনসেন আচার্য্য পুরাণ, ১৬ সংস্কার প্রভৃতি জৈনদিগের মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেবদেবীর বহু ব্যাপারও ইঁহারই দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ইনি প্রথমে শ্রী, হ্রী, ধৃতি, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে নূতন করিয়া দেবী বলিয়া দেখাইলেন। জৈনগণ বলেন, যখন তীর্থংকর মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হন, তখন ইঁহারা মাতার সেবা করেন এবং মাতার মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, ইঁহারা সেই সকলের উত্তর দিয়া থাকেন। জৈনগণ ইহাদিগকে 'ষট্‌কুমারিকা' বা 'সপ্তকুমারিকা' বলিয়া থাকেন।

সরস্বতী সম্পর্কে জৈনদিগের একটী পৌরাণিক কাহিনী আছে। কাহিনীটী এই—জম্বুদ্বীপের প্রান্তভাগের সহিত অন্যান্য দ্বীপের বিভেদ করিবার জন্য হিমবান পর্ব্বতের সৃষ্টি। [অন্যান্য দ্বীপের সঙ্গে বিভেদ করিবার জন্য নয়, হিমবান পর্বত জম্বুদ্বীপে হৈমবৎবর্ষ হইতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে মাত্র। জৈনমতে জম্বুদ্বীপে ছয়টি বর্ষধর পর্বত আছে এবং প্রত্যেক পর্বতে এক একটি করিয়া ছয়টী হ্রদ আছে যেখান হইতে নদী নির্গত হয়। —সম্পাদক] সেই পর্ব্বতে সাতটী হ্রদ আছে, সেগুলি খুব বড়। হ্রদগুলি হইতে অনবরত জল বাহির হয়। সেই জল নীচে আসিয়া পড়িয়া নদীতে পরিণত হয়। এই সকল হ্রদে এক একটী কমল আছে। ঐ সকল কমলের উপর এক একটী মহল আছে। প্রত্যেক মহলে একটী দেবী থাকেন। ইঁহারাই শাসনদেবী। এই শাসনদেবীদের পূজারও ব্যবস্থা হইল। ক্রমশঃ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় জৈনসম্প্রদায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণ্যদেবতাকে নিজেদের ধর্ম্মে স্থান দিলেন। প্রাচীনকাল হইতে জৈনগণ সরস্বতীকে গীর্বাণী বাগদেবতারূপে আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। সরস্বতী তাঁহাদের মধ্যে একটী প্রধান দেবী। এক্ষণে ২৪ জন তীর্থংকরের শাসনদেবীগণেরও পূজা হইতে লাগিল। শাসনদেবীগণ তীর্থংকরদিগের শাসন বহন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যাদেবীরূপে ষোলজন শাসনদেবীর পূজারও ব্যবস্থা হইল। সরস্বতী বিদ্যার প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিদ্যাসম্পর্কিত নানা ব্যাপার ইঁহাদেরই সাহায্যে ইনি সম্পাদন

করিয়া থাকেন। হেমচন্দ্রাচার্য্য তাঁহার 'অভিধান-চিন্তামণি'তে (দ্বিতীয় পর্য্যায় ৯৩) এই ষোড়শ বিদ্যাদেবীর নাম দিয়াছেন :

রোহিণী প্রজ্ঞপ্তী বজ্রশৃঙ্খলা কুলিশাঙ্কুশা।
চক্রেশ্বরী নরদত্তা কাল্যথাসৌ মহাপরা ॥
গৌরী গান্ধারী সার্ব্বাস্ত্রমহাজ্বালা চ মানবী।
বৈরোট্যাচ্ছুপ্তা মানসী মহামানসিকেতি তাঃ ॥

সুতরাং শ্বেতাম্বরগণের মতে ষোড়শ বিদ্যাদেবী বলিলে আমরা বুঝিব—১ রোহিণী, ২ প্রজ্ঞপ্তী, ৩ বজ্রশৃঙ্খলা, ৪ কুলিশাঙ্কুশা, ৫ চক্রেশ্বরী, ৬ নরদত্তা, ৭ কালী, ৮ মহাকালী, ৯ গৌরী, ১০ গান্ধারী, ১১ জ্বালা, ১২ মানবী, ১৩ বৈরোট্যা, ১৪ অচ্ছুপ্তা, ১৫ মানসী ও ১৬ মহামানসী।

শ্বেতাম্বর মতে তীর্থঙ্করগণের ২৪ জন শাসন-দেবীর নাম, যথা :

চক্রেশ্বরী, অজিতা, দুরিতারী, কালী, মহাকালী, অচ্যুপ্তা, শান্তা, জ্বালা, সুতারকা, অশোকা, শ্রীবৎসা, প্রবরা, বিজয়া, অঙ্কুশা, পন্নগা, গৌরী, নির্ব্বাণা, অচ্যুতা, ধারণী, বৈরোট্যা, গান্ধারী, অম্বা, পদ্মাবতী, সিদ্ধা।[৩]

দিগম্বর মতে তীর্থঙ্করগণের ২৪ জন শাসনদেবীর নাম, যথা :

চক্রেশ্বরী, রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তী, বজ্রশৃঙ্খলা, পুরুষদত্তা, মনোবেগা, কালী, মহাকালী, জ্বালামালিনী, মানবী, গৌরী, গান্ধারী, বৈরোট্যা বা বৈরোটী, অনন্তমতী, মানসী, মহামানসী, বিজয়া বা জয়া, অজিতা, অপরাজিতা, বহুরূপিনী, চামুণ্ডী, কুষ্মাণ্ডিনী, পদ্মাবতী, সিদ্ধায়িনী বা সিদ্ধায়িকা। এই শাসনদেবীকে ইঁহারা 'যক্ষিণী' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

[ক্রমশঃ

---

৩ তীর্থঙ্কর...দেব্যঃ। দেবীও চক্কেসরি অজিআ দুরিতারি কালী মহাকালী।
অচ্চুয় সন্তা জালা সুতারাহসোয় সিরিবচ্ছা ॥ ৩৮৮
পবর বিজয়ংকুসা পন্নগত্তি নির্ব্বাণ অচ্চুয়া ধরণী।
বইরুট্টংচ্ছুত গন্ধারি অম্ব উপমবই সিদ্ধা ॥ ৩৮৯

বৰ্দ্ধমান-মহাবীর

[জীবন-চরিত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই সেই পাবা যে পাবায় তাঁর তীর্থংকর জীবনের প্রারম্ভ। পাবার মহাসেন উদ্যানেই না তিনি তাঁর গণধরদের প্রথম দীক্ষিত করেছিলেন। এই পাবা হতে তিনি যে ধর্মতীর্থের প্রবর্তন করেছিলেন তা আজ সমতট হতে সিন্ধু সৌবীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাবার মহাসেন উদ্যানেই তাই আবার তাঁর অন্তিম বছরের প্রথম সমবসরণ হল। এই সমবসরণে আরো অনেকের সঙ্গে পাবার রাজা পুণ্যপালও উপস্থিত ছিলেন।

পুণ্যপাল সেদিন রাত্রে স্বপ্নে হস্তী, মর্কট, ক্ষীরবৃক্ষ, কাকপক্ষী, সিংহ, কমল, বীজ ও কলস দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন দেখা অবধি অমঙ্গল আশঙ্কায় পুণ্যপালের মন অস্থির ছিল। তাই বর্দ্ধমানের প্রবচন শেষ হতেই তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা বর্দ্ধমানের কাছে নিবেদন করলেন। বললেন, ভগবন, আমি এই স্বপ্ন দর্শনের ফল জানতে ইচ্ছা করি।

বর্দ্ধমান সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বললেন, পুণ্যপাল, তোমার স্বপ্ন ত স্বপ্ন নয়, আগামিক যুগের ছায়া। সামনে যে বিষম সময় আসছে তারই পূর্বাভাষ। তুমি যে হস্তী দেখেছ তার তাৎপর্য এই যে আগামিক যুগের আমার গৃহী শিষ্য বা শ্রাবকেরা পার্থিব ঐশ্বর্যে লুব্ধ হয়ে হস্তীর মত গৃহেই অবস্থান করবে, শ্রামণ্য অঙ্গীকার করবে না, যদিও বা করে তবে অসৎ-সংসর্গে তা পরিত্যাগ করবে।

মর্কটেরা যেমন চপলমতি হয় তেমনি আমার শ্রমণ সংঘের গণ, গচ্ছ বা শাখাধিপতিরা চপলমতি, অল্পজ্ঞানী ও ব্রতপালনে প্রমাদী হবে। ধর্মে শিথিলাচার হয়ে তারা অন্যকে ধর্মের উপদেশ দেবে ও ধর্মের কদর্থ করবে।

গৃহী শিষ্য বা শ্রাবকেরা দান ও শাসন সেবার জন্য ক্ষীর বৃক্ষ স্বরূপ। এরূপ ধনী গৃহী শিষ্যদের অহংকারী বেশমাত্রধারী আচার্যেরা কণ্টকবৃক্ষের মত চারি দিক হতে ঘিরে রইবে ও পরস্পর পরস্পরকে অভিবর্দ্ধিত করবে কিন্তু জিন শাসনের প্রসার করবে না।

কাকপক্ষী যেমন স্বচ্ছ জল বাপি হতে জল পান করে না তেমনি উদ্ধত স্বভাব শ্রমণেরা স্বীয় আচার্যদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে না। তারা ভিন্ন-তীর্থিক আচার্যদের বহুমান করবে ও তাদের নিকট গমনাগমন করবে।

সিংহকে যেমন অন্য প্রাণী পরাভূত করতে পারে না, কিন্তু স্বীয় শরীরে উৎপন্ন কীটাদিই তাকে কষ্ট দিতে সমর্থ সেইরূপ জিনপ্রবর্তিত ধর্ম অন্যের দ্বারা বিনষ্ট হবে না কিন্তু স্বীয় অনুযায়ীদের কলহে দুর্বল ও অবনতিপ্রাপ্ত হবে।

কমল যেমন পঙ্কে উৎপন্ন হয়, সেইরকম সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি ম্লেচ্ছ দেশ বা হীনকুলে উৎপন্ন হতে দেখা যাবে।

উষর ভূমিতে বীজ বপন করলে তা যেমন ফলদায়ী হয় না তেমনি উপদেশ অপাত্রে দেবার জন্য ফলদায়ী হবে না।

শ্রমণ সংঘে ক্ষমাদি গুণ রূপ কমলে চিত্রিত ও সুচারিত্ররূপ জলপূর্ণ কলসের মতো মহর্ষি আর দেখা যাবে না। শূন্যকুম্ভ চারিত্রহীন আচার্যেরা মহর্ষিরূপে পুজিত হবে।

ভগবন্, জিন শাসনের এই অধোগতি রোধের কি কোনো উপায় নেই?

আছে বৈকী? পুণ্যপাল, আমি তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছি। শ্রাবকেরা যদি ধর্মে তৎপর হয় ও শ্রমণেরা চারিত্রবান, গণ গচ্ছ ও শাখাধিপতিরা যদি নিজেদের অভিবর্দ্ধিত না করে জিন শাসনকে অভিবর্দ্ধিত করে ও কলহ হতে বিরত হয় তবেই তা সম্ভব। কিন্তু পুণ্যপাল, তা হওয়া দুষ্কর।

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পুণ্যপাল বর্দ্ধমানের কাছে প্রব্রজিত হলেন।

গৌতম তখন আগামী পঞ্চম ও ষষ্ঠকাল সম্পর্কে বর্দ্ধমানকে বহুবিধ প্রশ্ন করলেন। বর্দ্ধমান তার প্রত্যুত্তর দিয়ে বললেন, গৌতম আমার নির্বাণের তিন বছর সাড়ে আঠ মাস পরে পঞ্চম কাল সুরু হবে। সেইকালে ভরত

ক্ষেত্রে কোনো তীর্থংকর বা কেবলী জন্ম গ্রহণ করবে না। আমার অন্তেবাসী সুধর্মের জম্বু নামে এক শিষ্য হবে—এই অবসর্পিনীর সেই অন্তিম কেবলী। এই বলে বর্দ্ধমান সমবসরণ হতে উঠে রাজা হস্তীপালের যে প্রাচীন ভগ্ন শুল্ক-শালা ছিল সেই শুল্কশালায় গমন করলেন। বর্ষার চারমাস তিনি সেইখানেই ব্যতীত করবেন।

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাস ব্যতীত হল। কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষও ব্যতীত হতে চলল। আজ তার শেষ দিন। তাঁর জীবনেরো। আজ তিনি মুক্ত হবেন।

সহসা তাঁর গৌতমের কথা মনে হল। তাঁর প্রিয় শিষ্য গৌতম—যে আজো কেবল-জ্ঞান লাভ করতে পারে নি। কেন পারে নি?—পারে নি সে তাঁর প্রতি তার অনুরাগের জন্য। তাঁর অন্য প্রধান শিষ্যরা যখন কেবল-জ্ঞান লাভ করেছে, গৌতম ও সুধর্ম ছাড়া যখন সকলেই মুক্ত হয়ে গেছে, তখন— না এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে তাঁর প্রতি গৌতমের অনুরাগ বিনষ্ট হয়ে যায়। বর্দ্ধমান তখন গৌতমকে ডেকে পাঠালেন। গৌতম নিকটে এসে দাঁড়াতেই বললেন, গৌতম, পাবার পার্শ্ববর্তী গ্রামে দেবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করে। সে তোমার দ্বারাই কেবল প্রতিবুদ্ধ হবে, অন্যের দ্বারা নয়। তুমি যাও, গিয়ে তাকে প্রতিবোধ দিয়ে এস।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে গৌতম পার্শ্ববর্তী গ্রামে চলে গেলেন।

গৌতম চলে যেতে তিনি তাঁর অন্য শ্রমণ ও গৃহী শিষ্যদের ডাক দিলেন। বললেন, আজ আমি তোমাদের অন্তিম উপদেশ দেব। তারপর তাঁর অন্তিম প্রবচন আরম্ভ হল—অখণ্ড, ধারাপ্রবাহী।

তারপর মধ্যদিন কখন সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা কখন মধ্যরাত্রে পরিবর্তিত হল কেউ জানল না। একে একে রাত্রির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ যাম উত্তীর্ণ হতে চলল। কিন্তু বর্দ্ধমান অক্লান্ত, শ্রোতারা চিত্রার্পিত, স্থির। কি এক ভাবাবেশ তাদের যেন পেয়ে বসেছে। সময়ের বোধ তারা হারিয়ে ফেলেছে।

সৌধর্ম দেবলোকে সহসা ইন্দ্রের আসন কম্পিত হল। তিনি তখন চোখ মেলে জম্বু দ্বীপের ভারতবর্ষের মগধান্তর্গত পাবার দিকে চেয়ে দেখলেন। দেখলেন তীর্থংকরের নির্বাণ সময় সমুপস্থিত।

চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে শক্রাধিপ ইন্দ্র তখন মর্ত্যলোকে নেমে এলেন। বর্দ্ধমানের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেন ও তাঁকে সাশ্রুনেত্রে বন্দনা করে বললেন, ভগবন্, আপনার নির্বাণ সময় সমাগত জেনে আপনাকে বন্দনা করতে এসেছি ও সেই সঙ্গে একটি নিবেদন জানাতে। আসবার সময় আপনার জন্ম নক্ষত্র উত্তরা ফাল্গুনীতে ভস্মক গ্রহ সঞ্চারিত হতে দেখলাম। আপনার দেহাবসানের পর সেই গ্রহ যদি উত্তরা ফাল্গুনীতে সঞ্চারিত হয় তবে তা জিন শাসনের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। তাই ততক্ষণ দেহরক্ষা হতে বিরত থাকুন যতক্ষণ না তা স্বাতী নক্ষত্র অতিক্রম করে উত্তরা ফাল্গুনীতে প্রবেশ করে।

বর্দ্ধমানের প্রবচন ততক্ষণে শেষ হয়েছে। উষার আলোর স্বর্ণিম রেখা পুব আকাশকে তখন অভিষিঞ্চিত করছে।

বর্দ্ধমান বললেন, দেবরাজ, তুমি ত একথা ভালো ভাবেই জান আয়ু বর্দ্ধিত করবার ক্ষমতা তীর্থংকরেরো নেই। তবু তোমার যে এই আগ্রহ সে জিন শাসনে তোমার অনুরাগের জন্য। কিন্তু বীতরাগীর সেরূপ কোনো আগ্রহ থাকে না। তাছাড়া কালচক্রের পরিবর্তনে জিন শাসনের এমনিতেই অবনতি হবে। ভস্মক গ্রহ যদি তার নিমিত্ত কারণ হয় ত তীর্থংকর তার পরিবর্তন করবেন না।

ভগবন্, তবে তাই হোক।

বর্দ্ধমান তখন তাঁর সমস্ত চেতনা গুটিয়ে নিলেন, কেন্দ্রিত করলেন। তারপর ধ্যানের গভীরতায় ডুবে যেতে লাগলেন। শেষে শৈলেশীকরণে আঘাতি কর্মক্ষয় করে লোকের ঊর্দ্ধভাগ স্থিত সিদ্ধলোকে গমন করলেন।

কল্পসূত্র সেই মহা নির্বাণের কথা লিখতে গিয়ে লিখলেন—সেই চতুর্থ মাসের চতুর্থ মাসে সপ্তম পক্ষে কার্তিক কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশম দিবসে যে চরম-রাত্রি সেই রাত্রিতে শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান কালগত হলেন, সংসার হতে ব্যতিক্রান্ত হলেন, অপুনরাবর্তরূপে উর্দ্ধে গমন করলেন, জন্ম, জরা, মরণ বন্ধন ছিন্ন করে সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অন্তকৃৎ, পরিনিবৃত, সর্বদুঃখহীন হলেন।

সমগ্র পাবা এক গভীর শোক সাগরে নিমজ্জিত হল।

গৌতম পার্শ্ববর্তী গ্রাম হতে ফেরার পথে সেই খবর পেলেন—ভগবান

কালগত হয়েছেন। শুনে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, বিশ্বাস হয় না যে আমি দীর্ঘ ত্রিশ বছর তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছি, তিনি তাঁর নির্বাণ সময়ে আমায় দূরে সরিয়ে দেবেন! আমার কী দুর্ভাগ্য যে সেই সময় আমি তাঁর কাছে থাকতে পারলাম না। আমার হৃদয় বজ্র দিয়ে তৈরী তাই তা এখনো বিদীর্ণ হচ্ছে না। তারাই ভাগ্যবান যারা সেই সময় তাঁর কাছে ছিল। জানিনা তিনি কেন আমায় পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু না...

সহসা তাঁর বর্দ্ধমানের সেই কথা মনে পড়ল, গৌতম, তোমার আমার সম্পর্ক ত আজকের নয়, জন্ম জন্মান্তের। এক সঙ্গে ছিলাম, এক সঙ্গে আছি, সিদ্ধশীলায় একসঙ্গে অনন্তকাল থাকব।

তবে? তবে তিনি কেন শেষ সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করলেন...না না না, তাঁতে পরিত্যাগের প্রশ্ন কোথায়? তিনি বীতরাগ। বীতরাগ তাই এত সহজে তিনি আমায় দূরে সরিয়ে দিতে পারলেন...তাইত! সেই বীতরাগে আমার অনুরাগ? না না, আমায় তাই হতে হবে। আমায় বীতরাগ হতে হবে।...

তাই হবে ভগবন্, তাই হবে। আমি এই মুহূর্তে তোমার প্রতি আমার সমস্ত অনুরাগ পরিত্যাগ করলাম...

একি—একি আলোর বন্যা! একি চেতনার পরিপ্লাবন! এ আমি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি...আকাশ বাতাস আজ সব নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে, অজস্র আলোর পরমাণু আমাকে ব্যাপাদিত করে চলেছে।

গৌতম, তুমি আমি এক সঙ্গে ছিলাম একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গে থাকব।

সেই অনন্ত জীবন।

সেই অনন্ত জীবনের স্মরণে, শ্রদ্ধায় সেই হতে প্রজ্বলিত হয় কার্তিকী অমাবস্যায় দীপাবলীর দীপমালা।

অন্ধকার হতে আমায় প্রকাশের দিকে নিয়ে চল।

মহাবীর বলেছিলেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ধন সম্পত্তি ও পরিজন সম্বন্ধীয়

সিংহ যেমন
মৃগ শিশুকে ধরে নিয়ে যায়,
অন্তঃকালে
মৃত্যুও তেমনি
মানুষকে ধরে নিয়ে যায়,
মাতা পিতা বা ভাই
কেউই রক্ষা করতে সমর্থ হয় না।

তুমি নিজেই অনাথ,
অনাথ হয়ে অন্যকে তুমি
কিভাবে রক্ষা করবে ?

যে ভাবে
ধন সম্পত্তি পরিজন
তাকে রক্ষা করবে,
সে তাদের বা তারা তাকে,
সে ভুল করে।
কারণ তারা তাকে
রক্ষা করতে বা
সাহায্য করতে সমর্থ নয়।

ধন ইহলোকে
রক্ষা করতে পারে না,
না পরলোকে।
সহসা যার দীপ নির্বাপিত হয়েছে
তার মতো
সন্মার্গ অবগত হয়েও
সে ঐশ্বর্যের জন্ত পথ দেখতে পায় না।

স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব
জীবিত কালেই তার ওপর
নির্ভর করে,
মৃত্যুর পর তাকে অনুসরণ করে না।

ইহ জগতে
তাদের জন্ত সে হয়ত
পাপাচরণ করে,
কিন্তু ফলভোগের সময়
তারা অবান্ধব হয়ে যায়।

দুঃখ ভোগ
আত্মীয় বন্ধু পুত্র কলত্র
ভাগ করে নিতে পারে না,
তা তাকে একাই ভোগ করতে হয়,
যে কর্ম করে
কর্মফল তারই অনুসরণ করে।

যে যে ধরণের কর্ম করে
ইহ জগতে

ব্যক্তিগত ভাবে তা তাদের
ভোগ করতে হয়,
ভোগ না করে
কেউ তাদের অতিক্রম করতে
পারে না।

দুর্লভ সম্বন্ধীয়

সংসারে চারটি জিনিষ দুর্লভ
অথচ কল্যাণকর—
মনুষ্য দেহলাভ, ধর্ম শ্রবণ
ধর্মে শ্রদ্ধা ও ধর্মে উদ্যম।

মনুষ্যদেহ লাভ করলেও
সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ
যা শ্রবণ করে
সে তপঃ নিরত ক্ষমাশীল
ও অহিংসা পরায়ণ হয়।

যদি সৌভাগ্য বশতঃ
ধর্ম শ্রবণও হয়
তাতে শ্রদ্ধা হওয়া দুর্লভ,
কারণ সংসারে এমন অনেকে আছে
যাদের সদ্ধর্ম শ্রবণ হয়েছে
কিন্তু তাতে শ্রদ্ধা হয় নি।

যদি ধর্ম শ্রবণ ও
ধর্মে শ্রদ্ধাও হয়,
ধর্মে উদ্যম হওয়া দুর্লভ,

কারণ সংসারে এমন অনেকে আছে
যাদের ধর্মে শ্রদ্ধা হয়েছে
কিন্তু তার জন্ত উত্তম করে না।

তাই মাহুষ্য দেহ,
সদ্ধর্ম শ্রবণ,
ধর্মে শ্রদ্ধা ও ধর্মে উত্তম
লাভ করে
সংযত হও ও
কর্মমল শরীর হতে
দূর কর।

পূজ্য সম্বন্ধীয়

যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী
ভবিষ্যৎ লাভের আশায়
সে কণ্টক যন্ত্রণা সহ্ করে,
কিন্তু যে ভবিষ্যৎ লাভের আশা না রেখে
দুর্বাক্যরূপ কণ্টক যন্ত্রণা সহ্ করে,
সে পূজ্য।

দুর্বাক্য কানে প্রবেশ করে
মনে বৈরর উদ্ভব করায়,
ধর্ম ভাবনায় যে
তা সহ্ করে সংযত থাকে,
সে পূজ্য।

যে পরোক্ষে নিন্দা করে না,
প্রত্যক্ষে কটু শব্দের প্রয়োগ,

যে নিশ্চিত বাক্য বলেনা,
বা যা ক্ষতিকর তার উচ্চারণ,
সে পূজ্য।

যে অলোলুপ অকৌতূহলী
ও অমায়ী
অপিষুণ ও অদীনবৃত্তি,
যে অন্যের প্রশংসা করে না,
বা নিজের প্রশংসা কামনা করে না,
সে পূজ্য।

যদিও প্রচুর পরিমাণে
খাদ্য বস্ত্র শয্যাদি সংগ্রহ করতে সমর্থ
তবুও যে প্রয়োজন মত
সামান্য সংগ্রহ করে
ও সন্তোষ শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করে'
তাইতেই সন্তুষ্ট থাকে,
সে পূজ্য।

যার এ সমস্ত গুণ রয়েছে সে পূজ্য,
যার নেই সে নয়।
পাপ পরিহার করে
এই গুণ আশ্রয় কর।
আত্মা দিয়ে আত্মাকে জান,
প্রিয় অপ্রিয়ে—
সমভাব রাখ
ও পূজ্য হও।

যে সমস্ত প্রাণীকে
আত্মবৎ মনে করে'
সমভাবে দেখে,
কর্মপ্রবাহ নিরুদ্ধ করে'
সদাসংযত থাকে,
সে পাপ করে না।

[ক্রমশঃ

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় পর্ব

॥ ১ ॥

দেখো তোমায় আমি একথা শেষ বারের মত বলে দিচ্ছি—এক খাপে দুই তলোয়ার থাকতে পারে না। হয় তুমি আমায় পরিত্যাগ কর, অন্যখানে চলে যেতে দাও, নয় ত তোমার এই কুলাঙ্গার পুত্রকে এই ঘরে আর কখনো যেন পা না দেয় বলে বার করে দাও। প্রতি দিনের এই চক্ষুঃশূল আমার সহ্য হয় না।

সে আমি জানি। কিন্তু নিজের সন্তানকে কোথায় আমি বার করে দেব? নিকট সম্পর্কের বা আশ্রিত কেউ হলে তাকে বার করে দেওয়া যায়। তা ছাড়া আমাদের এই শিখী ত এখনো বালক। আমরাই যদি এর প্রতি শত্রুর মত ব্যবহার করি ত একে দেখবার আর কে আছে? যেমন তেমন করে আর কয়টা বছর কাটিয়ে দাও। বড় হলে, বুঝতে পারলে ও নিজেই আর কোথাও চলে যাবে। তখন ওকে থাকতে বললেও আর থাকবে না। বলবে এই ঘরে আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে পারছি না।

কোশ নগরের এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদত্ত এভাবে তার স্ত্রী জালিনীকে বোঝাচ্ছিল। কিন্তু তার স্ত্রী তার কথা কানে নিচ্ছিল না। বলছিল ওকে আর এক মুহূর্তও সে ঘরে রাখতে রাজী নয়। ওকে এখান হতে যেতেই হবে।

শিখীও সে কথা জানত। জালিনী তার আপন মা হলেও তার স্নেহ হতে সে বঞ্চিত। শুধু তাই নয়, সাধারণতঃ নিজের সন্তানকে দেখলে যার চোখ বাৎসল্য রসে আর্দ্র হয়ে আসে কিন্তু শিখীর বেলায় তার মায়ের চোখ কেবল অগ্নি বর্ষণই করতে থাকে।

শিখী মার কাছে কোনো অপরাধও করে নি। যত দূর নম্র ও বিনয়ী হয়ে থাকতে হয়, তাই থাকে। কিন্তু তবুও কেন যে তিনি তার প্রতি বিরূপ তা সে নিজেই জানে না। সে যেন মার চোখের বালি—সে কথা সে একবার নয়, হাজার বার অনুভব করেছে। অন্য কেউ হলে এই ঘরের বিষাক্ত পরিবেশ ছেড়ে কবে চলে যেত। কিন্তু শিখী তা পারেনি। সে দুর্বল চিত্ত তাই বলে নয়; তার কারণ তার মা তার প্রতি যতই নির্মম ও কঠোর হোন না কেন, তার বাবা তার প্রতি ততখানি মৃদু ও সহৃদয়। ঘর ছেড়ে চলে গেলে তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া হবে বলে সে এ পর্যন্ত ঘর ছেড়ে যেতে পারেনি।

শিখীর মত ছেলের মা হওয়া ভাগ্যের কথা। শিখীকে দেখা মাত্র যে কোনো মা মমতা অনুভব না করে পারবে না। কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম তার আপন মা। একে দৈব দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

ব্রহ্মদত্ত ও জালিনী উভয়েই কুলীন ঘরের তাই বংশগত দোষে এই সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড ঘটেছে তাও বলা যায় না। ওদের দু'জনের পিতাই কোশ নগরের লোকপ্রিয় মন্ত্রী। তাছাড়া ব্রহ্মদত্ত ও জালিনীর মধ্যেও ভালবাসার কোনো অভাব নেই। সংসারের সব বিষয়েই তারা প্রায় একমত। কিন্তু একমাত্র শিখীর কথা উঠলেই জালিনী বাঘিনীর রূপ ধারণ করে।

শিখী একটু বড় হয়ে উঠলে যে জালিনী তার প্রতি বিরূপ হয়েছে তাও নয়। জালিনী জন্ম হতেই তার প্রতি বিরূপ। তখন হতেই সে তাকে পরিত্যাগ করবার চেষ্টা করেছে। এক সময় তাতে সফলও হয়েছে। কিন্তু সেই পরিত্যক্ত পুত্রই যখন দত্তক পুত্র রূপে তার ঘরে আবার ফিরে এল তখন হতে তার ক্রোধের আর পরিসীমা রইল না। তারপর এমন একদিনও যায় নি যেদিন সে তার স্বামীকে ওকে ঘর হতে বার করে দিতে বলেনি। ব্রহ্মদত্তও এখন এর জন্য তিক্ত বিরক্ত। তার অবস্থা অনেকটা জাঁতির মধ্যের সুপুরীর মত।

কিন্তু শেষে একদিন জালিনী বলেই দিল, যদি তুমি ওকে ঘর হতে বার করে না দাও তবে আমি জলে ডুবে আত্মহত্যা করব বা কুয়োয় লাফিয়ে পড়ব।

ব্রহ্মদত্ত একথা যেমন রোজ শোনে তেমনি শুনল কিন্তু শিখীর সহসা মনে

হল যেখানে প্রতিদিনের এই অশান্তি সেখানে থাকায় সত্যি আর কোনো লাভ নেই। তার এখন এখান হতে চলে যাওয়াই উচিত। পিতা হয়ত এর জন্য কষ্ট পাবেন. কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি? যদি কখনো সুযোগ মেলে তবে পিতার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সে তার অবিনয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে।

॥ ২ ॥

শিখী তাই এরপর একদিন সত্যি ঘর ছেড়ে চলে গেল। কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে গেল তা নয়, কোথায় যাবে তাই তার নিশ্চিত ছিল না। মাথার ওপর আকাশ ও পায়ের তলায় মাটি—ব্যস, এইমাত্র তার সম্বল। সঙ্গীহীন বান্ধবহীন গৃহ হতে বিতাড়িত শিখী পথ চলতে চলতে কি ভাবছিল কে জানে!

হয়ত ভাবছিল, কুকুর বেড়ালের বাচ্চারাও যখন তাদের মায়ের কোলে আশ্রয় পায়, যখন মায়ের কোলে মাথা গুঁজেই না সংসারের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভোলা যায় তখন তার এই দুর্ভাগ্য কেন?

শিখী বারবার নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখছিল—না সেখানে ত তার মার প্রতি কোনো অসদ্ ভাবনা নেই। তবে তার মা তাকে কেন দেখতে পারেন না। তার মা যে স্নেহশীলা নন তাও নয়—তিনি অন্যের সন্তানের প্রতি মমত্ব দেখান—কিন্তু তার বেলায় তিনি এত নিষ্ঠুর কেন?

কিন্তু শিখী এর কোনো সমাধানই খুঁজে পায় না। সামনে মহা অরণ্য। এখানে কে তাকে আশ্রয় দেবে। বাবা তুই এসেছিস বলে অপার্থিব স্নেহে কোলে টেনে নেবে?

সংসারে একা থাকবার মত বয়স শিখীর এখনো হয়নি - ক্ষুধা তৃষ্ণা সে সহ্য করতে পারে, পরিশ্রম করতেও সে ভয় পায় না, ভয়ত তার নেইও কিন্তু সেই অদৃশ্য স্নেহতন্তু যা সকলকে ঘরমুখো করে, নিরাশায় আশার উৎসাহ ভরে দেয় সেই তন্তুই তার ছিঁড়ে গিয়েছিল। তার অভাবে শিখীর মত ছেলের চোখেও এখন সব কিছু অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল।

[ক্রমশঃ

বঙ্গভাষায় জৈনচর্চা ঃ কালক্রমিক পঞ্জী

দ্বিতীয় পর্যায়

শ্রীঅশোক উপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর সেন—বঙ্গে জৈন সম্প্রদায়, নব্যভারত, আষাঢ় ১২৯৫, পৃ. ১৪৫-১৪৮।

নগেন্দ্রনাথ বসু, সঙ্কলক—জৈন, বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ, কলিকাতা, বিশ্বকোষ কার্যালয়, ১৭।১, নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, ১৩০৩, পৃ. ১৬১-২১৪।

নগেন্দ্রনাথ বসু, সঙ্কলক—পাটন, পার্শ্বনাথ, জৈন পুরাণ, বিশ্বকোষ, ১১শ ভাগ, কলিকাতা, বিশ্বকোষ কার্যালয়, ১৪নং তেলিপাড়া লেন, ১৩০৭, পৃ. ৩৩, ২৯৯-৩০৩, ৬৯৫-৭১৮।

বামনদাস বসু—শত্রুঞ্জয় পর্বত, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩০৯, পৃ. ১৫-১৬।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—নিগ্রন্থ নাথপুত্র, বুদ্ধদেব অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবন চরিত ও উপদেশ, কলিকাতা, জি, সি, বসু এণ্ড কোং, বসু প্রেস, ৬৩ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কার্তিক ১৩১১, পৃ. ২২৩ ২২৫। [সাহিত্য রত্ন গ্রন্থাবলী-১]

মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়—পরেশনাথ-দর্শন ও জৈন ধর্ম, নব্যভারত, পৌষ ১৩১৩, পৃ. ৪৪৯-৪৫৯।

শিবচন্দ্র শীল—দীপালি ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্ব, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [বৈশাখ-আষাঢ়] ১৩১৪, পৃ. ৫১-৫৩। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, কার্তিক ১৩৮২, পৃ. ২২০-২২২]

নবীনচন্দ্র সেন—পাওপুরী, আমার জীবন, তৃতীয় ভাগ, কলিকাতা, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, ১৩১৭, পৃ. ৩৩৬-৩৪০। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, ভাদ্র ১৩৮২, পৃ. ১৫৪-১৫৬]

বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়—আকবর ও জৈনধর্ম, বালক, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ. ২৭১-২৭৬।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—জৈন ত্রিরত্ন, ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩১, পৃ. ৮০১-৮০৭। (পান্নালাল বাকলীওয়াল রচিত হিন্দী প্রবন্ধ অবলম্বনে)

বিমলাচরণ লাহা—জৈনধর্মগ্রন্থ, বৈশালী ও মহাবীর, জৈনধর্ম, লিচ্ছবি জাতি, কলিকাতা, রঘুনাথ শীল, ৪৭।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট, [ফাল্গুন ১৩৩১], পৃ. ৩, ১২-১৪, ১১২ ; ৩৫-৩৬ ; ৭৫-৭৯। [হৃষীকেশ সিরিজ নং ১০]

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—হিন্দু ও জৈন কালবিভাগ, কায়স্থ সমাজ, ভাদ্র ১৩৩২, পৃ. ২৬৬-২৭২।

হরিসত্য ভট্টাচার্য—প্রমাণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [বৈশাখ-আষাঢ়] ১৩৩৩, পৃ. ১-১৮।

পুলিনবিহারী দত্ত—জৈনযুগের মথুরা, মাথুর কথা, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, [৮ বৈশাখ] ১৩৩৩, পৃ. ৩৩-৫৭। [সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থা-বলী সংখ্যা ৭২]

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—জৈনদিগের ষোড়শ সংস্কার, বিশ্ববাণী, আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ. ১৬০-১৬৪।

বেণীমাধব বড়ুয়া—মহাবীর ও বুদ্ধের কাল নির্ণয়, বিশ্ববাণী, আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ. ১৭৪-১৮১।

অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ—হিন্দু ও জৈনদিগের ষোড়শ সংস্কার (সমালোচনা), বিশ্ববাণী, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ. ৩৫০-৩৫২। [জৈনদিগের ষোড়শ সংস্কার প্রবন্ধের প্রতিবাদে লেখা]

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—মহাবীর ও বুদ্ধের কাল নির্ণয় (সমালোচনা), বিশ্ব-বাণী, কার্তিক ১৩৩৪, পৃ. ৪৮৯-৪৯০। [বেণীমাধব বড়ুয়ার সমনামিক প্রবন্ধের প্রতিবাদে লেখা]

ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—মেদিনীপুরে জৈনমূর্তি আবিষ্কার, মাধবী, আষাঢ় ১৩৩৬, পৃ. ৬৩-৭১।

যোকদাচরণ সামাধ্যায়ী—জৈনদর্শন (পৃ. ২২৮-২২৯), দর্শন—প্রাচীন ও আধুনিক, বিশ্ববাণী, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ. ২১৭-২৩৩।

পুরণচাঁদ নাহার—ভগবান্ পার্শ্বনাথ, হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা (২য় খণ্ড), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, [১৪ আশ্বিন] ১৩৩৯, পৃ. ১২৮-১৩৩। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, কার্তিক ১৩৮২, পৃ. ১৯৫-২০০]

মতিলাল রায় —মহাবীর, যুগগুরু, কলিকাতা, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৪০, পৃ. ১০-১৭।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—জৈন দেবী সরস্বতী, ষোড়শ বিদ্যাদেবী, সরস্বতী গচ্ছ, সরস্বতী ১ম খণ্ড, কলিকাতা, শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩১ তেলিপাড়া লেন, ১৩৪০, পৃ. ১০০-১০৬, ১০৬-১১২, ১১২-১১৪। [দেবতত্ত্ব-গ্রন্থমালা—১]

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রধান সম্পাদক—অকলঙ্কদেব, অকলঙ্কভট্ট, অকলঙ্কস্তোত্র , অঙ্গজিৎ, অঙ্গটিকা, অঙ্গপ্রবিষ্ট, অঙ্গবাহ্য, অঙ্গবিদ্যা ২, অচল ৪, অচিরা, অচ্ছ ৩, অজিত ৪, অজিতকেশরি মুনি, অজিতচন্দ্র, অজিতদাস, অজিতদেব, অজিতদেব সূরি, অজিত ধর, অজিতনাথ স্বামী, অজিতপ্রভ সূরি, অজিতবল, অজিতবলা, অজিত ব্রহ্মচারী, অজিত মুনি, অজিতসাগর, অজিত সিংহ সূরি, অজিত সূরি, অজিত সেন ভট্টারক, অজিতা, অজীবকায়, অঞ্চলগচ্ছ, অঞ্জন শলাকা, বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, পৌষ সংক্রান্তি ১৩৪১, পৃ. ১৩১, ৫১৫, ৫১৯, ৫২৭, ৫৮৭, ৬১০, ৬১৪, ৭১৭, ৭১৯, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭৩২, ৭৪২, ৭৫৪, ৭৭৪।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—অচ্ছুপ্তা, অচ্যুতা, অণুব্রত, বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৭, ৬৩৪-৬৩৫, ৮৩৬-৮৩৯।

ত্রিদিবনাথ রায়—অকলঙ্ক ২, অকলঙ্কচন্দ্র, অকলঙ্কদেব, বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০।

যারেশচন্দ্র শর্মাচার্য—অঙ্গ ২, বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯২-৪৯৪।

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত—অগ্নিভূতি, বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪।

দীনেশচন্দ্র সেন—জৈনধর্ম, বৃহৎ বঙ্গ [১ম খণ্ড] কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ / ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫, পৃ. ১২৮-১৩৬। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, শ্রাবণ ১৩৮১, পৃ. ১১৯-১২৭, ভাদ্র, ১৩৮১, পৃ. ১৫৬-১৫৯]

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রধান সম্পাদক—অতিভদ্রা, অতিভূতি, অতিবিশাল, অতিবীর্য, অধিবাসনা, অনূপচন্দ্র, অনূপচাঁদ, অনূপবিধি, অনেকান্ত-

অলপাকাকা, অনোজ্জা, অন্তরদারি, অন্তরীক্ষ পার্শ্বনাথ, অপরিগ্রহ, বঙ্গীয় মহাকোষ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৮, পৃ. ৬৭, ৭৬, ২৯৩, ৫৯৪, ৬০২, ৬১৯, ৬২৮, ৬৩৬, ৭১৪, ৭২২।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—অতিথি সংবিভাগ, অনশন (জৈনমতে), বঙ্গীয় মহাকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০-৬২, ৩৯৬-৩৯৭।

নরেশচন্দ্র মিত্র—অন্তরমুহূর্ত, বঙ্গীয় মহাকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৮।

গৌরীপ্রকুমার ঘোষ—অপরাজিত ২, বঙ্গীয় মহাকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৪।

হরিমোহন ভট্টাচার্য—অনেকান্তবাদ, বঙ্গীয় মহাকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০২-৬১৬।

সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়—জৈন-ধর্মে নারীর স্থান, শ্রীভারতী, ভাদ্র ১৩৪৫, পৃ. ৬-৮; আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ১৮-২০।

গোপালচন্দ্র সেন—আর্হত্ বা জৈন দর্শন, দর্শন পরিচয়, কলিকাতা, রামচন্দ্র সেন, অধ্যক্ষ গৌরীসেন গ্রন্থমন্দির, ৩৩ নং তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, হরিতকি বাগান, [বৈশাখ ১৩৪৬], পৃ. ১৫৪-১৬৩।

সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়—স্যাদ্বাদ, শ্রীভারতী, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ. ৬৩৯-৬৪২; শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃ. ৭৩৬-৭৩৯।

অজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য—ভাব ও অভাব, শ্রীভারতী, শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃ. ৭০৩-৭০৬।

হরিসত্য ভট্টাচার্য—শব্দ ও অর্থ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [কার্তিক-পৌষ] ১৩৪৭, পৃ. ১৬৬-১৭৫।

হরিসত্য ভট্টাচার্য—সর্বজ্ঞ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, [বৈশাখ-আষাঢ়] ১৩৪৮, পৃ. ১-১৮।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়—প্রাচীন জৈন সমাজে নারীর স্থান, মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ. ৪০-৪২।

আনন্দচরণ কারফুন—বৈভারের জৈন মন্দির, বিপুলের জৈন মন্দির, পাওয়াপুরী, রাজগীর, নালন্দা ও পাওয়াপুরী, কলিকাতা, অমলকুমার কারফুন, ১৬২/৬৩/১, গ্রিন আনওয়ারশাহ রোড, (১ম সং ১৩৬০), ৪র্থ সং ১৩৬৩, ১৩৬৩, পৃ. ২৭, ৩২, ৪২-৪৪।

গণেশ লালওয়ানী—শ্বেতাম্বর, শ্রমণভারতী, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ. ৯৩-৯৮।
[পুনর্মুদ্রণ (শ্বেতাম্বর), অতিমুক্ত, পৃ. ৪২-৪৯]

গণেশ লালওয়ানী—কপিল, শ্রমণভারতী, শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃ. ১৭২-১৭৮।
[পুনর্মুদ্রণ, অতিমুক্ত, পৃ. ২২-২৬]

গণেশ লালওয়ানী—নাগিলা, শ্রমণভারতী, ভাদ্র, ১৩৫৮, পৃ. ৩৪২-৩৪৬।
[পুনর্মুদ্রণ, অতিমুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৯]

পরিতোষ ঠাকুর—জৈন সাধু সম্প্রদায়ের কথা, দেশ, ১৯ মাঘ ১৩৬৩, পৃ. ৩৩-৩৯।

মৃণাল গুপ্ত—জৈন মন্দিরে বিদেশী শিল্প, দেশ, ২০ শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃ. ২৬-৩২।

দেবলা মিত্র—উদয়গিরি-খণ্ডগিরি, ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আশ্বিন ১৩৭১, পৃ. ৬১৫-৬১৬।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—অপভ্রংশ সাহিত্য, ভারতকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০-৭২।

গণেশ লালওয়ানী—দাদাবাড়ী ও জৈনাচার্যগণ, জৈন শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দির সার্ধ শতাব্দী মহোৎসব স্মারকপত্র, কলিকাতা, ৩০ জানুয়ারী ১৯৬৫ [১৬ মাঘ ১৩৭১] পৃষ্ঠাঙ্কহীন চার পৃষ্ঠা। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮০, পৃ. ২০৯-২১]

গণেশ লালওয়ানী—জৈন ধর্ম পরিচয়, সার্ধ শতাব্দী স্মারক পত্র, (বাংলা) কলিকাতা, ৩০ জানুয়ারী ১৯৬৫, পৃ. ২০-২২।

তরণীপ্রসাদ মাজি—সরাক জাতি ও জৈন ধর্ম, সার্ধ শতাব্দী স্মারক পত্র, পৃ. ২৩-২৪। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, আশ্বিন ১৩৮১, পৃ. ১৭৫-১৭৬]

হরিসত্য ভট্টাচার্য—অহিংসা ব্রত, শ্রীজৈন শ্বেতাম্বর পঞ্চায়তী মন্দির সার্ধ শতাব্দী স্মারকপত্র, পৃ. ১-১১। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, বৈশাখ ১৩৮১, পৃ. ২০-২৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১, পৃ. ৫৩-৬২]

হরিসিং শ্রীমাল—জৈন দার্শনিক তত্ত্বের কয়েকটি কথা, সার্ধ শতাব্দী স্মারকপত্র, পৃ. ১২-১৯। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, ভাদ্র ১৩৮১ পৃ. ১৪৫-১৫৫]

গণেশ লালওয়ানী—জৈন ধর্মশাস্ত্র হতে গল্প, বেতার জগৎ, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, পৃ. ৮৭৬, ৮৭৮।

গণেশ লালওয়ানী—ওসওয়াল, ভারতকোষ, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, পৃ. ১২২।

নিমাইসাধন বসু—কুমারপাল, ভারতকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৬।

গণেশ লালওয়ানী—জিন, জৈন আচার অনুষ্ঠান, জৈন ধর্ম, জৈন সাহিত্য, তীর্থংকর, ভারতকোষ, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৌষ ১৩৭৪, পৃ. ৫২, ৫৪৭-৫৪৮, ৫৫২-৫৫৪, ৫৫৪, ৭২৮।

দেবলা মিত্র ও কমল গুহ—গিরনার, ভারতকোষ, ৩য় খণ্ড,পৃ. ১৩২-১৩৪।

দেবকুমার চক্রবর্তী—জৈন ধর্ম ও মূর্তি শিল্পে লোকায়ত ধর্ম ও ধ্যান-ধারণার প্রভাব, চতুষ্কোণ, মাঘ ১৩৭৬, পৃ. ৯৬৭-৯৭৭।

গণেশ লালওয়ানী—তীর্থংকর মহাবীর, মহাবীর জয়ন্তী সমারোহ স্মারিকা ১৯৭০, পৃ. ৪-৬।

গণেশ লালওয়ানী—জৈন চিত্রকলা, সারস্বত, শারদীয় (শ্রাবণ-আশ্বিন) ১৩৭৭, পৃ. ১২৫-২৩৫।

কমলকুমার গুহ ও ভক্তপ্রসাদ মজুমদার—পাওয়াপুরী, ভারতকোষ, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বৈশাখ ১৩৭৮, পৃ. ৩৩৫।

কমলা মুখোপাধ্যায়—দিলওয়াড়া, ভারতকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬-৫৭।

গণেশ লালওয়ানী—দিগম্বর সম্প্রদায়, নেমিনাথ (অরিষ্টনেমি), পার্শ্বনাথ, ভারতকোষ ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২, ২৫৭, ৩৭৩।

শম্ভুনাথ ঘটক—পরেশনাথের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, কৌশিকী, পৌষ ১৩৭৮, পৃ. ১৩-১৪।

গণেশ লালওয়ানী—বাংলার আদি ধর্ম—জৈন ধর্ম, ভগবান মহাবীর জয়ন্তী সমারোহ স্মারিকা, ২৭ মার্চ ১৯৭২ [১৩ চৈত্র ১৩৭৮], পৃষ্ঠাঙ্কহীন তিন পৃষ্ঠা।

গণেশ লালওয়ানী, অনুবাদক ও সম্পাদক—শ্রাবককৃত্য, কলিকাতা, জৈন-ভবন, ১৩ চৈত্র ১৩৭৮, পৃ. ৩১। [মূল-হিন্দী, মুনি জিন-হর্ষ]

গণেশ লালওয়ানী—ভগবান মহাবীর, অমৃত, ১৫ বৈশাখ ১৩৭৯, পৃ.৯৭৯-৯৮০।

গণেশ লালওয়ানী—জৈনদের একটি মহান পর্ব [পর্যুষণ], দৈনিক বসুমতী, ৮ আশ্বিন ১৩৭৯। [পুনর্মুদ্রণ, বালুচর, ৩ ভাদ্র ১৩৮১]

দীপকরঞ্জন দাস—দেউলঘাটের একটি মন্দির, কৌশিকী, শারদীয়া ১৩৭৯, পৃ. ১০০-১০২।

গণেশ লালওয়ানী—অতীতের মোহ, শিশুতীর্থ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৯, পৃ. ৩০৭-৩০৯।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—জৈন মতে মনের স্বরূপ, প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যা, কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, [৮ আগষ্ট রথযাত্রা] ১৯৭৩, পৃ. ১১-১২। [কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক—৮৩]

গণেশ লালওয়ানী—ভগবান মহাবীর ও অনেকান্তবাদ, ভগবান মহাবীর জয়ন্তী সমারোহ স্মরিকা, ১৫ এপ্রিল ১৯৭৩ [২ বৈশাখ ১৩৮০], পৃষ্ঠাঙ্কহীন দুই পৃষ্ঠা।

গণেশ লালওয়ানী, [অনুবাদক ও সঙ্কলক]—শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা, কলিকাতা, জৈন ভবন, বৈশাখ ১৩৮০, পৃ. ৬৬। সূচি: দুই জীবন: দুই আদর্শ / নমি প্রব্রজ্যা। উত্তরাধ্যয়ন, মনুষ্যজন্ম দুর্লভ / রথনেমীয়। উত্তরাধ্যয়ন, জীবন অনিশ্চিত / প্রথম বর্গ। অন্তকৃদ্দশা, ব্রত সম্পন্নই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক / হরিকেশীয়। উত্তরাধ্যয়ন, সংসার দুঃখময় / মৃগাপুত্রীয়। উত্তরাধ্যয়ন, আত্মাই আত্মার রক্ষক / মহানির্গ্রন্থীয়। উত্তরাধ্যয়ন, আত্ম জয় শ্রেষ্ঠ জয়/কেশী গৌতমীয়। উত্তরাধ্যয়ন, আমার জীবন আমার বাণী / উপধান শ্রুত। আচারাঙ্গ, বীরস্তব / বীরস্তুতি। সূত্রকৃতাঙ্গ।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—হেমচন্দ্র, ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড, শ্রাবণ ১৩৮০, পৃ. ৬৬৪।

গণেশ লালওয়ানী—ভদ্রবাহু, মহাবীর, ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৩, ৩০২-৩০৩।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার—শ্রবণবেলগোলা, ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড পৃ. ৫১২-৫১৩।

শম্ভুনাথ ঘটক—বিহারীনাথ প্রসঙ্গে, কৌশিকী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮০, পৃ. ৪১ ৪২।

শিবেন্দু মান্না—লৌকিক দেবতা ইগুনাথ, কৌশিকী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮০, পৃ. ৫০-৫৩। [তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের লোকদেবতায় রূপান্তর। পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ, শ্রাবণ ১৩৮২, পৃ. ১০৮-১১৩]

গণেশ লালওয়ানী—হরিভদ্র সূরী রচিত ধূর্তাখ্যান, শারদীয়া চিত্রাঙ্গদা, ১৩৮০, পৃ. ১০-১৩।

গণেশ লালওয়ানী—ইলাপুত্র, উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ ১৩৮০, পৃ. ৬১৮-৬৫১। [পুনর্মুদ্রণ, শ্রমণ' শ্রাবণ ১৩৮২, পৃ . ২২৪-২২৯]

গণেশ লালওয়ানী—মুনি পুণ্যবিজয়জী, সারস্বত, মাঘ-চৈত্র ১৩৮০, পৃ. ৩৬৪-৩৬৮।

ভঁবরলাল নাহাটা—বাংলায় জৈন ধর্ম, ভগবান মহাবীর জয়ন্তী সমারোহ স্মরণিকা, ৪ এপ্রিল ১৯৭৪ [২১ চৈত্র ১৩৮০], পৃষ্ঠাঙ্কহীন দুই পৃষ্ঠা।

সুকুমার সেন—জৈন মত, বঙ্গভূমিকা কলিকাতা, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, [১৯৭৪], পৃ. ১৫৫-১৫৯।

সুনীলকুমার দাস—জৈন সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিগ্‌দর্শন, কলিকাতা, পূর্ণিমা দাস, ২০/১এ, বৈদ্যনাথ ঘোষাল রোড, ১লা বৈশাখ ১৩৮১, পৃ. ২৯-৩৬।

গণেশ লালওয়ানী—ভগবান মহাবীর ও গণতন্ত্রীয় ভাবনা, মুর্শিদাবাদ মঞ্চ স্মারকপত্র, ৩১ অক্টোবর ১৯৭৪ [১৩ কার্তিক ১৩৮১], পৃষ্ঠাঙ্কহীন দুই পৃষ্ঠা।

সতীশচন্দ্র ন্যায়াচার্য—জৈন দর্শনের দিগ্‌দর্শন, কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, [১১ মার্চ] ১৯৭৫, পৃ. ১১+৬২। প্রাক্‌কথন—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ৫.২.৭৫, ভূমিকা— নিরঞ্জন-স্বরূপ ব্রহ্মচারী, ১১ মার্চ ১৯৭৫।

সূচী : প্রথম অধ্যায় ॥ দর্শন শব্দের অর্থ. জৈন দর্শনে স্যাদ্বাদ, জৈন দর্শনে প্রমাণবাদ, জৈন দর্শনে প্রত্যক্ষলক্ষণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ পরোক্ষ প্রমাণ, পরোক্ষ প্রমাণে স্মৃতির প্রামাণ্য, —প্রত্যভিজ্ঞাপ্রামাণ্য,—উহ বা তর্কের প্রামাণ্য,—ব্যাপ্তি প্রসঙ্গ, ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে সাধ্যপক্ষ নিরূপণ,—অনুমান-দ্বৈবিধ্য প্রদর্শন, পরার্থানুমানে অবয়ব প্রসঙ্গ, অনুমানে হেত্বাভাসপ্রসঙ্গ।

তৃতীয় অধ্যায় ॥ জৈনদর্শনে নয়বাদ, জৈনদর্শনে প্রমেয়বাদ।

[কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা-গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক—১০০]

গণেশ লালওয়ানী—একটি বিস্মৃত জৈন পীঠস্থান পাকবিড়রা, ভগবান

মহাবীর জয়ন্তী সমারোহ-স্মারিকা, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৫ [১০ বৈশাখ ১৩৮২], পৃষ্ঠাঙ্কহীন দুই পৃষ্ঠা। [পুনর্মুদ্রণ, একটি শিশির বিন্দু, শ্রমণ, আষাঢ় ১৩৮২, পৃ. ৮৯-৯১]

রামচন্দ্র অধিকারী—জৈন শাসনে মুক্তির স্বরূপ, ভগবান মহাবীর জয়ন্তী সমারোহ স্মারিকা, চার পৃষ্ঠা।

অখিল নিয়োগী—বর্ধমান মহাবীর, বেতার জগৎ, ৭ মে ১৯৭৫ [২৩ বৈশাখ ১৩৮২], পৃ. ৩৮৫।

ইন্দ্র দুগার - স্থাপত্যে ও সাহিত্যে জৈন প্রভাব, বেতার জগৎ, ৭ মে ১৯৭৫, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪।

ধর্মনারায়ণ দাস—আধুনিক যুগে জৈন দর্শনের মূল্যায়ন, বেতার জগৎ, ৭ মে ১৯৭৫, পৃ. ৩৮১,৩৮৮।

বিজয়সিংহ নাহার—অহিংসা ও জৈন দর্শন, বেতার জগৎ, ৭ মে ১৯৭৫, পৃ. ৩৮২।

তারিখহীন প্রকাশন

রমনীভূষণ ভট্টাচার্য, অনুবাদক—দশবৈকালিক-সূত্র (বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ), জয়পুর, পার্শ্বনাথ জৈন লাইব্রেরী, পৃ. (১৪)+(২)+১৭৫। [বাঁঠিয়া সিরিজ নং ৭]

ভ্রম সংশোধন

শ্রমণ, পৌষ, ১৩৮২ ॥ ৩য় বর্ষ, নবম সংখ্যা

পৃ, ২৬৬, লাইন ২য়। আছে “কংসাবতী জলাধারে”, হবে—“পাঞ্চেত জলাধারে”।

পৃ. ২৬২ লাইন ২২। আছে “শ্রীঅমিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়” হবে—“শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়”।

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে শ্রমণকে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা:

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৮২ ॥ একাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :

গণেশ লালওয়ানী

সংস্কার করা জৈন মন্দির, দেউলটাঁড়

চিত্র : বিমলেন্দুকুমার

দেউলটাঁড়ের একটি মন্দির

শ্রীদীপক রঞ্জন দাস

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বেগলার সাহেব ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রত্নবস্তুর সমীক্ষা করার সময় লোকমুখে দেউলটাঁড়ে একটি প্রাচীন মন্দিরের সন্ধান পান কিন্তু তিনি সেখানে যেতে পারেন নি। এরপর আর কোন অনুসন্ধানীই বেগলারের এই মন্দিরটির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। ফলে দেবালয়টি আবার হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে।

একবার তুলসী যাওয়ার পথে তিরুলডি ষ্টেশনে রাত কাটাতে হয়েছিল। সেখানে অপেক্ষমান কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আলোচনাকালে দেউলটাঁড়ের মন্দিরটির কথা পুনরায় শুনতে পাই। পরে দেউলটাঁড়ের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গিয়ে হতাশ হতে হল। কারও কাছ থেকে নির্দিষ্ট কোন পথ নির্দেশ পাওয়া গেল না। বেগলারের বর্ণনা অনুযায়ী স্থানটি তুলসী থেকে আট মাইল দূরে। সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে সেখানে কিভাবে যাওয়া যেতে পারে ভাবছি তখন হঠাৎ জয়দাতে একজন কৃষকের কাছে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া গেল। জানা গেল স্থানটি ইচাগড় থানার অন্তর্গত ও রাঁচী জেলার সীমার কাছে। একটি হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পুনরাবিষ্কারের আশায় ডানলপ ইণ্ডিয়ার বিমলেন্দুকুমারের সঙ্গে দেউলটাঁড়ের পথে যাত্রা সুরু করলাম। গ্রামটির কাছাকাছি এসে শিখ গুরুদ্বারের মত একটি সৌধ চোখে পড়ল। এর শীর্ষদেশটি মনে হল এল্যুমিনিয়ম পেণ্ট করা। সেখানে প্রতিফলিত সূর্যকিরণ বহুদূর থেকেই সৌধটির প্রতি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আমাদের দেউলটাঁড়ে আসার উদ্দেশ্য এই ধর্মস্থানটি দেখা নয়। সুতরাং ঐ গ্রামের দিকে যেতে যেতে যাদের সঙ্গে দেখা হল তাদের কাছে প্রাচীন মন্দিরটি কোন দিকে জানতে চাইলে একজন আমাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন পূর্ব দৃষ্ট সেই সৌধটির

কাছে। হঠাৎ চোখের সামনে থেকে শিখ ধর্মস্থানটি অন্তর্হিত হয়ে সেখানে আবির্ভূত হল একটি জৈন মন্দির। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, নতুন একটি মন্দির পুনরাবিষ্কারের আকস্মিকতায় নয়, একটি প্রাচীন কীর্তির বীভৎস বিকৃতিকে চাক্ষুষ করতে বাধ্য হয়ে।

দেউলটাঁড়ের অধিবাসীরা জানালেন সেখানকার অধিকাংশ লোকই শরাক সম্প্রদায়ভুক্ত। অনেকে মনে করেন এদের পূর্বপুরুষেরা জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং তাদের বংশধরদের স্বধর্মে দৃঢ়ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে গুজরাট রাজস্থানের কিছু বিত্তবান জৈন এদের নতুন মন্দির নির্মাণ ও পুরাতন মন্দির সংস্কার করতে অর্থ সাহায্য করতে শুরু করেন। বহুদিনের অবহেলায় জীর্ণ দেউলটাঁড়ের মন্দিরটিও এঁদের অর্থানুকূল্যে নব কলেবর ধারণ করে। প্রাচীন স্থাপত্য রীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত মিস্ত্রীরা প্রথমেই এর অলঙ্করণের যা কিছু অবশিষ্ট তা সবই বাহুল্য বোধে নষ্ট করে ফেলে এবং সমস্ত মন্দিরটিকে বালি-সিমেন্টের প্লাষ্টারে ঢেকে দেয়। ভিতরেও লহড়া ছন্দের গর্ভগৃহকে অনুরূপ প্লাষ্টারে আবৃত করে একটি ডোমের আভাস আনার চেষ্টা করা হয়। সংস্কার কার্যকে সম্পূর্ণ
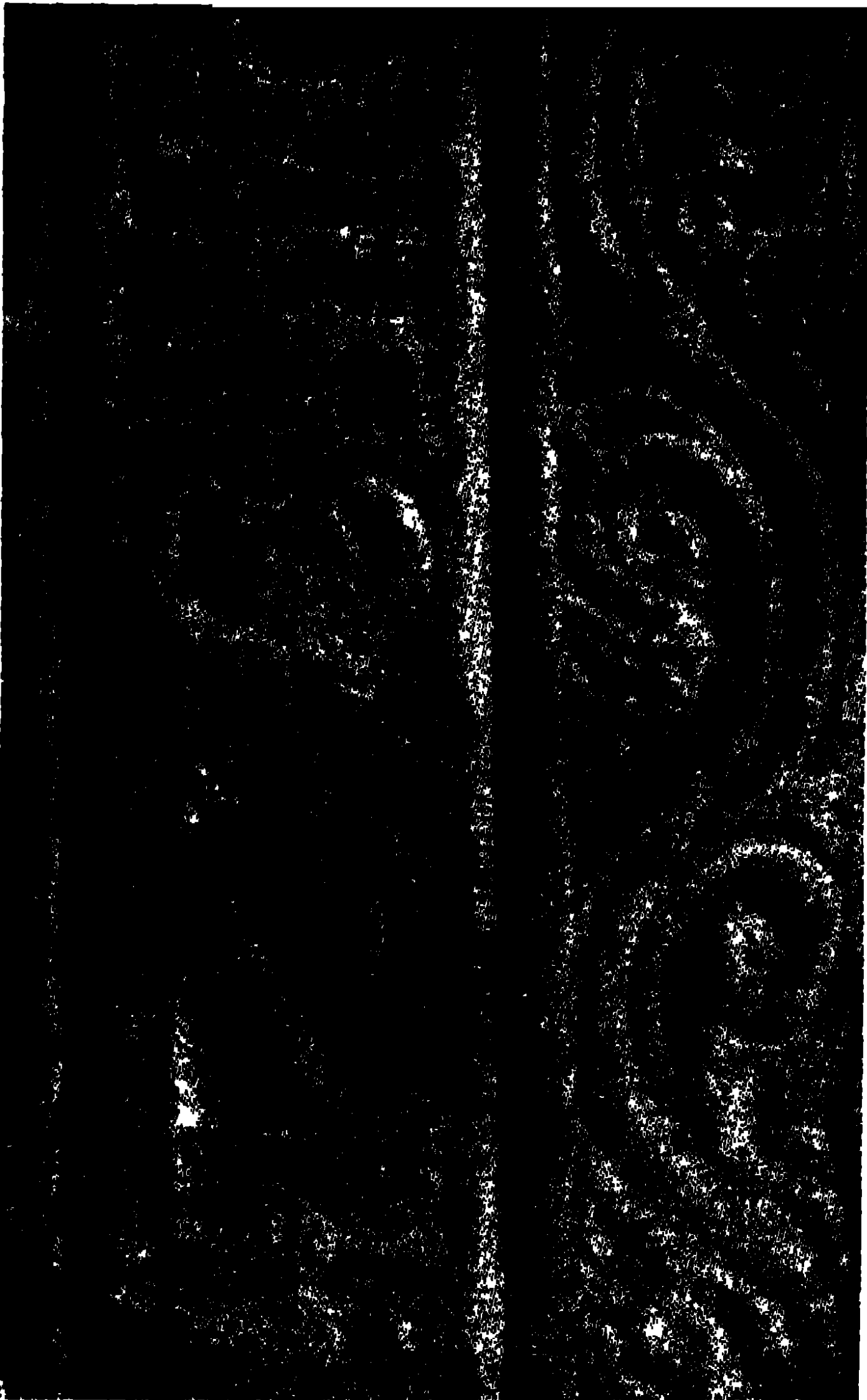
প্রাচীন মন্দিরের পাথরের চৌকাঠের ভাস্কর্য
চিত্র: লেখক

করা হল শিখরের উপর পশ্চিমী কায়দায় একটি গম্বুজ বসিয়ে। চিরকালের মত আমরা হারালাম প্রাচীন শিল্পী-স্থপতিদের উৎকর্ষতার এক অমূল্য নিদর্শন।

পুরাকীর্তির গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা, পুরাকীর্তি সংরক্ষণে সরকারী অবহেলা এবং পুরাকীর্তি সমূহের বর্তমান অবস্থার আশু উন্নতির জন্য জনমত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সংবাদপত্র ও জননেতাদের অনাগ্রহ দেউলটাঁড়ের ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলবে। ভবিষ্যৎ ভারতের বনিয়াদ কি তবে মৃত অতীতের সমাধির ওপরই তৈরী হবে?

কৌশিকী নবপর্যায়, ২ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, শারদীয়, ১৩৭৯ হতে পুনর্মুদ্রিত।

জৈন দেবী সরস্বতী

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শাসনদেবীদের নামে উভয় সম্প্রদায়ে অতি অল্পই সাদৃশ্য আছে। আবার যেখানে নাম সাদৃশ্য আছে, সেখানে অনেক সময় ধর্ম্ম বা রূপ সাদৃশ্য নাই।

বিদ্যাদেবীগণের মস্তকের উপর মন্দিরের আকারে উঁচু মুকুট। সকলেই ললিত মুদ্রাসনে অসীনা, একটী পা নীচু করিয়া রাখিয়াছেন, আর একটী পা সম্মুখের দিকে গুটান। সকলেরই দক্ষিণহস্ত বক্ষোপরি বরদমুদ্রায় স্থাপিত। বামহস্ত মোড়া এবং উঁচুতে তোলা।

ষোড়শ বিদ্যাদেবী

বিদ্যাদেবীর নাম	অপর নাম	লাঞ্ছন	হস্তের সংখ্যা
১। রোহিণী	অজিতবলা (শ্বে)	চৌকি	চার
২। প্রজ্ঞপ্তী	দুরীতারী	হংস	ছয়
৩। বজ্রশৃঙ্খলা	মনোবেগা (দি)	হংস	চার
৪। কুলিশাঙ্কুশা	মনোগুপ্তী (দি) শ্যামা (শ্বে)	অশ্ব	চার
৫। চক্রেশ্বরী		গরুড়	ষোল
৬। পুরুষদত্তা		হস্তী	চার
৭। কালী	শান্তা (শ্বে)	নন্দী বা বৃষ	চার
৮। মহাকালী	অজিতা (দি) সুতারকা (শ্বে)	”	চার
৯। গৌরী	মানবী (শ্বে)	পদতলে বৃষ	চার
১০। গান্ধারী	চণ্ডা (শ্বে)	”	চার

রোহিণী

প্রজ্ঞপ্তী

বজ্রশৃঙ্খলা

কুলিশাঙ্কুশা

চক্রেশ্বরী

পুরুষদত্তা

কালী

মহাকালী

গৌরী

গান্ধারী

সর্ব্বাস্ত্র মহাজ্বালা

মানবী

বৈরাট্যা

অচ্ছুপ্তা

মানসী

মহামানসী

১১।	সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা	জ্বালামালিনী (দি) ভৃকুটী (শ্বে)	বৃষ	আট
১২।	মানবী	অশোকা (শ্বে)	"	চার
১৩।	বৈরাট্যা	বৈরোটী	সর্প	চার
১৪।	অচ্ছুপ্তা	অনন্তমতী অঙ্কুশা (শ্বে)	হংস	চার
১৫।	মানসী	কন্দর্পা (শ্বে)	সিংহ	চার
১৬।	মহামানসী	নির্বাণী	ময়ূর	চার

সরস্বতী জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জৈনমন্দিরে ও জৈন গৃহস্থের বাড়ীতে সরস্বতী-মূর্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনগণ সরস্বতীকে শাসনদেবীরূপেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। প্রোলের অনুমকোণ্ড লিপিতে[৪] শাসনদেবীরূপে সরস্বতীর উল্লেখ আছে।

উত্তরদিকের লিপিতে

পঙ্‌ক্তি

৫০ অতিশয়-জৈনধর্ম্ম-সময়োচিত

৫১ শাসনদেবী ভারতী সতি শসি (শ) বিম্ব-ব (ক্ত্র)-

৫২ দশনচ্ছদে শুদ্ধ-সুবর্ণ (র্ণ) কুম্ভ-সম্‌ভ-ত-

৫৩ সুবর্ণ (র্ণ)-পীবর-[প] য়োধরি মৈল [ময়া]-

৫৪ [ক] মাম্বিকা। সু-[ত]-ভদমাত্য-[বে] ত [হ্রি]-

৫৫ দয়েশ্বরি নিশ্চল লক্ষ্মী ভাবিস লু [॥]

অনুবাদ

[বা] কমাম্বিকার পুত্র অমাত্য বেতের হৃদয়েশ্বরী ছিলেন মৈলম, ইঁহার বদন চন্দ্রের ন্যায় [সুন্দর], ইঁহার ওষ্ঠ বিম্বের ন্যায় [রক্তবর্ণ], ইঁহার তনুর বর্ণ সুন্দর বলিয়া ও ইঁহার পীবর পয়োধর বিশুদ্ধ সুবর্ণকুম্ভ বলিয়া প্রশংসিত এবং ইনি

[৪] *Epigraphia Indica*, Vol IX, P. 257.

[যেন স্বয়ং] জৈনধর্মমতোচিত শাসনদেবী ভারতী ছিলেন এবং নিশ্চিতই অচঞ্চল লক্ষ্মীদেবী ছিলেন।

জৈনগণ জীবের চারিটি বিভাগ করিয়া থাকেন—মনুষ্য, তির্য্যক্ দেব ও নারকী। এই দেবযোনি চারিভাগে বিভক্ত—ভবনবাসী, ব্যন্তর, জ্যোতিষ ও বৈমানিক।

ব্যন্তর দেবতাদিগের মধ্যে চারিটি গন্ধর্ব্বমহাদেব, তন্মধ্যে একটী মহাদেবের নাম গীতযশ; ইঁহার দুইজন মহাদেবী—স্বরা ও সরস্বতী। এটী শ্বেতাম্বর মত।

দিগম্বর দিগের মতে চারিজন গান্ধর্ব্বমহাদেবের মধ্যে একজনের নাম গীতরতীন্দ্র বা গীতরতি। ইঁহার দুইজন মহাদেবী, নাম স্বরসেনা ও সরস্বতী।[৫]

সরস্বতী গন্ধর্বেন্দ্র গীতরতির অগ্রমহিষী।

আমাদের নিত্য কর্মপদ্ধতির মত শ্বেতাম্বরদের একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ আছে, নাম—রত্নসাগর। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সরস্বতীর একটী ধ্যান আছে। ধ্যানটী এই—

শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ। শ্রীসারদায়ৈ নমঃ।
সরস্বতি মহাভাগে। বরদে কামরূপিণি।
বিশ্বরূপি বিশালাক্ষি। দে বিদ্যে পরমেশ্বরি।
সরস্বতী ময়া দৃষ্টা। বীণাপুস্তক ধারিণী।
হংসবাহনসংযুক্তা। বিদ্যাদান-বরপ্রদা।

সরস্বতীর আর একটী ধ্যান তপগচ্ছীয় শ্রাবক প্রতিক্রমণ সূত্রান্তর্গত 'কল্যাণকন্দং' স্তোত্রের শেষে আছে। ধ্যানটী এই—

কুন্দিন্দু গোক্খীর-তুষারবন্না।
সরোজহত্থা কমলে নিসন্না ॥
বাএসিরী পুত্থয়বগ্গহত্থা।
সুহায় সা অম্হসয়াপসত্থা ॥

৫ W. Kirfel—*Die Kosmographie der Inder.*

ইহার সংস্কৃতচ্ছায়া-

কুন্দেন্দু গোক্ষীর তুষারবর্ণা।
সরোজহস্তা কমলে নিষণ্ণা॥
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা।
সুখায় সা নঃ সদা প্রশস্তা॥

ভক্তামরের মন্ত্রের মধ্যে সরস্বতীর একটী মন্ত্রও পাওয়া যায়। মন্ত্রটী এইরূপ :

ওঁ হ্রীং শ্রাং শ্রীং শ্রুং হং সং থ থ থঃ ট টঃ।
সরস্বতী বিদ্যাপ্রসাদং কুরু কুরু স্বাহা॥

দ্বাদশ শতকের পরে জৈনগণ সরস্বতীর বহু স্তোত্র, মন্ত্র, অষ্টক রচনা করেন। জৈন টীকাকারগণের মধ্যে অনেকে সরস্বতীর আরাধনাও করিয়াছেন। স্থানাঙ্গ সূত্রের টীকায়[৬] আছে—

যস্যাঃ সংস্মৃতিমাত্রাদ্ ভবন্তি মতয়ঃ সুদৃষ্ট পরমার্থাঃ।
বাচশ্চ বোধবিকলা সা জয়তু সরস্বতী দেবী।।

পঞ্চকল্প ভাষ্যও[৭] লিখিয়াছে—

সব্বং সুয়সমূহমতী বামকরে পহিয়পোত্থয়া দেবী।
অব্বককুহওী সহিয়া দেন্ত অবিগ্ঘং মমং নাণং॥

শ্রীরত্নসার ভাগ বীজো[৮] নামক গ্রন্থে সরস্বতী স্তোত্রে বিদ্যাদেবীর ষোলটি নামের উল্লেখ আছে। স্তোত্রটি ব্যকরণ দুষ্ট হইলেও উপভোগ্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

অথ সরস্বতীস্তোত্রং লিখ্যতে

নমস্তে সারদাদেবি! কাশ্মীর পুরবাসিনি।
ত্বামহং প্রথমে নাথে। বিদ্যাদানং প্রদেহি মে॥ ১
প্রথমং ভারতী নামং। দ্বিতীয়ং সরস্বতী।
তৃতীয়ং সারদাদেবী। চতুর্থং হংসগামিনী॥ ২

৬ ষোড়শ প্রকরণ ১ বি বি ৪ ১১ উ।

৭ কল্প ৫।

৮ পৃষ্ঠা ৪৮০, ৪৮১ [১৯২৩ বোম্বাই হইতে হীরাচাঁদজী কর্তৃক সংকলিত]

পঞ্চমং বিদুষাং মাতা। ষষ্ঠং বাগেশ্বরী তথা।
কুমারী সপ্তমং প্রোক্তং। অষ্টমং ব্রহ্মচারিণী ॥ ৩
নবমং ত্রিপুরাদেবী। দশমং ব্রাহ্মী তথা।
একাদশং তু ব্রাহ্মণী। দ্বাদশং ব্রহ্মবাদিনী ॥ ৪
বাণী ত্রয়োদশং নামং। ভাষাচৈব চতুর্দশং।
পঞ্চদশং শ্রুতদেবী। ষোড়শং কৌণী গদ্যতে ॥ ৫
এতানি সুধানামানি। প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
তস্য সংতোষ্যতে দেবী। সারদাবরদায়িনী ॥ ৬
যা কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা
নিঃশেষজাড্যাপহা ॥ ৭
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন। কাব্যং কুর্বন্তি মানবাঃ।
তস্মাৎ নিশ্চলভাবেন। পূজনীয়া সরস্বতী ॥ ৮
সরস্বতীমন্ত্রদৃষ্টা। দেবী কমললোচনা।
হংসযান সমারূঢ়া। বীণাপুস্তকধারিণী ॥ ৯
যা দেবী স্তুয়সে নিত্যং বিবুধে বেদপারগে।
সা মাং ভবতু জিহ্বাগ্রে। ব্রহ্মরূপা সরস্বতী ॥ ১০

উক্ত গ্রন্থ [১] হইতে সরস্বতীর আর একটি স্তোত্র দেওয়া হইল-

অথ সরস্বতীস্তোত্রং লিখ্যতে

সরস্বতি নমস্যামি। চেতনাং হৃদিসংস্থিতাং।
কণ্ঠস্থাং পদ্মযোনিঞ্চ। হ্রীং হ্রীংকারী শুভপ্রিয়াং ॥ ১
ঐ ঐ মন্ত্র প্রদাং দাং। শুভাগং শোভনপ্রিয়াং।
পদ্মোপস্থাং কুণ্ডলিনী। শুক্লবস্ত্রাং মনোহরাং ॥ ২
আদিত্যমণ্ডলস্থাঞ্চ। প্রণমামি জনপ্রিয়াং।
ইতি সম্যক স্তুতাদেবী। বাগীশেন মহাত্মনা ॥ ৩
আত্মানং দর্শয়ামাস। সূর্য্যকোটিসমপ্রভং।
বরং বৃণীষ ভদ্রস্তে। যৎ তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪
বরদায় যদি মে দেবী। দিব্যজ্ঞানং প্রযচ্ছ মে।
দস্তত্তে নির্ম্মলং জ্ঞানং। কুবুদ্ধিধ্বংসকারিণং ॥ ৫

১ পৃঃ ৪৮১।

স্তোত্রেণানেন যে ভক্ত্যা। মাং স্তুবন্তি যে নরাঃ।
তে লভন্তে পরং জ্ঞানং। মমতুল্যপরাক্রমং ॥ ৬
ত্রিসন্ধ্যাং সর্ব্বতো ভক্ত্যা। য ইদং পঠ্যতে সদা।
তস্য কণ্ঠে সদা বাসঃ। করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭

কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথিতেও সরস্বতী স্তোত্রাদি আছে। স্থানাভাব বশতঃ দেওয়া হইল না। তবে একখানি জীর্ণ পুঁথি হইতে একটি "সরস্বত্যাষ্টকম্" নিম্নে প্রদত্ত হইল। পুঁথিখানি শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের মূল্যবান পুস্তকাগারে রক্ষিত।

সরস্বত্যাষ্টকম্

কর্পূরকুন্দরজনীকরভাস্বরাঙ্গী।
চং চৎসারোরুহ মনোহর লোচনাঙ্গী ॥
নিত্যং স্মরামি নতদেবনরেন্দ্রনাঙ্গীং।
সত্রত্ন কুণ্ডল বিরাজিত গল্ল ভামাং ॥ ১

বীণা সুশোভিতকরাং সুভস প্রধানাং।
তাং ভারতীং হিতকরাং বরহংসযানাং ॥
অজ্ঞান তামসহরাং ভজনষ্টদস্তাং।
স জ্ঞানস মুখরনির্জিত চ চন্দ্রশোভাং ॥ ২

...মৌক্তিক প্রবরহার বিরাজমানাং।
সম্যক্ নমামি সরচামরবীজ্যমানাং ॥
মঞ্জীর চারুরজ শোভিত পাদযুগ্মাং।
তাং দেবতাং সুতনুভাং বরহস্ত পদ্মাং ॥ ৩

পীযূষ সংভৃতকমণ্ডলধারিণী তাং।
সেবে সুপক নবদামিম বীজদংতা ॥
অত্যুজ্জ্বল প্রবর কঙ্কণ যুগ্মযুক্তাং।
বিদ্যাধনং প্রদধতীং মলরোগযুক্তাং ॥ ৪

সংকেলিপল্লব সুকোমলতার হস্তাং।
লাবণ্যকোলিলহরীং বিশদাসয়াস্তাং॥
ভব্যোজনো নমতি কোনরুচাপবিত্রাং।
সম্ভির্ভূতাং বিবিধমুবাবিলয়চ্চারিত্রঃ॥ ৫

ওঁং হ্রীং শ্রিং ক্লীং ব্লুং পূর্ব্ব মং হং পশ্চাদ্বতঃ।
সকল হ্রীং ভত ঐঁ চ ব শ॥
তস্মায়মোসৎকৃত শেষ কলা নিদানং।
মন্ত্রং মনোহরমিনং মমভাবয়ানাং॥ ৬

যে নির্ম্মলেন মনসা বরলক্ষজাপং।
মন্ত্রস্য হে প্রকুরুতেদমনেস্য পাপং॥
সদ্ব্রহ্মচর্য্য সহিতঃ শুভপঃ।
স দানাতূর্ণং ভবৎ সকবিতা ভুবনে প্রধানঃ॥ ৭

লক্ষং জপেত্তদানুপূর্ণকৃতে বিধেয়ং।
হোম দশাস'হতং ভুবনেস্পজেয়ং॥
ইত্যষ্টক পঠতি যো মনসা বিশুদ্ধঃ।
স্যাৎ সাধুকীর্ত্তিনিলয়ঃ সুধাসিন্ধুবুদ্ধঃ॥ ৮
ইতি শ্রীসরস্বত্যষ্টকং সমাপ্তম্

সরস্বতী গচ্ছ

জৈনাচার্য অর্হদ্বল্লী দ্বিতীয় ভাদ্রবাহুর শিষ্য ছিলেন। ইনি অষ্টাঙ্গ নিমিত্ত জ্ঞান বেশ ভালরকম জানিতেন। অঙ্গ পূর্ব্বদেশের একাদশ সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তাঁহার আরও দুইটি নাম ছিল—গুপ্তিগুপ্ত এবং বিশাখাচার্য্য। ইনি বিক্রম সংবতের ২৬ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ের মুনিদের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। মুনিরা তাঁহার শাসন মানিয়া চলিতেন। প্রত্যেক

পাঁচ বৎসর অন্তর তিনি মুনিসঙ্ঘকে একত্র করিতেন। একবার তিনি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করেন—সকল যতি আসিয়াছেন কিনা। তাহা শুনিয়া মুনিগণ উত্তর করেন—সকলে নিজের নিজের সঙ্ঘের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। আচার্য্য বলী তখন বুঝিলেন যে মুনিদের মধ্যে দল পাকাইবার চেষ্টা হইয়াছে। তাই তাঁহাদের এই 'পক্ষবুদ্ধি'। এখন ইঁহারা দল বাঁধিবেন এবং পক্ষপাত হেতুবশতঃ সঙ্ঘ, গণ ও গচ্ছের পক্ষ গ্রহণ করিবেন। সমতা-বুদ্ধি ও উদাসীনতা তাঁহাদের মধ্যে থাকা দুষ্কর হইবে। এই সমস্ত ভাবিয়া তিনি চারিটি সঙ্ঘ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। বলীকর্তৃক ব্যবস্থিত চারিটী সঙ্ঘ নিম্নলিখিতরূপে স্থাপিত হয়—

১। মুনিগণের মধ্যে মাঘ নামক এক আচার্য্য মূল সঙ্ঘ স্থাপন করেন; তিনি বৃক্ষমূলে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সঙ্ঘের নাম 'মূলসঙ্ঘ' হয়। আর সেই বৃক্ষের নাম ছিল নন্দী, তাই এই সঙ্ঘের আর একটি নাম 'নন্দী-সঙ্ঘ'। নন্দী সঙ্ঘে আবার আম্নায়, গচ্ছ ও গণভেদ আছে। আম্নায়ের নাম নন্দ্যাম্নায়, গচ্ছের নাম সরস্বতী গচ্ছ বা পারিজাত গচ্ছ এবং গণের নাম বলাৎকারগণ। এই সঙ্ঘের আচার্য্যের উপাধি নন্দী, চন্দ্র, কীর্ত্তি ও ভূষণ। এই সঙ্ঘের প্রথম প্রবর্ত্তকের নাম আচার্য্য মাঘনন্দী।

২। এই সংঘের প্রবর্ত্তনকারী জিনসেন তৃণতলে বর্ষা কাটাইয়া ছিলেন বলিয়া সেই সঙ্ঘের নাম হইল 'সেনসঙ্ঘ' বা 'বৃষভ সঙ্ঘ'। সেন সঙ্ঘে পুষ্কর-গচ্ছ ও পুরস্থগণ। ইহার আচার্য্যের উপাধি চারিটি—রাজ, বীর, ভদ্র ও সেন।

৩। এই সঙ্ঘের প্রবর্ত্তক সিংহের গুহায় বর্ষাত্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া এই সঙ্ঘের নাম হয় 'সিংহ সঙ্ঘ'। এই সঙ্ঘে চন্দ্রকপাট গচ্ছ ও কেনুর গণ। আচার্যের উপাধি—সিংহ, কুম্ভ, আস্রব ও সাগর।

৪। দেবত্তা নামক বেশ্যার নগরে এই সঙ্ঘের প্রবর্ত্তক বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্থাপিত সঙ্ঘের নাম 'দেবসঙ্ঘ'। এই সঙ্ঘে পুস্তকগচ্ছ ও দেশীয় গণ। উপাধি—দেব, দত্ত, নাগ ওতুঙ্গ

জৈনগণ বলিয়া থাকেন, গিরনার (উজ্জয়ন্ত গিরি) পর্ব্বতে পাষাণনির্ম্মিত দেবী সরস্বতীর মূর্ত্তি ছিল। আচার্য্য পদ্মনন্দী সরস্বতীর সহিত তাঁহার বিপক্ষ-বাদীদিগের তর্ক করাইয়াছিলেন। তখন হইতে মূল সঙ্ঘে সরস্বতী গচ্ছের

উৎপত্তি। আচার্য্য শুভচন্দ্র পাণ্ডবপুরাণের মঙ্গলাচরণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মঙ্গলাচরণের উক্তি এইরূপ—

কুন্দকুন্দোগ্রণী যেন জয়ন্তগিরিমস্তকে।
সোঽবদাদ্‌বাদিতা ব্রাহ্মী পাষাণঘটিতা কলৌ॥

নন্দী সঙ্ঘের পট্টাবলী ও শুভচন্দ্রের গুর্বাবলীতে এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত বচনটি দেখিতে পাওয়া যায়—

পদ্মনন্দি গুরুর্জাতো বলাৎকার গণাগ্রণী।
পাষাণ ঘটিতা যেন বাদিতা শ্রীসরস্বতী॥
উজ্জয়ন্তগিরৌগচ্ছঃ স্বচ্ছঃ সারস্বতোঽভবৎ।
অতস্তস্মৈ মুনীন্দ্রায় নমস্তে পদ্মনন্দিনে॥

পট্টাবলীর উক্তি এইরূপ—

শ্রীত্রৈলোক্যাধিপং নত্বা স্মৃত্বা সদ্‌গুরু ভারতীম্।
বক্ষ্যে পট্টাবলীং রম্যাং মূলসঙ্ঘগণাধিপাম্॥১
শ্রীমূলসঙ্ঘ প্রবরে নন্দ্যাম্নায়ে মনোহরে।
বলাৎকারগণোত্তংসে গচ্ছে সারস্বতীয়কে॥২
কুন্দকুন্দান্বয়ে শ্রেষ্ঠং উৎপন্নং শ্রীগণাধিপম্।
তমেবাত্র প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং সজ্জনা জনাঃ।৩

সরস্বতী, প্রথম খণ্ড (দেবতত্ত্ব গ্রন্থমালা-১), ১৩৪০, পৃঃ ১০৬-১৪।

মহাবীর বলেছিলেন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়

জরা মরণ রূপ সংসার প্রবাহে
ভাসমান জীবের পক্ষে
ধর্মই একমাত্র
দ্বীপ, গতি, শরণ ও উত্তম আশ্রয়।

যারা ধর্ম পরিত্যাগ করে
অধর্ম আশ্রয় করে
তারা মূর্খের মতো কাজ করে
ও নরকে উৎপন্ন হয়।

যারা জ্ঞানী
তারা অধর্ম পরিত্যাগ করে
ধর্ম আশ্রয় করে
ও স্বর্গে গমন করে।

যে পথের ওপর
গৃহ নির্মাণ করে
সে অনিশ্চিত কার্য করে,
গন্তব্যস্থানে গৃহ নির্মাণ কর।

তিনজন বণিক
মূলধন সহ
বাণিজ্য করতে যায়,

একজন উপার্জন করে
একজন মূল ধন সহ ফিরে আসে,

তৃতীয় সর্বস্বান্ত হয়ে
মূলধন পর্যন্ত খুইয়ে আসে।
জীবন হতে এই উপমা—
ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ জান।

মনুষ্য জীবনই মূল ধন,
উপার্জন স্বর্গ,
মূলধন খোয়ানো
নারক বা তীর্যক যোনিতে
উৎপন্ন হওয়া।

শকট চালক
রাজবর্ত্ম পরিত্যাগ করে
বিপথে গিয়ে
ভগ্ন চাকার জন্য যেন পরিতাপ করে,
সেও সেইরূপ পরিতাপ করে।

যে দিন ও রাত্রি গত হয়
তা প্রত্যাবর্তন করে না,
যে অধর্মাচরণ করে
তার পক্ষে তা ফলহীন হয়।

যে দিন ও রাত্রি গত হয়
তা প্রত্যাবর্তন করে না,

যে ধর্মে অবস্থান করে
তার পক্ষে তা ফলপ্রসূ হয়।

তাই যতদিন না জরা আক্রমণ করে,
ব্যাধি প্রপীড়িত
ও ইন্দ্রিয় গ্রাম শিথিল হয়,
তত দিন ধর্মাচরণ কর।

সুখদায়ী কাম ভোগ
পরিত্যাগ করে
যখন তুমি মৃত্যু প্রাপ্ত হবে
তখন একমাত্র ধর্মই
তোমায় পরিত্যাগ করবে না
আর সব পরিত্যাগ করে যাবে।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়

মস্তক মুণ্ডন করলেই
শ্রমণ হয় না,
ওম উচ্চারণ করলেই ব্রাহ্মণ,
বনে বাস করলেই মুনি হয় না,
বল্কল ধারণ করলেই তাপস।

ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব,
বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব
জন্মজাত নয়,
কর্মগত।

আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি
যে জীব সমুদায়কে জানে,
তা স্থাবরই হোক বা ত্রস,
এবং কায়মনোবাক্যে
তাদের হিংসা করে না।

আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি
যে ক্রোধে বা পরিহাসে,
লোভে বা ভয়ে,
মিথ্যা বলে না।

আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি
যে ছোট বা বড়,
ত্রস বা স্থাবর বস্তু,
না দিলে গ্রহণ করে না।

আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি
যে মোহশূন্য ও অলোলুপ,
অনাগার ও অকিঞ্চন
ও যে গৃহস্থের সংসর্গ করে না।

আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি
যে নব জাতকের আবির্ভাবে
আনন্দিত হয় না
বা মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত
এবং আর্যবচনে যার আনন্দ।

আমি তাকেই ব্রহ্মণ বলি
যে রাগদ্বেষহীন ও ভয়শূন্য

ও পরীক্ষিত বা অগ্নিদগ্ধ
স্বর্ণের মত দীপ্যমান।

আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি
যে জলজাত কমলের মতো
সংসার সুখভোগে অলিপ্ত।

যাদের এই গুণ রয়েছে
তারাই ব্রাহ্মণ ও সর্বোত্তম,
সংসারে তারা নিজেদের
এবং অন্যদেরও রক্ষা করতে সমর্থ।

প্রাণীমাত্রকে আমি ক্ষমা করি।
প্রাণীমাত্রও আমায় ক্ষমা করুক,
সর্বভূতে আমার মৈত্রী,
বৈর নেই আমার কারু প্রতি।

অতিমুক্ত

১ম দৃশ্য

[পোলাসপুরের রাজোদ্যান। বালক বালিকারা খেলা করছে। উদ্যান সংলগ্ন পথ দিয়ে মহাবীর-শিষ্য গণধর গৌতম ভিক্ষাচর্যা নিয়ে ফিরছেন। গৌতমের সৌম্য শান্ত মূর্তিতে আকৃষ্ট হয়ে রাজপুত্র অতিমুক্ত খেলা ফেলে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে]

অতিমুক্ত : কি অদ্ভুত সৌম্য শান্ত মূর্তি। এমন মানুষ ত আমি দেখিনি। যাই ওঁর কাছে যাই। ওঁকে গিয়ে জিগ্যেস করি উনি কে ?
[নিকটে গিয়ে] আপনি কে ?

গৌতম : আমি ? আমি শ্রমণ।

অতিমুক্ত : শ্রমণ ?

গৌতম : হাঁ। কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

অতিমুক্ত : না-না ! আশ্চর্য হবার কিছু নয়। কিন্তু…আপনি কি করেন ?

গৌতম : কিছু করি না।

অতিমুক্ত : কিছু করেন না ত আপনার সংসার চলে কি করে ?

গৌতম : সংসার ? সংসার আমার নেই। আমি ঘর ছেড়ে এসেছি।

অতিমুক্ত : বুঝেছি। কিন্তু নিজের পেট…

গৌতম : চলে কি করে ? ভিক্ষে করে।

অতিমুক্ত : তবেত আপনার অগণ্ড অবসর। খেলাধুলো করেন ?

গৌতম : খেলাধুলো ? তুমি আশ্চর্য বালক। তোমার কি নাম ?

অতিমুক্ত : আমার নাম অতিমুক্ত। আমি রাজপুত্র।

গৌতম : বাঃ কি সুন্দর তোমার নাম। তুমি সত্যই অতিমুক্ত।
[নিজের ভাবে] তোমার মধ্যে এক মহান আত্মার জাগরণ দেখতে পাচ্ছি অতিমুক্ত।

অতিমুক্ত : খেলাধুলো যদি না করেন তবে আপনার সময় কাটে কি করে ?

গৌতম : সময় ? এই ধর আত্মচিন্তা করে, শাস্ত্র পড়ে ও অন্যকে উপদেশ দিয়ে।

অতিমুক্ত : কিভাবে উপদেশ দেন ? কিভাবে আত্মচিন্তা করেন ?

গৌতম : [একটু হেসে] খুব গম্ভীর হয়ে উপদেশ দেই—সৎ হও, চরিত্রবান হও, এই সব। আর আত্মচিন্তা—বসে বসে ভাবি আমি কে ? কোথা হতে এসেছি ? কোথায় যাব ? কিভাবে মুক্ত হব ?

অতিমুক্ত : আপনাকে মুক্তির ভাবনা ভাবতে হবে না। আমি রাজপুত্র, শিগ্‌গির বলুন, কে আপনাকে ধরে রেখেছে। বাবাকে বলে এখুনি আপনাকে মুক্ত করিয়ে দেব।

গৌতম : না তা নয়, অতিমুক্ত। আর কেউ নয়, আমার বাসনাই আমায় ধরে রেখেছে। সেই বাসনা হতে আমাকে নিজেকেই মুক্ত হতে হবে।

অতিমুক্ত : আর আমায় ?

গৌতম : হ্যাঁ তোমাকেও। যেদিন তোমার বাসনা হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে সেদিন তুমিও মুক্ত হবে।

অতিমুক্ত : তাই বুঝি। আপনার কথা আমার খুব ভালো লাগছে, শ্রমণ। কিন্তু এর আগে আপনাকে কখনো দেখিনি।

গৌতম : কি করে দেখবে ? এখানেত ছিলাম না। আমরা এক জায়গায় থাকি না। কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আজ এখানে ত কাল সেখানে।

অতিমুক্ত : কি সুন্দর আপনার জীবন। কত নূতন নূতন দেশ আপনি দেখতে পান, কত বিচিত্র মানুষ।

গৌতম : তা পাই। অঙ্গ, মগধ ও বিহারের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আমরা যাইনি। কত বিচিত্র মানুষ, কত বিচিত্র জীবন যাত্রা ! ...অতিমুক্ত, তোমর নামটি ভারি মিষ্টি। কে দিয়েছে তোমায় এই নাম ?

অতিমুক্ত : আমার বাবা।

গৌতম : তোমার উপযুক্ত নামই দিয়েছেন তোমার বাবা। তুমি ভারী সরল। তোমার মধ্যে কোথাও কোন জট বা গ্রন্থি নেই। তুমি সত্যই অতিমুক্ত। কোথাও তোমার হারিয়ে যাবার মানা নেই।

অতিমুক্ত : আছে শ্রমণ আছে। আমার এই উদ্যানের বাইরে যাওয়া মানা। আমি রাজপুত্র কিনা তাই। কিন্তু ইচ্ছে করে শ্রমণ, আপনি যে পথ দিয়ে এসেছেন সেই পথ ধরে আপনার সঙ্গে আমি চলে যাই। আমার কেমন যেন মনে হয় এই পথ ধরে আমি যেন গেছি অনেকবার। জোয়ারি খেতের পাশ দিয়ে, ঘন বনের ধার দিয়ে দূরে যেখানে নীল পাহাড় কেবলি ঝিল্‌মিল ঝিল্‌মিল করে

গৌতম : তুমি ঠিক বলছ অতিমুক্ত। এই পথ ধরে তুমি নিশ্চয়ই গেছ অনেক বার। নইলে এমন করে বলতে পারতে না—জোয়ারি খেতের পাশ দিয়ে ঘন বনের ধার দিয়ে দূরে যেখানে নীল পাহাড় কেবলি ঝিলমিল-ঝিলমিল করে।

অতিমুক্ত : ঠিক জানি না শ্রমণ, তবে আমি দেখতে পাচ্ছি আদিগন্ত বিস্তৃত সেই পথ। শুনতে পাচ্ছি বাতাসে বট পাতার মর্মর। দিনের সূর্য মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল যেন। আকাশে ফুটল তারা। জ্যোৎস্নার সে কি পরিপ্লাবন। ধব ধব করছে আকাশ, ধব ধব করছে ঘাট বাট মাঠ। [একটু থেমে] আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যাচ্ছে।...আপনি এখন কোথায় যাবেন শ্রমণ ?

গৌতম : নগর প্রান্তের শ্রীবন উদ্যানে যেখানে আমার আচার্য রয়েছেন।

অতিমুক্ত : আপনার আচার্য ?

গৌতম : হাঁ অতিমুক্ত, আমার আচার্য, আমার গুরু।

অতিমুক্ত : তিনিও কি আপনার মত দেখতে সুন্দর, শান্ত ও সৌম্য ?

গৌতম : আমার চাইতে অনেকগুণ বেশী সুন্দর, শান্ত ও সৌম্য। তাঁর দিকে চাইলে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না।

অতিমুক্ত : তাঁর কি নাম ?

গৌতম : বর্দ্ধমান। তবে আমরা তাঁকে শ্রমণ ভগবান বর্দ্ধমান বলে জানি।

অতিমুক্ত : আপনার কথা শুনে আমার সমস্ত মন তাঁর দিকে ছুটে চলেছে। আপনি কি আমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন ?

গৌতম : কেন নয় ? তুমি যাবে ?

অতিমুক্ত : যাব, শ্রমণ।

গৌতম : কিন্তু তুমি এইমাত্র না বললে, এই স্থানের বাইরে যেতে তোমার মানা।

অতিমুক্ত : মানা। তবে সে মানা আজ মানব না। আপনার যখন সঙ্গ পেয়েছি তখন আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই যাব।

গৌতম : তবে এসো।

[গৌতমকে অনুসরণ করে অতিমুক্ত চলে যাবে, পেছন হতে তার খেলার সঙ্গীরা ডাকবে]

সমবেত কণ্ঠে : অতিমুক্ত ! অতিমুক্ত !

অতিমুক্ত : [পেছন ফিরে] দাঁড়া। আমি এখুনি আসছি।

২য় দৃশ্য

[পোলাসপুরের রাজান্তঃপুর। অতিমুক্তর পিতামাতা কথোপকথন নিরত]

বিজয় : ওগো শুনছ, অতিমুক্ত নাকি এক শ্রমণের সঙ্গে কোথায় চলে গেছে।

শ্রী : কে বলল ?

বিজয় : রাজোদ্যানে ও যাদের সঙ্গে খেলা করছিল তারা। ও কারো নিষেধ শোনে নি। নগর প্রান্তের শ্রীবন উদ্যানে যেখানে ভগবান মহাবীর অবস্থান করছেন সম্ভবতঃ সেখানে গেছে।

শ্রী : তবে কি হবে ? তাকে আনতে লোক পাঠিয়েছ ?

বিজয় : পাঠিয়েছি। তবে ওখানে যে যায় সে ফেরে না।

শ্রী : না না তুমি ওমন অমঙ্গলকর কথা বোলো না।

বিজয় : অমঙ্গলকর নয়, মঙ্গলকরই। তবে আমরা সংসারী মানুষ। মায়ামমতার বন্ধ এই আর কী।

শ্রী : না না ! আমার মন কেমন যেন তলা হয়ে উঠছে। সত্যি যদি ও না ফেরে তবে কি হবে ?

[অতিমুক্তর প্রবেশ]

অতিমুক্ত : মা! মা!

শ্রী : [ব্যাকুল হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে] এই তুই ফিরছিস। কাকে কিছু না বলে একা একা কোথায় চলে গিয়েছিলি। এদিকে আমরা ভেবে মরি।

অতিমুক্ত : মা, আমি নির্গ্রন্থ প্রবচন শুনতে গিয়েছিলাম।

শ্রী : নির্গ্রন্থ প্রবচন?

অতিমুক্ত : হাঁ মা। নির্গ্রন্থ প্রবচন আমার ভালো লেগেছে। নির্গ্রন্থ প্রবচনে আমার শ্রদ্ধা হয়েছে।

শ্রী : বাবা, তুই ধন্য, তুই কৃতকৃত্য, তুই ভাগ্যবান।

অতিমুক্ত : মা, তবে আদেশ দাও আমি ভগবান মহাবীরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রমণ সংঘে প্রবেশ করি।

শ্রী : অতিমুক্ত! এ তুই কি বলছিস। তুই এখন নিতান্তই শিশু। এখন তোর খেলাধুলার বয়স। এই বয়সে কি কে শ্রমণ সংঘে প্রবেশ করে?

অতিমুক্ত : মা, তবে যে ভগবান মহাবীর বললেন, অতিমুক্ত, তুমি মাতা-পিতার আদেশ নিয়ে এসো, আমি তোমায় দীক্ষা দেব।

শ্রী : সে তোর আগ্রহ দেখে। তিনি জানতেন তুই পিতামাতার আদেশও পাবি না। আর তাঁকে তোকে দীক্ষিতও করতে হবে না।

অতিমুক্ত : না মা, তা নয়। তিনি সত্যিই বলেছেন। তুমি আমায় আদেশ দাও।

শ্রী : বাবা, সে আদেশ আমরা তোকে দিতে পারি না। তুই আমাদের একমাত্র সন্তান। তোর বিরহ আমাদের কাছে অসহ। তাই যতদিন আমরা সংসারে আছি, ততদিন সংসারে থাক, জাগতিক সুখভোগ কর। তারপর আমরা যখন থাকব না তখন তোর যা ইচ্ছে হয় করিস।

অতিমুক্ত : মা, এ তুমি কি বলছ! সংসারে জীবন অনিশ্চিত। ভগবান মহাবীরও সে কথাই বললেন প্রবচনে। এ জীবন যেন কুশাগ্রস্থিত

জল বিন্দু। এই আছে, এই নেই। তাছাড়া মা, একথা কি কেউ বলতে পারে কে আগে যাবে কে পরে? তাই তুমি আমায় আদেশ দাও।

শ্রী: বাবা, তোর বয়স কম আর তুই সুখ ভোগে অভ্যস্ত। তোর শরীর কোমল ও কমনীয়। এই বয়সে তাই তুই শ্রমণ ধর্ম পালন করতে পারবি না।

অতিমুক্ত: মা, আমি তোমায় বলছি, তোমার আশীর্বাদে আমি নিশ্চয়ই পারব।

শ্রী: বাবা, শ্রমণদের ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত গ্রীষ্ম, মান অপমান সমান ভাবে সহ্য করতে হয়, তপস্যায় শরীর ক্লিষ্ট করতে হয়। মশা মাছির অত্যাচারে অবিচলিত থাকতে হয়। সে তুই পারবি না।

অতিমুক্ত: মা, সে আমি নিশ্চয়ই পারব। সে বারের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। দাহজ্বরে মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় আমি যখন কাতর ছিলাম তখন তুমি হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলে, অসাধারণ আমার সহ্য শক্তি। সেই অসাধারণ শক্তিতে আমি সে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করব।

শ্রী: বাবা, শ্রমণকে দিনের পর দিন অনাহারে থাকতে হয়। একবেলা না খেয়ে তুই থাকতে পারিস না। কি করে তুই সংযম ধর্ম পালন করবি।

অতিমুক্ত: মা, মানুষ অভ্যাসের দাস। অভ্যাসে কি না হয়। আজ একবেলা না খেয়ে থাকতে পারি না, কিন্তু মনের সঙ্কল্প যদি দৃঢ় হয় তবে একমাস উপবাস করাও শক্ত নয়।

শ্রী: বাবা, আজ তোর কৈশোর। এরপর যখন যৌবন আসবে যখন ইন্দ্রিয়-ভোগে তোর বাসনা উদ্দীপ্ত হবে তখন তোর পক্ষে সংযম ধর্ম পালন করা সম্ভব হবে না।

অতিমুক্ত: মা, সে তুমি ভেবো না। আমি মনকে সুদৃঢ় করে ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা জয় করব।

শ্রী : বাবা, সে কথা অনেকেই বলে। কিন্তু যৌবনে নিজেকে সংযত রাখা অনেক শক্ত। কত কত শক্তিধর বাসনার প্রবাহে তৃণের কুটোর মতো ভেসে গেছে। তাই বলি যৌবনে জাগতিক ভোগের পর ইন্দ্রিয় বাসনা উপশান্ত হলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিস।

অতিমুক্ত : তুমি যা বলছ, তা ঠিকই। কিন্তু যার বাসনা উপশান্ত হয়েছে তার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়।

শ্রী : তোকে আর আমি কি বোঝাব। এই তোর বাবা রয়েছেন, তাঁকে জিগ্যেস কর।

[অতিমুক্ত পিতার দিকে তাকাবে]

বিজয় : বাবা, তোর মা ঠিকই বলেছেন। অসিধারার মতো নিশিত এই পথ। তাই নিজের সামর্থ্যের পরিমাপ করেই এই পথে অগ্রসর হওয়া ভালো। তরুণ বয়সে সংযম পালন বালু ভক্ষণের মতো নীরস। শ্রমণের নিয়ম লোহার মতো দুর্বহ ও গুরুভার। আকাশ গঙ্গা পার হওয়া যেমন কঠিন, খরস্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কাটা যেমন কঠিন, কেবলমাত্র হাতের সাহায্যে সমুদ্র অতিক্রম করা যেমন কঠিন তেমনি তরুণ বয়সে সংযম পালন করাও একান্ত কঠিন।

অতিমুক্ত : বাবা, তুমি যা বললে তা ঠিকই। কিন্তু যে নিজেকে সংযত রাখতে পারে সে সংসার সমুদ্র অতিক্রম করে।

শ্রী : শ্রমণ জীবনে রোগের প্রতিকার না করা রূপ দুঃখ আছে। তুই যদি কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে পড়িস তবে তোকে কে দেখবে?

অতিমুক্ত : মা, বনের পশু পাখীরা যখন রোগাক্রান্ত হয়, তাদের কে দেখে?

বিজয় : অতিমুক্ত, তোর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ করে উর্দ্ধতন সাত পুরুষ যে ধন সঞ্চয় করেছেন সেই ধনরত্ন মণিমাণিক্য আদি ঐশ্বর্যের কি হবে? আমি বলি সেই ঐশ্বর্য উপভোগ করে তুই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।

অতিমুক্ত : বাবা, ধন রত্ন ঐশ্বর্য কিছুই চিরস্থায়ী নয়। চোর তা অপহরণ করতে পারে, আগুন তা দগ্ধ করতে পারে। আত্মীয় স্বজন তা হতে আমায় বঞ্চিত করতে পারে। তাছাড়া একদিনত এ সমস্তই

পরিত্যাগ করে যেতে হবে। তবে এখুনি কেননা এদের পরিত্যাগ করি।

বিজয়: অতিমুক্ত, তোকে যখন কিছুতেই নিরস্ত করতে পারছিনা তখন—কিন্তু আমাদের তোকে নিয়ে অনেক সাধ ছিল। তোকে রাজপদে অভিষিক্ত করে আমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব সে বাসনা কি আমাদের পূর্ণ হবে না? বাবা, তুই অন্তত: একদিনের জন্যও রাজপদ গ্রহণ কর।

শ্রী: অতিমুক্ত তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কেন? তোর বাবা ঠিকই বলেছেন। অন্তত: তুই একদিনের জন্যও রাজা হ'। দেখে আমরা চোখ সার্থক করি।

অতিমুক্ত: মা, তাই যখন তোমাদের ইচ্ছে।

[ক্রমশ:

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যায় মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।
- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা :

  জৈন ভবন

  পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

  ফোন : ৩৩-২৬৫৫

  অথবা

  জৈন সূচনা কেন্দ্র

  ৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধির (১৯৫৬) ৮নং ধারা অনুসারে প্রদত্ত বিবৃতি :

প্রকাশন স্থান : কলিকাতা

প্রকাশের কাল : মাসিক

মুদ্রকের নাম : গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)

ঠিকানা : পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

প্রকাশকের নাম : গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)

ঠিকানা : পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

সম্পাদকের নাম : গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয়)

ঠিকানা : পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

স্বত্বাধিকারীর নাম : জৈন ভবন

ঠিকানা : পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

আমি, গণেশ লালওয়ানী, ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

গণেশ লালওয়ানী
প্রকাশকের স্বাক্ষর

১৫. ৩. ৭৬

WB/NC-120

Vol. III. No. 11 : Sraman : March 1976

Registered with the Registrar of Newspapers for India
under No. R. N. 24582/73

জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১. সাতটি জৈন তীর্থ —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৩.০০

২. অতিমুক্ত —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৪.০০

৩. শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা —শ্রীগণেশ লালওয়ানী ৩.০০

৪. ভগবান মহাবীর ও জৈন ধর্ম —শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা ২.০০

हिन्दी

१ अतिमुक्त – श्री गणेश ललवानी
अनु: श्री राजकुमारी बेंगानी ४.००

२ श्री जिन गुरु गुण सचित्र पुष्पमाला
– श्री कान्तिसागरजी महाराज ५.००

३ श्रीमद् देवचन्द्रकृत अध्यात्मगीता
– श्री केशरीचन्द धूपिया .७५

४ भगवान महावीर (एलबम्) १०.००

English

1. Bhagavati Sutra
(Text with English Translation)
—Sri K. C. Lalwani
Vol. I (Satak 1-2) 40.00
Vol. II (Satak 3-6) 40.00

2. Essence of Jainism —Sri P. C. Samsukha .75
tr. by Sri Ganesh Lalwani

3. Thus Sayeth Our Lord —Sri Ganesh Lalwani 1.50

শ্রমণ

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা
তৃতীয় বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৮২ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদক :
গণেশ লালওয়ানী

শ্রমণ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

বর্তমানে ভাল বাঙলা সাময়িক পত্র নাই বলিলেই চলে। 'শ্রমণ' একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর পত্রিকা। প্রতি সংখ্যাতেই মূল্যবান চিন্তাসমৃদ্ধ রচনা সন্নিবেশিত করিয়া আপনি আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। আপনার এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া আমি নিয়ত লাভবান হইতেছি।

শ্রীহারাধন দত্ত

—সহ-সচিব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা

আপনার পত্রিকার কার্তিক সংখ্যা পাইয়া খুবই আনন্দ লাভ করিলাম। পত্রিকাটি পড়িয়া ইহার বিষয়বস্তু কত উচ্চস্তরের চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এইরূপ ভাবগম্ভীর পত্রিকা খুব কমই প্রকাশিত হয়।

—শ্রীদুলালচন্দ্র দত্ত

ম্যাজিক হোম, সেওড়াফুলি, হুগলী

অত্যন্ত উঁচুমানের এই পত্রিকাটি আমাদের মুগ্ধ করেছে।

—শ্রীপলাশ মিত্র

জীবনানন্দ, কলিকাতা

'শ্রমণ' দেখলাম। এমন সুন্দর ভাবে জৈন ধর্মের মূলকথা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আর কেউ তুলে ধরতে পারেনি এপর্যন্ত যতো পত্রপত্রিকা হাতে এসেছে।

—সলীল দাস

বাগবাহারা, রায়পুর

আপনার সম্পাদিত কয়েক খণ্ড 'শ্রমণ' আমার হস্তগত হয়েছে। এর গুণগত মর্যাদায় আমি অভিভূত হয়েছি।

—শ্রীঅপূর্ব সান্যাল

ইংরাজী বিভাগ, জে. কে. কলেজ, পুরুলিয়া

ভগবান মহাবীরের 'জীবন-চরিত' ও 'মহাবীর বলেছেন' সকলন ও রচনায় গভীর অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একত্র সমাবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার বিশ্বাস বিদ্বৎ সমাজে যাদের নৈতিক জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ আছে তাঁরা এরচনার প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করবেন।

—শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য

উকিল, জজকোর্ট, মির্জাপুর

রণকপুর

[রাজস্থান]

শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পমুক্তি খুঁজেছে ভারত ধর্মের আশ্রয়ে
পরকে পীড়নে সে গরিমা কোথা অসার রাজ্যজয়ে ?
বর্বর পরপীড়কের তরে চারুকলা কভু নহে।

জৈন বৌদ্ধ শিল্প যেহেতু স্বধর্মে আশ্রিত
হোক না তা ছোটো সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে বিধৃত
তবু তা অমর, চরিত্রবান, হবে না কখনো মৃত।

সেই মর্মর-স্বর্গপুরীতে দু'দণ্ড পেয়ে ছাড়া
একথাগুলোই বার বার ক'রে মনে দিয়েছিল নাড়া
যখন গিয়েছি রণকপুরে বা যবে গেছি দিলোয়াড়া।

রণকপুরেও গেলে না বন্ধু, কী দেখলে তবে রাজস্থান ?
এ-ভারতে আছে যত মন্দির, জানলে না তাতে কী এর স্থান
রানা কুম্ভের যুগে এ তৈরী—রানা কুম্ভ তো কীর্তিমান।

মিথ্যে না, পঁয়ষট্টি বছর চলেছিল নির্মাণের কাজ
জৈন শ্রেষ্ঠী 'ধরণাক্ শা'-কে শত সাধুবাদ দিতেছি আজ
মার্বল্ এর কিছুটা নিরেস, সূক্ষ্মতা দিলোয়াড়ার ধাঁজ।

স্মৃতির রণনে আজো বেজে যায় অনাহতভাবে অনেক সুর—
মর্মরে-গড়া সেই অপূর্ব ঋষভনাথের রণকপুর !
সে-দেউল মনে জড়িয়ে রয়েছে যার স্মৃতিটুকু বড়ো মধুর।

ব'লে রাখি আমি কাল্‌নায় নেমে যাইনি তো আবু যাবার পথে
আবু-যাত্রীরা যায় ব'লে শুনি কিংবা যাইনি সাদ্‌রি হ'তে ;
উদয়পুরের থেকে বাস্‌-এ যাওয়া সুবিধাজনক আমার মতে।

উদয়পুরের বাস্‌-এর স্ট্যাণ্ডে রণকপুরের গাড়ী
পেয়ে যাবে শেষরাত্রির দিকে—শতেক মাইল পাড়ি—
হয়তো একটু কষ্টই হবে, নয় কিছু বাড়াবাড়ি।

ঠিক দুপুরেই পৌঁছিয়ে দেবে—সেখানেই খাওয়া-দাওয়া
বন্দোবস্ত সবই পাবে তুমি যদি ঠিক করো যাওয়া।
শীতের সময়ে যাওয়াটাই ভালো, তাত্‌বে না বেশি হাওয়া

সেদিন সেখানে থাকতে চাও তো ব্যবস্থা আছে তার
নয়তো ঘণ্টা দুয়েক বাদেই বাস্‌ পাবে ফেরবার
উদয়পুরেই ফিরিয়ে আনবে আগেই রাত ন'টার।

ক্লান্ত শরীরে ফিরবে যখন উৎসাহ-ভরা মনে
মনে হবে এত কষ্ট করাটা হয়নি কো অকারণে
স্মৃতিভাণ্ডার ভ'রে নিয়ে এলে সম্পদ আহরণে।

জৈন ধর্মের প্রাচীনতা

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

জৈন ধর্ম যে বহু প্রাচীন, তাহার প্রামাণিক অনেক গ্রন্থ আছে; জৈনধর্ম বিষয়ে অর্বাচীন লোক কেবল বিরুদ্ধ মতের প্রচার করিয়াছে মাত্র। এই সকল অর্বাচীনদিগের মত যে ভ্রান্ত তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

মহাশ্রমণ সঙ্ঘাধিপতি শ্রুতকেবলী দেশীয়াচার্য শাকটায়ণের 'শব্দানুশাসন' নামে একখানি প্রাচীন ব্যাকরণ আছে। ঐ ব্যাকরণ যে জৈন সম্প্রদায়ের রচিত ও বহুপ্রাচীন তাহা Prof. Gustov Oppert. Ph, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

এই ব্যাকরণখানি যে কতকালের প্রাচীন ও জৈনমত যে কত পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ঋগেদ, শুক্ল যজুর্বেদ ও যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে শাকটায়ণের নাম যখন স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, তখন বলা যায় উক্ত গ্রন্থ ঐসকল গ্রন্থের রচনাকালের বহু পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

পাণিনি শাকটায়ণকে তৎপূর্ববর্তী বৈয়াকরণ স্থির করিয়াছেন এবং এই কারণে শাকটায়ণের গ্রন্থে পাণিনির নাম পাওয়া যায় না। পাণিনি অনেক স্থলে শাকটায়ণের সূত্রগুলির আবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনির 'উণাদয়ো বহুলম্' সূত্রের (৩. ৪. ৩ ও ৩. ৩. ১) টীকা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"নামচ ধাতুজমাহ ব্যাকরণে শাকটস্য চতোকাম্। বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ণ আহ ধাতুজং নামেতি" ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে শাকটায়ণের উণাদি সূত্র বৈয়াকরণগণ গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং উজ্জ্বল দত্ত, মাধব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ ইহার বিস্তৃত টীকা করিয়া গিয়াছেন। কবিকল্পদ্রুমে বোপদেব অষ্ট প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকারদিগের এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—"ইন্দ্রশ্চন্দ্র কাশকৃৎস্নোপি শলোঃ শাকটায়ণঃ। পাণিন্যমর জৈনেন্দ্রা" ইত্যাদি। এই নামের মধ্যে শাকটায়ণের উল্লেখ রহিয়াছে।

'শব্দানুশাসনে' অন্যান্য বৈদিক কথা লিপিবদ্ধ থাকিলেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেখানে স্বরবৈদিকের কোনো উল্লেখ নাই; পরন্তু পাণিনি এই বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। শাকটায়নের 'শব্দানুশাসনে' স্বরবৈদিকের কোন উল্লেখ না থাকার কারণ এই মনে হয় যে, ইনি জৈন ধর্ম মতে উহার ব্যাখ্যা করায় ব্রাহ্মণগণের হস্তে ইঁহাকে অনেক দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছিল। অতএব তিনি ইচ্ছাপূর্বক ঐ অধ্যায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ পাণিনীয় ব্যাকরণ হইতে কোন অংশে হীন নয়।

শাকটায়ণ তাঁহার ব্যাকরণের মঙ্গলাচরণে লিখিতেছেন—"নমঃ শ্রীবর্দ্ধমানায়" ইত্যাদি। এই বন্দনা দ্বারা জৈন তীর্থংকরদিগের চতুর্বিংশতি তীর্থংকর মহাবীর বা বর্দ্ধমানের সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। অতএব মহাবীর কত প্রাচীন ও জৈন ধর্ম কত কালের তাহা একবার বিবেচনা করুন। আর উক্ত শব্দানুশাসন গ্রন্থের প্রত্যেক পদান্তে লিখিতেছেন শ্রুতকেবলাধিপতি শাকটায়ণ। ঐগুলি জৈন ধর্মের সাংকেতিক শব্দ। ঐ সকল শব্দ অন্য কোন ধর্মপুস্তকে নাই।

শাকটায়ণাচার্য যে জৈন ছিলেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। টীকাকার যশোবর্মাও বলিয়া গিয়াছেন—

স্বস্তিশ্রীসকল জ্ঞানসাম্রাজ্যপদমাপ্তবান্।
মহাশ্রমণসঙ্ঘাধিপতির্যশ্চশাকটায়ণঃ॥

জৈনগণ জৈন ধর্মকে অনাদি বলিয়া থাকেন; ইহার সমর্থন করে তাঁহারা বলিয়া থাকেন, আর্যদিগের বেদের যে ছত্রিশ উপনিষদ তাহা জৈন গ্রন্থ মধ্যেই আছে। তাহার অন্যান্য অংশ রচিত হইয়া আধুনিক বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক বেদ প্রাচীন বেদ নয়। জৈন ইতিহাস অনুসারে আদি তীর্থংকর শ্রীঋষভনাথের পুত্র ভরত চক্রবর্তী, পিতার আজ্ঞামতে শ্রাবক ব্রাহ্মণদিগের পাঠের জন্য প্রথমে, গৃহস্থ বা শ্রাবক ধর্মের নিরূপক চারি বেদ প্রণয়ন করেন। চারি বেদ যথা (১) সংসারদর্শন বেদ, (২) সংস্থাপন পরামর্শন বেদ, (৩) তত্ত্বাবাবোধ বেদ, (৪) বিদ্যাপ্রবোধ বেদ।

যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতেন, কেবল তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।

দক্ষিণদেশে এখনও এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা আধুনিক বেদ হইতে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন রীতির বেদমন্ত্র পাঠ করেন। এই সকল মন্ত্র ঐ প্রাচীন বেদোক্ত হইলেও হইতে পারে। ঋষভনাথের পর নবম তীর্থংকর শ্রীসুবিধিনাথ পর্যন্ত এই আর্য বেদ ও সম্যক দর্শন ব্রাহ্মণগণে বিদ্যমান ছিল। সুবিধিনাথের পর এই আর্যবেদের বিচ্ছেদ হয় এবং এই সময় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মতের পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন প্রকার শ্রুতি রচনা করেন। ঐ সকল শ্রুতিতে ইন্দ্র, বরুণ, পুষা, নক্ত, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেবতার উপাসনা, বিবিধ প্রকার যজন যাজন লিখিত আছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে এই সকল বিষয় বৃদ্ধ মুনিদিগের মুখে শ্রুত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের নাম 'শ্রুতি' হইল। ব্রাহ্মণগণ এই সময় আপনাদিগকে জগদ্‌গুরু ও গো-ভূমি আদি দানের পাত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। এই হিংসক-শ্রুতি বেদ নামে প্রচারিত হইল। বেদব্যাসের সময় পর্যন্ত এই বেদ এক ছিল, তিনি ইহাকে বিভক্ত করিয়া চারি খণ্ড করেন। ইহাং একণে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ববেদ নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

একণে এই বেদব্যাস প্রচারিত গ্রন্থে জৈনধর্মের মতবাদ খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে, দ্বিতীয় পাদের তেত্রিশ সূত্রে, জৈনদিগের সপ্তভঙ্গী মতের খণ্ডন আছে। যে মত প্রবল বা যাহা দেশব্যাপী অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার খণ্ডন না করিলে কোন নূতন মত প্রবর্তিত করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং বেদব্যাসকে জৈন মত খণ্ডন করিতে হইয়াছিল। অতএব বলা যাইতে পারে যে জৈনধর্ম বেদব্যাসের বহুপূর্বে প্রচলিত ছিল। বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি মীমাংসা প্রণয়ন করেন; ইনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত বিতর্ক করিয়া শুক্ল যজুর্বেদে জৈনধর্ম যে বেদ প্রচারিত ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন তাহা সন্তোষ জনকরূপে প্রমাণ করিয়াছেন :

> রাজস্য নু প্রসব আবভূবেমা চ বিশ্বভুবনানি সর্বতঃস।
> নেমিরাজা পরিয়াতি বিদ্বান্ প্রজাং পুষ্টিং বর্ধমানো অস্মে স্বাহা॥
>
> —যজুর্বেদ সংহিতা, অধ্যায় ১, শ্রুতি ২৫

জৈনগণ এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা স্বধর্মের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

ইঁহাদের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি যদি যথার্থ বৈদিক শ্লোক হয়, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাদের নিরূপিত মত সত্য বলিতে পারা যায়।

আর অধিক শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া, পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থে জৈন ধর্মের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহার উল্লেখমাত্র করিতেছি। কত লোকে স্বকপোল-কল্পিত মত জাহির করিয়া বলেন যে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের শাখামাত্র এবং উহা বহুপরে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ভুল। কেননা, জৈনদিগের বেদনিহিত প্রমাণের কথা ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ হইতে জৈনমতের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে পারা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

'নিত্যানুভূতনিজলাভ' ইত্যাদি শ্লোকে জৈনদিগের প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে জীবদয়া ও লোকশিক্ষার নায়ক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

'নাভিস্ত জনয়েৎ পুত্রং' ইত্যাদি শ্লোকে ঋষভদেব তৎপুত্র ভরতকে লোকপালনের ভারার্পণ করিয়া তপস্যা আচরণ করিলেন উল্লিখিত হইয়াছে।

নাগপুরাণে—

'দর্শয়ন্ বর্ত্ম বীরাণাং সুরাসুর নমস্কৃতঃ' ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইতেছে যে, ভগবান জিনদেবের মত জৈনমত বলিয়া খ্যাত এবং আদিনাথ ঋষভনাথ জিনেশ্বর বলিয়া কীর্তিত।

শিবপুরাণে—

'অষ্ট ষষ্টিষু তীর্থেষু যাত্রায়াং যৎফলং ভবেৎ' ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইতেছে যে বিবিধ তীর্থযাত্রায় যে ফল হয়, একমাত্র ঋষভনাথ স্মরণে ততোধিক ফল হয়।

ঋগ্বেদে—

'ওঁ ত্রৈলোক্য প্রতিষ্ঠিতানাং চতুর্বিংশতি তীর্থংকরাণাং' ইত্যাদির অর্থ ঋষভদেব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাবীর পর্যন্ত চব্বিশ তীর্থংকর ত্রিলোক ব্যাপ্ত, নিত্যগণ তাঁহাদের স্মরণ করেন। আবার ঋগ্বেদের আর একস্থানে লিখিত আছে—

'ওঁ পবিত্র নগ্নং সুধীরং দিগ্বাসনং ব্রহ্মাগর্ভ সনাতনং উপৈমি বীরং পুরুষমর্হং মাদিত্যবর্ণ তমসঃ পরস্তাৎ স্বাহা'। এখানে নগ্ন দিগম্বর ব্রহ্মস্বরূপ সনাতন অর্হৎদিগকে স্মরণ করা হইতেছে।

যজুর্বেদে—

'ওঁ নমোর্হংপ্তা·ঋষভো' ইত্যাদি মন্ত্রে ঋষভদেবের অর্চনা করিয়া বলা হইতেছে যে ঋষভদেব, অজিতনাথ, সুপার্শ্ব, অরিষ্টনেমি, এই সকল ভগবান্ জৈনদিগের তীর্থংকর। ইঁহাদের মূর্তি জৈনগণ নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক শাস্ত্রাদি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, জৈনমত বহুপ্রাচীন, জৈন ধর্ম বৌদ্ধধর্মের শাখা নয়।

ভারত সংস্কৃতির উৎস ধারা, পৃঃ ৪৮৫-৯০।

জৈন মন্দিরে বিদেশী শিল্প

শ্রীমৃণাল গুপ্ত

কলকাতা থেকে একশো পঁচিশ মাইল উত্তরে শিয়ালদহ-লালগোলা ঘাট রেলপথে, নশীপুর রোড একটি ছোট স্টেশন। এই স্টেশনে নেমে অপরিসর রাস্তা ধরে পশ্চিমে সোজা মাইল-খানেক হাঁটলে যে জায়গায় পৌছানো যায়, তার নাম মহিমাপুর। এর সম্মুখে পুণ্যসলীলা ভাগীরথী, বাঁ পাশে ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ শহর আর ডান পাশে রয়েছে জৈন তীর্থ জিয়াগঞ্জ আজিম-গঞ্জ টাউন
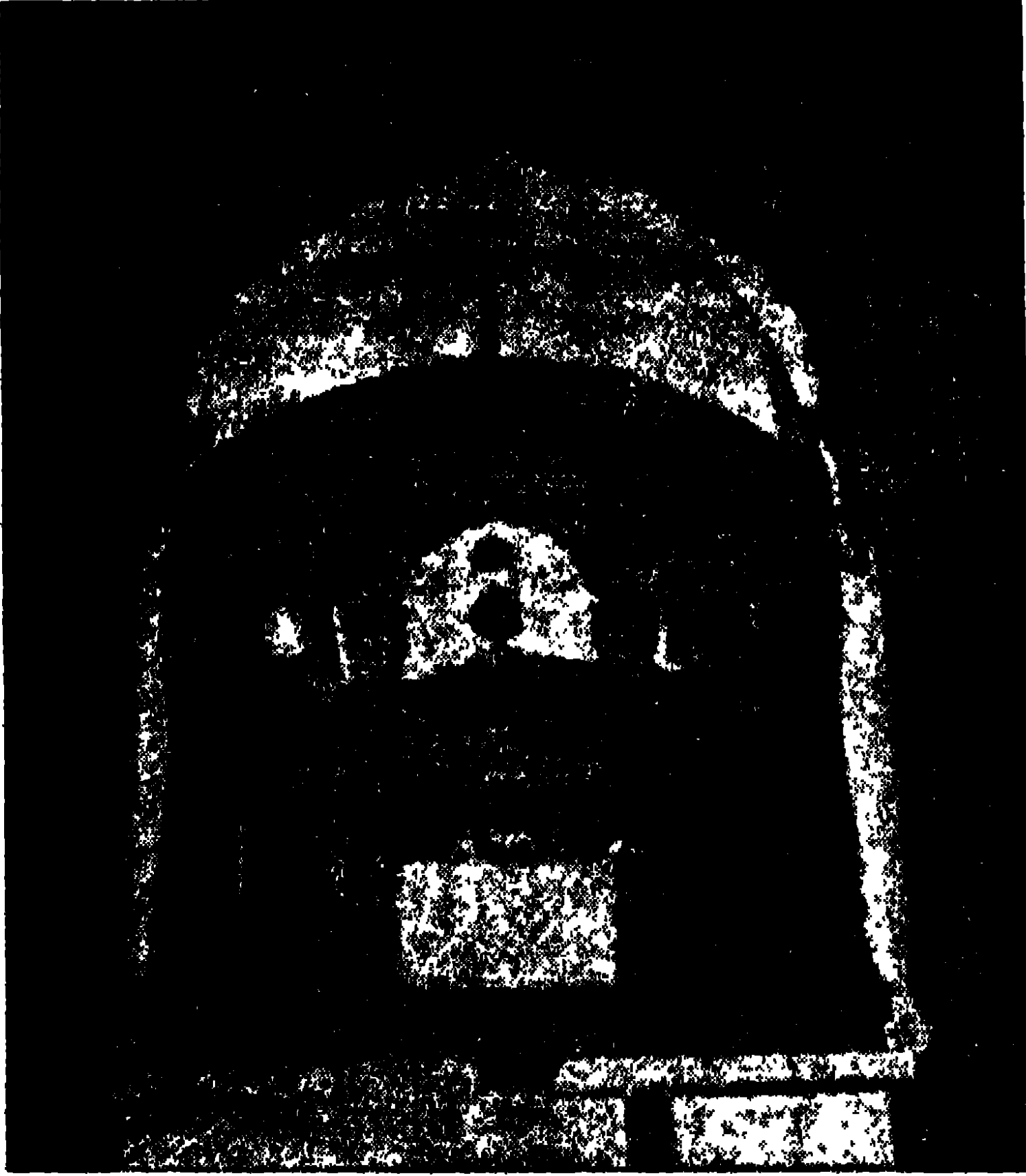
জগৎ সেঠের কষ্টি পাথরের মন্দির

মনকে প্রলুব্ধ করতে পারে এমন কোন ঐতিহাসিক চেহারা আজ আর মহিমাপুরে অবশিষ্ট নেই। অথচ আজ থেকে মাত্র দু'শো বছর আগে মনকে লুব্ধ করার মত কোন সম্পদের অভাবই এই মহিমাপুরে ছিল না। আসমুদ্র হিমাচলের শ্রেষ্ঠ কোটিপতি মুর্শিদাবাদের শেঠ পরিবারের আবাস ছিল এই মহিমাপুর অঞ্চলেই সেদিন। এখানে যেমন আকাশচুম্বী সুরম্য অট্টালিকা ছিল, তেমনি ছিল ধনদৌলত আর হীরা মাণিক্যের এক বিরাট সম্ভার। জনশ্রুতি

আছে, এই শেঠ পরিবারের বিপুল অর্থ ভাগীরথীর স্রোতস্বিনী ধারার গতিরোধের স্পর্দ্ধা করত। কিন্তু এগুলো সবই অতীতের কথা। কাল আর ভাগীরথীর নিপুণ ভাঙ্গনে পূর্ব সমৃদ্ধির খুব সামান্য চিহ্নই আজ এখানে অবশিষ্ট। যা রয়েছে তা শুধু মহিমাপুরের অতীত বৈভবের হৃত-সর্বস্ব রূপ। তবু যাদের চোখ রয়েছে তারা আজকের এই হৃত-সর্বস্ব রূপের মধ্য থেকেই বিস্মিত হবার মত বিষয় বস্তু খুঁজে নিতে পারেন। এবং এই বিস্ময় বস্তুটির সন্ধান মিলবে শেঠ পরিবারের নবনির্মিত জৈন মন্দিরের গাত্র অলঙ্করণের মধ্যেই। বর্তমান মন্দিরটী খুব প্রাচীন না হলেও, এর নির্মাণ-উপকরণ ও গাত্র-অলঙ্করণের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, যা আজকের এই নিবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

এখন এই মন্দিরের বিস্তারিত প্রসঙ্গে আসার পূর্বে শেঠ পরিবারের সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য শেঠ পরিবার বাংলা দেশের আদি বাসিন্দা নয়। এদের পূর্বপুরুষ শেঠ মানিক চাঁদের সময় থেকেই মুর্শিদাবাদে শেঠ পরিবারের গোড়া পত্তন। মানিক চাঁদের পিতা হিরানন্দ শাও ছিলেন রাজপুতানার নাগোরের অধিবাসী। এই হীরানন্দ শাওর আর্থিক অবস্থা প্রথম দিকে ছিল খুবই অসচ্ছল। আর্থিক অনটনে ক্লিষ্ট হীরানন্দ একদিন অরণ্যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে পরিত্যক্ত এক ভগ্ন অট্টালিকায় একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধের সন্ধান পান। হীরানন্দের অক্লান্ত সেবায় তুষ্ট এই বৃদ্ধটি মৃত্যুকালে তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত ধন হীরানন্দকে প্রদান করেন। সেদিন থেকেই শেঠ পরিবারের গৃহে ভাগ্যলক্ষ্মীর শুভাগমন। হীরানন্দ তাঁর সপ্ত পুত্রের হাতে সেই ধন তুলে দিয়ে তাদের ভারতের বিভিন্ন অংশে ব্যবসার্থে প্রেরণ করেন। মানিক চাঁদ ছিলেন এই সপ্তম পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। প্রথমে ঢাকায় ও পরে নবাব মুর্শিদকুলীর একান্ত সহচর হয়ে মানিক চাঁদের মুর্শিদাবাদে আগমন এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভ। এই মানিক চাঁদের সময় থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে শেঠ পরিবারের ভূমিকা ছিল খুবই সক্রিয়। অগণিত অর্থের মালিকানাই শেঠ পরিবারকে রাজনৈতিক প্রতিপত্তির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলাদেশে এমন নবাব ছিলেন কি না সন্দেহ যিনি অর্থের জন্য শেঠ পরিবারের কৃপাপ্রার্থী

হয় নি। শুধু বাংলার নবাব কেন, সময় সময় দিল্লীর সম্রাটকেও এই শেঠ পরিবারের কাছে হাত পাততে হয়েছে। দিল্লী শহরে দারুণ দুর্ভিক্ষে দিল্লীশ্বরকে অগণিত অর্থ দিয়ে সাহায্য করায় সম্রাট মহম্মদ নসিরুদ্দিন ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মানিক চাঁদের পুত্র ফতে চাঁদকে প্রথম 'জগৎ শেঠ' উপাধি দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। সেদিন থেকেই মুর্শিদাবাদের শেঠ পরিবার এই নয়া খেতাবেই সুপরিচিত। কিন্তু শেঠ পরিবারের এই ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তির বৈভব খুব বেশী দিন ছিল না। পলাশির যুদ্ধে বাংলার ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শেঠ পরিবারের ঐশ্বর্যের খ্যাতিও ধীরে ধীরে অস্তমিত হল।

মহিমাপুরে জগৎ শেঠদের আদি বাড়ি গঙ্গার ভাঙনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তাই পরবর্তী বংশধরেরা আদি বাড়ির পূর্ব দিকে তাঁদের বসতবাটী স্থানান্তরিত করেছেন। বর্তমান বাড়ির বাইরের চত্বরেই আমাদের আলোচ্য মন্দিরটি অবস্থিত। জগৎ শেঠেরা জৈন ধর্মের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মন্দিরটি তাঁদের ত্রয়োবিংশতিতম ধর্মগুরু পার্শ্বনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। গঠন রীতির দিক থেকে মন্দিরের এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু মন্দিরের বহির্বারান্দায় প্রবেশ করে এর সম্মুখ দেয়ালে চোখ রাখলেই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বিদেশী ভাবধারায় চিত্রিত ছোট ছোট অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকে (tiles) মন্দিরের সম্মুখ দেয়াল সুশোভিত। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। মন্দিরের অভ্যন্তরের অধিকাংশ অংশই মূল্যবান কষ্টি পাথরের দ্বারা নির্মিত। এবং তীর্থংকর পার্শ্বনাথও কষ্টি পাথর নির্মিত বর্গাকার সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরের এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বর্তমান মন্দিরটি শেঠ পরিবারের আদি পার্শ্বনাথ মন্দিরের নব সংস্করণ মাত্র। এবং মন্দিরটি আদি মন্দিরের উপকরণ দিয়েই ১৯৭৫ সংবতে (১৯১৮ খৃঃ) জগৎশেঠ গোলাপচাঁদের পুত্র ২য় ফতেচাঁদ কর্তৃক নির্মিত। শেঠ পরিবারের বর্তমান বংশধরদের কাছে আদি মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে যতটুকু লিখিত ইতিহাস রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে আঠারো শতকের শুরুতে নবাব মুর্শিদকুলী গৌড়ের হিন্দু রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে কষ্টি পাথর নির্মিত দরবার গৃহের বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

তখন শেঠ মানিক চাঁদ হিন্দু রাজাদের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে অধিক উচ্চ মূল্যে নবাব মুর্শিদকুলীর কাছ থেকে কষ্টিপাথরের বিভিন্ন অংশগুলো কিনে নেন এবং এই উপকরণ দিয়েই পার্শ্বনাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মানিক চাঁদের পুত্র প্রথম জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ কাশিম বাজার কুঠির ডাচদের কাছে প্রাপ্ত অসংখ্য সুচিত্রিত পোড়ামাটির ফলকের সাহায্যে এই মন্দিরের অঙ্গ সজ্জা করেন। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দিকে গঙ্গার গতি পরিবর্তনের জন্য শেঠ পরিবারের আদি বাড়ির এলাকা বিধ্বস্ত হতে শুরু করলে তৎকালীন জগৎ শেঠ মন্দিরের কষ্টি পাথর ও চিত্রফলকগুলো সহ অন্যান্য মূল্যবান উপকরণ অপসারিত করে নূতনভাবে মন্দির স্থাপনের উদ্যোগ করেন। ঠিক সেই সময় লর্ড কার্জন মহিমাপুরে জগৎ শেঠদের বাড়ি পরিদর্শন করতে এসে স্তূপীকৃত কষ্টিপাথর ও সুদৃশ্য চিত্রফলকগুলি দেখে সেগুলো কলকাতায় স্থানান্তরণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু জগৎ শেঠ ২য় ফতেচাঁদ কার্জনের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে সেই কষ্টিপাথরের উপকরণ দিয়েই বর্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আদি মন্দিরের অনুকরণে নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সম্মুখ দেয়ালকেও সুচিত্রিত চিত্র ফলকে সুশোভিত করান।

এই হচ্ছে মন্দির সম্পর্কীয় ইতিবৃত্ত। এখন এই মন্দির গাত্রের চিত্র ফলকগুলোর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করি। পাঁচ ইঞ্চি বর্গ বিশিষ্ট ফলকগুলোর মিনাকৃত মসৃণ আবরণের উপর নীল রঙে অসংখ্য বিদেশী চিত্র চিত্রিত। এবং এই ফলকগুলোর দ্বারাই বর্তমান মন্দিরের সম্মুখ দেয়ালের আপাদমস্তক আচ্ছাদিত। যে কোন কারণেই হোক আদি মন্দিরের সমস্ত চিত্র ফলকগুলোকে বর্তমান মন্দিরে বসানো সম্ভব হয়নি। তাই আজও অনেক সুদৃশ্য ফলক শেঠ পরিবারের বর্তমান বংশধরদের হেফাজতে রয়ে গেছে। এই পরিবারের বর্তমান পুরুষেরা বলে থাকেন যে, কাশিম বাজারের ডাচকুঠির কুঠিয়াল তাদের পূর্বপুরুষ জগৎ শেঠ ফতে চাঁদকে এই চিত্র ফলকগুলো দিয়ে ছিলেন এবং এধরণের ফলক নাকি কাশিম বাজারের ডাচ কুঠিতেই নির্মিত হতো। তাদের এই বক্তব্যের প্রথম অংশ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। সপ্তদশ শতকে মুর্শিদাবাদ সহরের অনতিদূরে কাশিম বাজারে যে সমস্ত বিদেশী বণিকেরা কুঠি নির্মাণ করেছিল

তাদের মধ্যে ডাচরা ছিল অন্যতম। (বর্তমানে অবশ্য এক ডাচ সিমেট্রি ছাড়া ডাচদের কোন চিহ্নই কাশিম বাজারে অবশিষ্ট নেই।) হাণ্টার'স 'ষ্ট্যাটিসটি-ক্যাল একাউণ্টস অব বেঙ্গল' ভল্যুম ৯ থেকে জানা যায় যে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে থেকেই ডাচরা কাশিম বাজারে কুঠি নির্মাণ করেছিল। এবং ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে জগৎ শেঠ পরিবারের সাথে ডাচদের টাকা পয়সার লেনদেন হামেশাই লেগে থাকত। তাই হয়তো উপহার স্বরূপ কিংবা কোন দেনার দায়ে তৎকালীন ডাচ বণিকেরা প্রথম জগৎ শেঠ ফতে চাঁদের হাতে এই সুদৃশ্য ফলকগুলো তুলে দিয়েছিল। তখন ফতেচাঁদই ডাচদের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের গায়ে চিত্র-ফলকগুলো বসিয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও য়ুরোপীয় বণিকদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে শেঠ পরি-বারকে নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা গোঁড়ামি মুক্ত হতে হয়েছিল। তাই ফতেচাঁদ এই বিদেশী চিত্র ফলকগুলোকে ভিন্নধর্মীয় চিত্র সহ বিনা দ্বিধাতেই তাঁদের উপাসনা গৃহের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় এঁদের বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে। কাশিম বাজার ডাচ্ কুঠিতে এ ধরনের ফলক নির্মাণের কোন ইঙ্গিতই জেলার ইতিহাস কিংবা কোন সরকারী নথিপত্রে পাওয়া যায় না। চিত্র ফলকগুলোর গঠনভঙ্গী, অঙ্কিত বিষয় বস্তু এবং চিত্রণরীতি দেখে প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, এগুলো সরাসরি হল্যাণ্ড থেকেই আমদানিকৃত এবং এগুলো বিখ্যাত 'ডেল্‌ফ্‌ট টাইল'-এর সমগোত্রীয়। ডেল্‌ফট উত্তর হল্যাণ্ডের একটি সহর। সপ্তদশ শতকের শুরু থেকেই এই ডেল্‌ফ্‌ট সহরে নির্মীত সুদৃশ্য চিত্রফলক সমগ্র ইউরোপে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নীল রঙে চিত্রিত বর্গাকারের এই ডেল্‌ফট চিত্রফলক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সাধারণতঃ গৃহের বহ্নিসেবন স্থান কিংবা চুল্লীর পার্শ্ববর্তী স্থানকে আচ্ছাদনের কাজে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু হল্যাণ্ডে ঘরের দেয়াল আচ্ছাদনের জন্ত এই ডেল্‌ফট চিত্র ফলক ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

ঠিক একই রীতিতে আমাদের আলোচ্য মন্দিরের গায়ে গায়ে চিত্র-ফলকগুলোকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এবং ডেল্‌ফ্‌ট চিত্র-ফলকের মতই

এদের বিনাকৃত মসৃণ আবরণের উপর চিত্রিত রয়েছে সুদৃশ্য ল্যাণ্ডস্কেপ।

লাঠি হাতে নিয়ে

কোন কোন ছবিতে ল্যাণ্ডস্কেপই প্রাধান্য পেয়েছে। আবার কোনটিতে ল্যাণ্ডস্কেপ রয়েছে নিতান্তই পটভূমি হিসেবে। এবং সেই পটভূমির সম্মুখে বিচিত্র বেশধারী নরনারী ও জীবজন্তুর উপস্থাপনে কোন ঘটনাকেই যেন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে এ ধরনের প্রতিটি চিত্রে শিল্পী ব্যাক গ্রাউণ্ড ও ফোর গ্রাউণ্ডের মধ্যে এমন এক সুষমতা রক্ষা করেছেন, যার ফলে উভয়ই উভয়েরই পরিপুরক হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ফলকেই যেন নতুন নতুন দৃশ্য বা কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে এমন নয়। কিছু কিছু দৃশ্যের পুনরাবৃত্তিও চোখে পড়ে। কিন্তু শিল্পী সেই পুনরাবৃত্তির মধ্যেও যেন একটু বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। চিত্রণের প্রতিটি কাজ খুব নিখুঁত নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবিগুলো একটু যান্ত্রিক ভাবাপন্ন। মনে হয় শৈল্পিক মনের চেয়ে শিল্পগত পরিমাণের দিকেই শিল্পীমন বেশী সক্রিয় ছিল। ছবিতে যে সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু চোখে পড়ে তা দেখে বাঁধ, বালিয়াড়ি আর জলার দেশ হল্যাণ্ড দেশের কথাই

মনে পড়ে যায়। সমুদ্রের মাঝে দেয়াল তুলে জায়গা ভরাট করে তবে হল্যাণ্ড
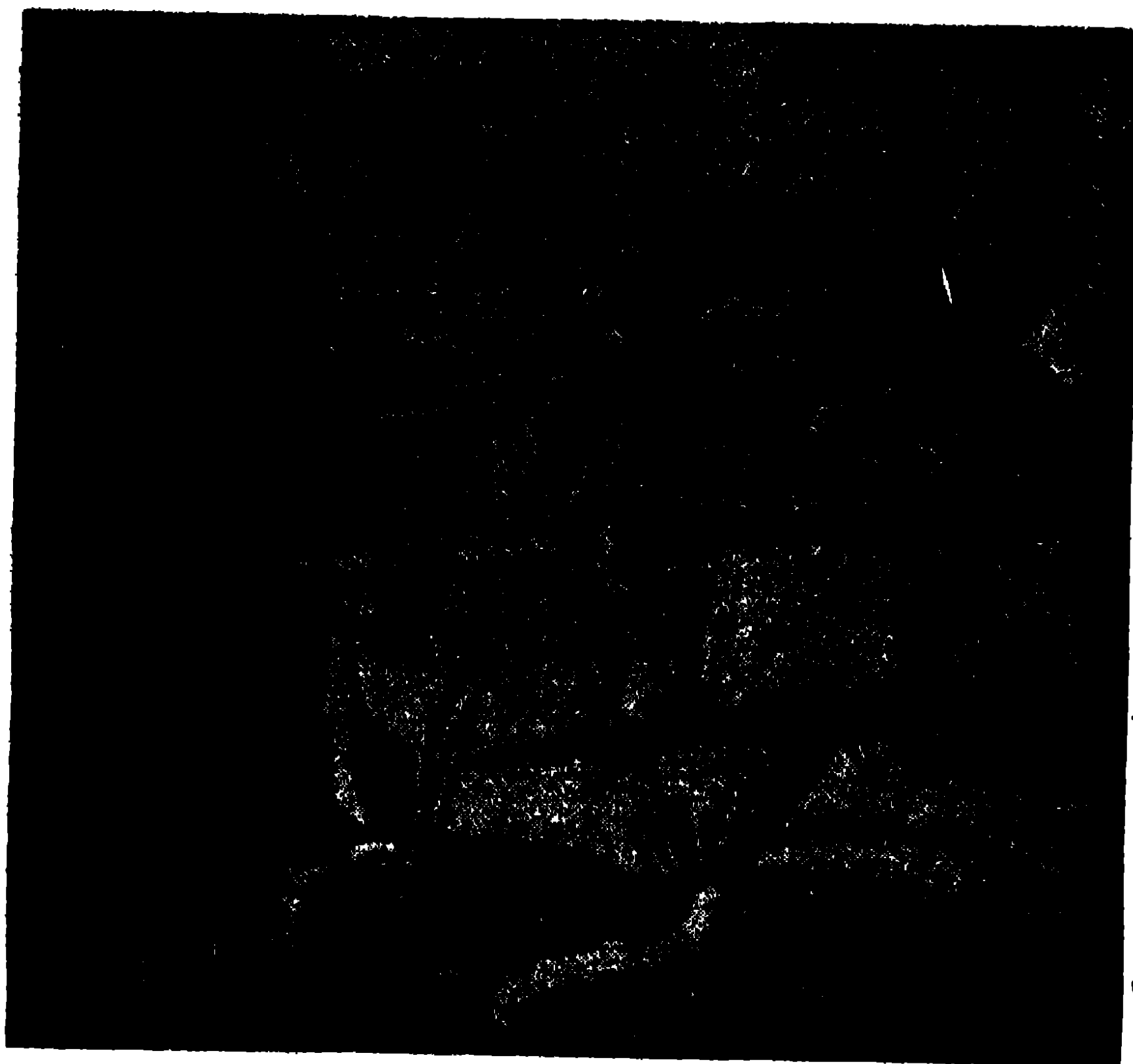
বোঝা কাঁধে নিয়ে

দেশের জন্ম হয়েছে। তাই এ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে খানা-ডোবা, ঝিল, ছোট ছোট সাঁকো, টিউলিপ ও হায়াসিন্থ ফুল। আর রয়েছে ঘনবসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি বাড়ি ও অজস্র হাওয়ায় চলা কল। আমাদের আলোচ্য চিত্রকলকের ছবিগুলোতেও উপরোক্ত জিনিষগুলোর ব্যাপক সমাবেশ চোখে পড়ে। ছবিতে কোথাও দেখি দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের উপর পালতোলা জাহাজগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, জাহাজ থেকে নাবিকেরা দল বেঁধে তীরে নামছে, খানা-ডোবার ধার দিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কেউ বা বোঝা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ আবার কাঠের জুতো পরে লাঠি হাতে নিয়ে অতি সন্তর্পণে সাঁকো পার হচ্ছে, কিংবা কেউ বালিয়াড়ির ওপরে বসে নিঃসঙ্গ অবকাশ যাপন করছে। কোন কোন ছবিতে জলার পাশে রয়েছে দোচালা কিংবা গম্বুজ ঢঙের বাড়ি-ঘর যার একপাশ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ধোঁয়া বেরোবার চিমনি। আবার কোন ছবিতে শুধু ধরা পড়েছে উদার আকাশের নীচে উঁচু-নীচু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট উইণ্ডমিল।

এ ছাড়া কয়েকটি ফলকে ল্যাণ্ডস্কেপের পটভূমিকায় বাইবেলের কাহিনীকেও রূপ দেওয়া হয়েছে।

এখন এই চিত্র-ফলকগুলোর নির্মাণকাল সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠাটা খুবই প্রাসঙ্গিক। ডাচ বণিকেরা মুর্শিদাবাদে এসেছিল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝিতে এবং জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ জীবিত ছিলেন ১৭৪৩ খৃঃ পর্যন্ত। সুতরাং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যেই চিত্র-ফলকগুলোর নির্মাণকাল বলেই অনুমান হয়। তাছাড়া বিষয়বস্তু ও রীতির দিক থেকে সতেরো শতকের ডাচ চিত্রকলার সাথে আলোচ্য ফলকের চিত্রগুলোর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। এই শতকের ডাচ চিত্রের মত মিনাকৃত ফলকগুলোর ওপর চিত্রিত রয়েছে হল্যাণ্ডের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও হল্যাণ্ড বাসীদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার কিছু কিছু খণ্ডচিত্র। সতেরো শতকের পূর্বে কিন্তু ডাচ চিত্রকলায় এই প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার বিশেষ কোন স্থানই ছিল না। তখন সেখানে ছিল শুধু অসাধারণ মানুষদেরই একচেটিয়া আধিপত্য। অর্থাৎ ফ্লেমিশ চিত্র শিল্পীদের মত ডাচ শিল্পীদের চিত্রেও তখন শুধু বাইবেলের দেবদেবী আর রাজ-রাজড়াদের প্রতিকৃতিই প্রাধান্য পেতো। কিন্তু ষোড়শ শতকের মাঝামাঝিতে ফ্লেমিশ চিত্রশিল্পী পীটার ব্রুখেল প্রথম চিত্রকলাকে বাস্তব জীবন ও জগতের সঙ্গে যুক্ত করে এক বৈপ্লবিক ভাবধারার সৃষ্টি করলেন। এবং সেই ভাবধারাতেই অনুপ্রাণিত হলেন সতেরো শতকের ডাচ চিত্রশিল্পীরা। হল্যাণ্ডের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, উদার আকাশ, উপকূলবর্তী সমুদ্র ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার নানা দিক ফুটে উঠল সতেরো শতকীয় ডাচ শিল্পীদের চিত্রে। তাই বিষয় বস্তুর দিক থেকে সতেরো শতকীয় ডাচ চিত্রকলার সাথেই আমাদের এই চিত্র ফলকগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে বেশী। তবে এর ল্যাণ্ডস্কেপের পাহাড়, বাঁধ, বালিয়াড়ি, গাছ, আকাশ ও ল্যাণ্ডস্কেপের পটভূমিতে মানুষ উপস্থাপন ও অঙ্কনের যে রীতি বা ভঙ্গী চোখে পড়ে তা যেন পীটার ব্রুখেলের চিত্ররীতির কথাই বেশী করে স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও শিল্পগত পরিমাণের খাতিরে ছবিগুলো বেশ একটু যান্ত্রিক ভাবাপন্ন ও রুক্ষ। সরাসরি প্রকৃতি বা জীবন থেকে পীটার ব্রুখেল খুব কমই ছবি এঁকেছেন। প্রকৃতি ও জীবনের বিভিন্ন

দিকের নানা খুঁটিনাটি তিনি প্রত্যক্ষ করে মনের মণিকোঠায় সযত্নে জমা করেছেন এবং পরে স্বকীয় অনুভূতির সংমিশ্রণে তা মণ্ডনশিল্পাকারে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর চিত্রপটে। আমাদের আলোচ্য চিত্রফলকগুলোর ল্যাণ্ডস্কেপের কম্পোজিশন বা রচনাবিন্যাস দেখেও বেশ অনুভব করা যায় যে, খুব কম ছবিই সরাসরি প্রকৃতি থেকে আঁকা হয়েছে; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবিগুলো তাদের উপকরণ সংগ্রহ করেছে চিত্রশিল্পীর কল্পনাপ্রবণ মন থেকে। তা ছাড়া ব্রুখেলের ছবির মত চিত্র ফলকের অনেক ছবির মধ্যেই রয়েছে কোন ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনের একটা সুন্দর প্রবণতা। তাই মনে হয় ব্রুখেলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়তো কোন শিল্পী গোষ্ঠীর তুলিতে আঁকা হয়েছে আমাদের এই আলোচ্য চিত্র ফলকের অসংখ্য চিত্রগুলো; এবং সেটা হয়েছে সতেরো শতকের শেষের দিকে কিংবা আঠারো শতকের গোড়াতেই।

নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে 'ডেল্‌ফট টাইলে'র কিছু মূল্যবান নিদর্শন সংরক্ষিত হচ্ছে। গঠনভঙ্গী ও অন্যান্য দিক থেকে এই নিদর্শনের সাথে আমাদের আলোচ্য চিত্র ফলকগুলোর বিস্ময়কর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। (Encyclopaedia Britannica, Vol 22, 1955, 215A পাতার সম্মুখের চিত্রপৃষ্ঠার ১০নং চিত্রটি দ্রষ্টব্য) যতদূর জানি বাংলা দেশে ডাচ চিত্র ফলকের নিদর্শন এই প্রথম। তা ছাড়া জৈন ধর্মীয় মন্দির গাত্র অলঙ্করণের জন্য কতকগুলি বিদেশী চিত্রফলকের (ভিন্ন ধর্মীয় চিত্র সহ) আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটাও নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। তাই এই বিদেশী চিত্র ফলক-গুলোসহ মন্দিরটির সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা একথা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগই ভেবে দেখতে পারেন।

দেশ, ২০ শ্রাবণ, ১৩৬৮

অতিমুক্ত

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় দৃশ্য

[সভাগৃহ। রোহিণী থালায় ফুল সাজাচ্ছে। বহুলা এসে জলের ঘট নামিয়ে রেখে]

বহুলা : রোহিণি, তুই কি কিছু জানিস, কেন আজ কুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হচ্ছে?

রোহিণী : ও মা, তুই কি কিছু শুনিস নি। কুমার শ্রমণ ভগবান মহাবীরের সমবসরণে গিয়ে তাঁর প্রবচনে প্রভাবিত হয়ে এসে এখন প্রব্রজ্যা নিতে চাইছে।

বহুলা : বলিস কী? তারপর? তারপর?

রোহিণী : তখন মহারাজ মহাদেবী তাকে অনেক বোঝালেন কিন্তু যখন তাতে তাকে নিরস্ত করা গেল না--

বহুলা : তারপর? তারপর?

রোহিণী : তখন তিনি তাকে বললেন, কুমার, আমাদের কতদিনের সাধ ছিল যে তোকে রাজা করে আমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। তাই তুই অন্ততঃ একদিনের জন্যও রাজা হ'।

বহুলা : তারপর? তারপর?

রোহিণী : কুমার প্রথমে চুপ করে রইল। তারপর বলল, তোমাদের যখন তাই ইচ্ছে।

বহুলা : বুঝেছি। মহারাজ তাকে রাজত্ব দিয়ে বাঁধতে চাইছেন।

রোহিণী : হাঁ, তবে তাকে বেঁধে রাখা খুব শক্ত।

বহুলা : কেন? কেন?

রোহিণী : কেন আর কী? ওর মনে কি এখনো বিষয়ের স্পর্শ লেগেছে

যে বিষয়ের আকর্ষণে ভুলে যাবে। ওর বয়স মাত্র দশ বছর সেকথা মনে আছে।

বহুলা : তা বটে। ওই যে মহারাজ, মহাদেবী সব এদিকেই আসছেন।

[অতিমুক্তসহ মহারাজকে অনুসরণ করে মহাদেবী, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজপুরোহিত আদি সবাই শ্রেণীবদ্ধ হয়ে প্রবেশ করছে। মহারাজ অতিমুক্তকে সিংহাসনে বসিয়ে তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন। মা কপালে তিলক রচনা করছেন। পুরোহিত স্বস্তি বাচন করছেন। মন্ত্রী ও সেনাপতি ও অন্য সকলে অভিবাদন জানাচ্ছে। রোহিণী শঙ্খবাদন করছে। বহুলা চামর বীজন করছে। উৎসব শেষে সকলে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করছেন। নর্তকীরা এসে নৃত্য পরিবেশন করছে। উৎসব আনন্দোচ্ছল হলেও গম্ভীর। নৃত্য শেষে রাজা উঠে এসে অতিমুক্তের সামনে দাঁড়িয়ে]

বিজয় : পুত্র তোমাকে আমাদের যা কিছু দেবার ছিল—এই রাজ্য ধন সম্পত্তি অন্তঃপুর সে সমস্তই তোমাকে দিলাম। আর তুমি কি চাও ? আর তোমায় আমরা কি দিতে পারি ?

অতিমুক্ত : [সিংহাসন হতে নেমে] বাবা, আমায় ভিক্ষা পাত্র ও রজোহরণ দাও।

চতুর্থ দৃশ্য

[রাজগৃহের বহির্ভাগ। গুণশীল চৈত্যে যাবার পথ। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে]

গণ্‌গ : বৃষ্টি হয়ে পথ বড় পিচ্ছিল হয়ে গেছে। একটু সাবধানে ধীরে ধীরে চল।

তেতলীপুত্র : এখন কেমন পরিষ্কার অথচ একটু আগে এত বৃষ্টি হয়ে গেল।

গণ্‌গ : শ্রাবণের বৃষ্টি, তাই এই রকম। এই বৃষ্টি, এই রোদ। গাথাপতি বন্ধুলের ঘরে ভিক্ষা পেতে দেরী হয়ে গেল। তা নইলে জল নাববার আগেই গুণশীল চৈত্যে পৌঁছে যেতাম। গাথাপতি বন্ধুল কি বলছিল শুনেছ।

তেতলীপুত্র : কী বলছিল ?

গগ্গ : বলছিল অন্য তীর্থিকেরা বলে নিগ্রন্থ শ্রমণেরা নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায়, অনাচার করে।

তেতলীপুত্র : সে তো বলবেই। অন্য তীর্থিকেরা ঈর্ষ্যা বসে এমন অনেক কথাই বলে। নিগ্রন্থ ধর্মের প্রসার হচ্ছে, তাই ওদের গা জ্বালা করে।

গগ্গ : তাতে কোনো তথ্য নেই কিন্তু লোকে কি সেকথা বুঝবে ?

তেতলীপুত্র : বুঝবে। লোকের বুদ্ধি কম, সেকথা মনে করবার কারণ নেই। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাংস গ্রহণ করে সেকথা সবাই জানে। হাঁ নিজে হত্যা করে না তবে যদি অন্যে হত্যা করে তার সুপক্ক মাংস তাদের খাওয়ায় তবে তাতে বাধা নেই।

গগ্গ : নিমন্ত্রণ পেয়ে গৃহীর ঘরে শ্রমণের খেতে যাওয়া আমার ভালো মনে হয় না।

তেতলীপুত্র : ভালো আর কিসে, কিন্তু অতিমুক্ত, তুমি যে অনেক পিছিয়ে পড়ছ।

অতিমুক্ত : থের, সদ্য জলে ভেজা মাটি হতে কেমন একটা শষ্প গন্ধ উঠেছে। আমি বুক ভরে সেই গন্ধ নিঃশ্বাসে গ্রহণ করছি।

তেতলীপুত্র : অতিমুক্ত, তুমি শ্রমণের চর্যার অতিক্রমণ করছ। তুমি আলোচনা কর।

অতিমুক্ত : থের, আপনার আদেশ মতো আলোচনা আমি অবশ্যই করব। তবে এই সুন্দর সকালের তুলনা হয় না। বৃষ্টি ধোয়া আকাশ কেমন নির্মল; নির্মেঘ। সেই নির্মল আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে রেশমের মতো কোমল রোদ। উল্লসিত হয়ে উঠছে আমার মন। বৃষ্টি ধোয়া গাছ হয়ে উঠেছে আরো সবুজ। বনের সবুজে মনের সবুজে কি সহজ মিল। থের, চেয়ে দেখুন ওই ফুলের অগ্রভাগে লম্বিত জলবিন্দু। সূর্য কিরণে মাণিক্যের মতো জ্বলছে।

তেতলীপুত্র : ছিঃ ছিঃ অতিমুক্ত ! তোমাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে শ্রমণের ইন্দ্রিয় বিষয়ে আগ্রহ থাকতে নেই। রূপ রস স্পর্শ গন্ধ বর্ণ তাকে আকৃষ্ট করবে কেন ?

অতিমুক্ত : থের, ঠিক ত জানিনা, তবু আমায় আকর্ষণ করে অরণ্যের সমারোহ, পাখির কাকলী, গাছের তলায় তলায় ছড়িয়ে থাকে যে পুষ্প মঞ্জরীর সম্ভার, বাতাসে যে সৌরভ ভাসে তা হরণ করে মন। আমি তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলি, ডুবে যাই এক নামহীন আনন্দ সায়রে।

তেতলীপুত্র : না-না অতিমুক্ত তোমাকে আরো কঠিন নিগড়ে বাঁধাতে হবে নিজেকে। এই ভাব-বিলাস শ্রমণের শোভা পায় না।

অতিমুক্ত : থের, বর্ষার জলে স্ফীত হয়ে ওই নালার জল কেমন উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

তেতলীপুত্র : নাঃ, তোমাকে নিয়ে কিছুতেই পারা গেলনা, অতিমুক্ত।

গগ্গ : জানিনা, শ্রমণ ভগবান ওকে কি দেখে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

তেতলীপুত্র : ওকি, ওকি, তুমি কোথায় চলেছ অতিমুক্ত ?

অতিমুক্ত : [নালার দিকে যেতে যেতে] থের, কেমন উদ্দাম হয়ে ছুটে চলেছে নালার জল। এমনি একদিন ছুটে ছিল রাজোদ্যান সংলগ্ন নালায় যেদিন অঝোর ধারায় নেমে ছিল বৃষ্টি আর এক শ্রাবণে। সে কত দিনের কথা। কিন্তু কি দুষ্টু ছিল ওই চম্পা।

তেতলীপুত্র : অতিমুক্ত ! অতিমুক্ত ! একদম ছেলে মানুষ !

অতিমুক্ত : [নালার জলে কাঠের ভিক্ষা পাত্র ভাসিয়ে] কি তোর নৌকো ভেসে যাচ্ছে ?—না আমার--

চম্পা : আমার আমার।

তেতলীপুত্র : অতিমুক্ত শোন, তুমি শিগগির ফিরে এসো। যদি না আসবে তবে তোমাকে একা ফেলে আমরা চলে যাব। ভগবানকে সকল কথা বলব। তুমি শুধু শ্রামণ্যের নিয়মই লঙ্ঘন করোনি বয়োবৃদ্ধ সাধুদেরও অপমান করেছ।

[সাধুরা ধীরে ধীরে চলে যাবে]

অতিমুক্ত : কি বললি ?

চম্পা : ঠিকই বলেছি। আমার নৌকো ভেসে যাচ্ছে।

অতিমুক্ত : না তোর নৌকো ডুবে গেছে।

চম্পা : মিছে কথা।

অতিমুক্ত : মিছে কথা! তুই বললেই, ইস্।

চম্পা : আমার নৌকো ভেসে যাচ্ছে।

অতিমুক্ত : সাবধান করে দিচ্ছি চম্পা, মিছে কথা বলবি না।

চম্পা : বলব, একশোবার বলব তোমার নৌকো ডুবে গেছে, আমার নৌকো ভাসছে।

অতিমুক্ত : আমি চড় কসিয়ে দেব, বল আবার বল

চম্পা আবার বলছি, আবার।

[অতিমুক্ত চড় মারবে]

অতিমুক্ত : একি, কোথায় চম্পা? না না না, একি স্বপ্নের আবেশ! আমি কে? আমি কি!···আমি শ্রমণ, ছি ছি ছি! সংসার সাগর পার হব বলে জীবন নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে এসে কাঠের পাত্র ভাসিয়ে এ আমি কি খেলা খেলছি। আর সেই খেলার মত্ততায় বয়োবৃদ্ধ সাধু-দের অপমান করেছি। [পেছন ফিরে] তাইত তাঁরা আমায় ফেলে চলে গেছেন। ভগবন্! তুমি দয়াময়, তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমি সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয় হতে এবারে আমার মনকে তুলে নিচ্ছি। ওকি! ও কিসের গুঞ্জন ভেসে আসছে? ও কারা যেন কথা বলছে।

[দূর হতে শোনা যাবে]

গগ.গ ভগবন্! আপনি কি দেখে অতিমুক্তকে শ্রমণ ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, বালক সুলভ চপলতা আজও সে পরিত্যাগ করেনি।

তেতলীপুত্র : ভগবন্! ভিক্ষাচর্যা হতে ফেরার পথে সে কাঠের পাত্র জলে ভাসিয়ে খেলা করছে। তাকে কত বোঝালাম, কিন্তু কোনো কথা সে কানে নিল না।

অতিমুক্ত : ঠিক বলেছেন থের, ঠিক বলেছেন। আমি ক্ষমারও অযোগ্য।

[দূর হতে শোনা যাবে]

মহাবীর : শ্রমণগণ, তোমরা অতিমুক্তকে কিছু বোলো না, তার নিন্দা করো না, গর্হা করো না। সে তোমাদের অনেকের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বালক হলেও পরিশুদ্ধ তার অন্তর। বিষয় লালসা তার মনকে কোন

দিনই স্পর্শ করেনি। তার ভাবনা ক্রমশঃই শুদ্ধ হতে শুদ্ধতর হয়ে উঠছে। সে ইহ জীবনেই নয়, অল্পসময়ের মধ্যে সামান্য ব্যবধানে এখুনি ঐ মুহূর্তে কেবল জ্ঞান লাভ করবে।

[আকাশে দেবদুন্দুভি বেজে উঠবে। বাতাসে ভেসে আসবে—
'অতিমুক্ত, তুমি শুদ্ধ, তুমি বুদ্ধ, তুমি মুক্ত']

অতিমুক্ত : ভগবন্, তুমি দয়াময়, তুমি দয়াময়।

[একটি জ্যোতির মধ্যে অতিমুক্ত বিলীন হয়ে যাবে]

সমরাদিত্য কথা

[কথাসার]

হরিভদ্র সূরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

কয়েক দিনের ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর শিখী একদিন এক গাছের তলায় এক মুনিকে দেখতে পেল। তাঁর চারদিকে শান্তির এক অপূর্ব পরিমণ্ডল ছিল। তাঁর তপস্তেজে দেবালয়ের মত সেই গাছের চারদিকের আবহাওয়া। শিখী নিজেও নির্মল অন্তঃকরণের ছিল। তাই তপস্বীর পবিত্রতা ও তেজস্বিতায় আকৃষ্ট হয়ে সে তাঁর কাছে গিয়ে বিনম্র ভাবে তাঁর সামনে বসে পড়ল।

শিখীকে দেখা মাত্র মানব স্বভাবের পরিজ্ঞাতা মুনিও বুঝতে পারলেন এই বালকটি জন্ম দুঃখী। সংসারে অনাদর ছাড়া আদর কোথাও সে পায়নি। তার অজ্ঞাতে গড়িয়ে পড়া চোখের জল তার কচি কিন্তু রোদে পোড়া গালে তখনো লেগে রয়েছিল। তপস্বী তাই সমবেদনার সুরে বললেন, বৎস, অল্প বয়সে তোমার ওপর অনেক দুঃখ এসে পড়েছে না ?

নিজের দুঃখে চোখের জল ফেলা শিখীর অভ্যাস নয়। তার মনে হয় তা দুর্বলতা। তবু মায়ের কাছে অনাদর পাওয়া শিখীর অন্তর সেই সস্নেহ সম্ভাষণে কেমন যেন দ্রবীভূত হয়ে গেল।

ভগবন্, দুঃখীত বটে তবে কেন এমন হল ? চাঁদের কিরণ শীতল কিন্তু আমার বেলায় তা কেন অগ্নি বর্ষণ করে ? মায়ের কোল যখন সমস্ত দুঃখের বিশ্রাম তখন তা আমার জন্য কেন তপ্ত কটাহের মত ? আমি ত কখনো কোন অপরাধ করি নি। তবে এত দুর্ভাগ্য কেন ? শিখীর ইচ্ছে করছিল তার সমস্ত জীবনবৃত্ত সে এই তপস্বীর কাছে অনাবৃত করে তার বুকের বোঝা তাঁর পায়ে নামিয়ে দিয়ে হাল্কা হয়ে নেয় কিন্তু তখনি তার মনে হল যা বলবার ছিল তা বলা হয়ে গেছে। তাই সে চুপ করে গেল।

তপস্বী বললেন, বাবা, সংসার চক্র নিজস্ব নিয়মে চলে। মাত্র আমরাই বাবলার গাছ লাগিয়ে আম্র ফল আশা করি। তাই সূর্যে অন্ধকার ও চাঁদে অগ্নি ঝরতে দেখি। আমরা উপরি উপরি কার্য কারণ নির্ণয় করতে যাই তাই তার সামঞ্জস্য করতে পারি না। আজকের হর্ষ-বিষাদ সংযোগ-বিয়োগের পেছনে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের ভালমন্দ ভাবনা কাজ করে, আমাদের দৃষ্টি সে পর্যন্ত যায় না। একমাত্র জ্ঞানীরাই সেকথা বলতে পারেন।

কিন্তু এতে শিখী পরিতুষ্ট হল তা মনে হল না।

তোমার চেয়ে বেশী দুঃখী সংসারে যে আরো আছে তা তোমার মনে হয় না, না? স্নেহ মিশ্রিত কণ্ঠে মুনি আবার বললেন।

শিখী বলল, আপনিই বলুন সংসারের সনাতন নিয়মকে অসত্যকারী আমি ছাড়া আর কে আছে? মার বাৎসল্য সংসারের সনাতন নিয়ম—শিখীর তাই ধারণা। তাই সে তার পূর্ব প্রশ্নেরই আবার পুনরাবৃত্তি করল।

মুনিও তাই বললেন, সংসারের নিয়ম বুঝতে আমাদের বুদ্ধিও বা কত দূর যায়? আমরা যা করি তা স্থূল কারণ ধরেই নির্ণয় করবার চেষ্টা করি কিন্তু যখন তাতে হেরে যাই তখন জটিল সমস্যায় পড়ে যাই। আমাদের সুখ দুঃখের পেছনে অনেক জন্মজন্মান্তরের রাগদ্বেষ ঈর্ষ্যা বৈর কাজ করে কিন্তু তা আমরা ধরতে পারি না। তাই সংসারের নিয়ম আমার জন্য অসত্য হল বলে মনে হয়। কর্ম ও তার বিপাক জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তা আমরা জানি না।

এভাবে ক্রমে ক্রমে তপস্বী শিখীকে সংসারের স্বরূপ বোঝাতে আরম্ভ করলেন। এই সংসারে সকলেই একলা এবং একলাকেই আত্ম কল্যাণের সাধনা করতে হয়—মুনি সেকথা ভালোভাবে তাকে বুঝিয়ে দিলেন।

শিখীর নির্মল ও বিকশিত অন্তরে মুনির উপদেশের প্রভাব পড়ল। শিখীর মন তখন খানিকটা শান্ত হয়েছে। তাকে আরও শান্ত করার জন্য গুরুর কাছে শোনা, তাঁর নিজের পূর্ব ভবের জীবনবৃত্ত তার সামনে উপস্থিত করলেন। শেষে স্নেহময়ী মায়ের মনেও লোভের জন্য কি ভাবে দুর্বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তাঁর বর্তমান জীবনের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে তা অভিব্যক্ত

করলেন। বললেন, যদিও মা গুপ্তভাবে বিষ দেয় তবুও এতে মা'ত নিমিত্ত কারণ মাত্র। যার স্বরূপে জন্ম জন্মান্তরের পুরানো বিদ্বেষই মূর্ত হয়ে ওঠে আর সেই সময় যারা ভব্যাত্মা তারা নিজের শুদ্ধ স্বভাব পরিত্যাগ করে না। সে সব শুনে শিখী মুক্তির এক ছোট নিঃশ্বাস ফেলল।

শিখী এখন আশ্বস্ত হল। সংসারে সেই যে একমাত্র দুঃখী ও দুর্ভাগা এই বিশ্বাসের ভার অস্ত হল। তার মনে হল ঘটনার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারা চাই ও তাদের নির্মূল করবার জন্ম কটিবদ্ধ হতে হবে। শিখী জীবনকে দেখার এই দৃষ্টি তপস্বীর কাছে লাভ করল।

শিখী স্বপ্নেও যা কল্পনা করেনি এরকম আশ্রয় সে এখন পেয়ে গেল। বিজয় মুনির সান্নিধ্যে সে যত বেশী আসতে লাগল ততই আধ্যাত্মিকতার রঙে সে রাঙিয়ে উঠতে লাগল। আগে যার মনে হচ্ছিল এই বিরাট বিশ্বে কার স্নেহ কার আশ্রয় সে লাভ করবে, এখন তার মনে হতে লাগল অন্ধকার রাত্রি শেষ হয়ে গিয়ে যেন নূতন চন্দ্রোদয় হয়েছে। এখানে এসে সে যে জ্ঞানের আলো পেয়েছে, সৃষ্টিতত্ত্বের মৌলিক নিয়মের পরিচয়, তা যেন তার জীবনের মৌলিক সম্পদ হয়ে রইল। গুরুরও মনে হতে লাগল এমন চতুর, শান্ত, কুলীন ও কল্যাণকামী শিষ্যও ভাগ্যের ফলেই লাভ করা যায়।

একদিন যখন তপস্বী গুরু কল্যাণাকাঙ্ক্ষী শিষ্যের সঙ্গে মহাব্রতের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন তখন এক ব্রহ্মণ সহসা সেখানে এসে তাঁকে বন্দনা করে তাঁর নিকটে বসলেন। শিখী সেই ব্রাহ্মণকে দেখা মাত্রই চিনতে পারল। কারণ তিনি তার পিতা ছিলেন ও তারই অনুসন্ধান করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শিখীর মায়ের ব্যবহারে পীড়িত পিতার ওপর মায়ের অনেক কর্তব্যই এসে পড়েছিল। তাইত মায়ে খেদানো ছেলেকে খুঁজতে ও সম্ভব হলে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রমণ

॥ নিয়মাবলী ॥

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।

- যে কোনো সংখ্যা থেকে শ্রমণকে এক বছরের জন্ত গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫.০০।

- শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

- যোগাযোগের ঠিকানা :

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৩-২৬৫৫

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

সূচীপত্র

তৃতীয় বর্ষ ॥ তৃতীয় খণ্ড

বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮২

কবিতা

গল্প

জীবনী

নাটক

প্রবন্ধ

পুস্তক পরিচয়

রম্য রচনা

চিত্র